

ମଥେର ଦାବୀ

କାହିନୀ :

ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

ଓରୁଦାସ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏଓ ସନ୍ସ
୨୦୭.୨-୨ କର୍ମଓଫିସ୍ ଫ୍ଲିଟ ... କଲିକତା - ୬

পথের দাবী

(১)

স্বপ্নের বন্ধুদের নিম্নলিখিত প্রথায় আরহ তর্ক-বিতর্ক

তেন, তুমি, তোমার দুঃখের প্রায় কিছুই না। ন না
না শোনে না সংসারে এমন ব্যাপারই নেই
ত, আছে বই কি। এই যেমন, দুঃখ
পূর্ণাঙ্গ হইবে।

রানো বসিকতার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেন, তুমি কলেজে
পাঠ করিলে, কিন্তু তবু এখনও টিকি রাখিতেছ।
মাড়ির দিয়া মগজে বিদ্যা চলাচল হয় নাকি ?

ব দিত, এম-এস-সি'র পাঠ্যপুস্তকে টিকির বিকল্পে
যাণেশন নেই। স্বতরাং টিকি রাখা অজ্ঞায় এ বারখা
আর বিদ্যা চলাচলের সমস্ত ইতিহাসটা আজিও
বিশ্বাস না হয়, এম-এস-সি যারা পড়ান তাঁদের বরঞ্চ
হিও।

বইয়া বলিতেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বুঝা।

বলিত, তোমাদের এই কথার অস্তিত্ব সত্য, কিন্তু
চেতন হয় না।

অপুষ্কর ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট পিতার বাক্যেও ব্যবহারে,

পথের দাবী

উৎসাহ পাইয়া তাহার বড় ও মেজদাদারা যখন প্রকাশ্যেই মুগি হোটেলের কুঠী খাইতে লাগিল, এবং জ্ঞানের পূর্বে গলার পৈন্ডাটা পেরেকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া প্রায়ই ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এমন ধাপার বাড়ী দিয়া কাচাইয়া ইজ্জী করিয়া অনিলে স্ববিধা হয় কিম্বা গাচনা করিয়া হাসি-তামাসা করিতে লাগিল, তখনও অপূর্বের নিমিত্ত হৈতা হয় নাই। কিন্তু ছোট হইলেও সে মায়ের গভীর শ্রুতি ও নিঃসঙ্গ পাত বহুদিন লক্ষ্য করিয়াছিল। যা কিছুই বলিতেন না। একে বলিলেও ছেলেরা শুনিত না, অধিকন্তু স্বামীর সহিত নিরর্থক কলহ হইত। তিনি শব্দবহুলের পৌরোহিত্য ব্যবসাকে নিষ্ঠুর ইঙ্গিত দিয়া কহিতেন, ছেলেরা যদি তাদের মামাদের মত হইয়া হয়ে বাপের মৃত্যু হইত উঠে ত কি করি যাবে! মাথায় টিকির বদলে টুপী পরে বলেই মাথাটা কেটে নেওয়া হইত আমার তা মান হব না।

সেই অবধি করুণাময়ী ছেলেরা দৈনন্দিন জীবনে নিরীক গিয়াছিলেন, কেবল নিজের আচার-বিচার নিজেই নীরবে ও অনাড়ম্বর পালন করিয়া চলিতেন। তাহার পর স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হইয়া গৃহে বাস করিয়াও এক প্রকার গৃহ হইতে যত্ন হইয়া উপরের যে ঘরটার তিনি থাকিতেন, তাহারই পার্শ্বের বাতাস ঘিরিয়া লইয়া তাঁহার ভাঁড়ার ও স্বহস্তে রান্নার কাজ চালাত। বয়স হারতও তিনি খাইতে চাহিতেন না। এমনি ভাবেই দিন চলে গেল।

এদিকে অপূর্ব মাথায় টিকি রাখিয়াছিল, কলেজে জলপা। লইয়া যেমন সে পাশও করিত, ঘবে একাদশী-পুণিমা-সন্ধ্যাহিকও বসিত না। মাঠে, ফুটবল রিকেট-ইক খেলাতেও তা উৎসাহ ছিল, সকালে মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নানে যাইতেও তাৎপর্য ব্রহ্মাভাব ঘটত না। বাড়াবাড়ি ভাবিয়া বড় মাথা কামাই করিয়া বলিত, ঠাকুরপো, পড়াশুনা ত সাদা হল, এবার তাপ

নিরী একটা রীতিমত গোসাই-টোসাই হয়ে পড়ে। এবে দেখছি
 দুনের বিধবাকেও ছাড়িয়ে গেল।

অপূর্ণ সহাস্ত্রে জবাব দিত, ছাড়িয়ে — কি আর সাথে হয়
 বৌদি? মায়ের একটা মেয়ে-টেয়েও নেই মিশ হয়েছে, হঠাৎ অসমর্থ
 হয়ে পড়লে এক মুঠো হবিস্ত্রি রেখেও দিতে পারবো? আর ছোর-
 কাপুনি যাবে কোথা? তোমাদের সংসারে যখন আছি, তখন এক দিন
 তা মূল্য করতেই হবে।

ভিড়বু মুখখানি স্নান করিয়া কহিত, কি কোরব ঠাকুরপো, সে
 মা-বাবার কপাল!

তাই বটে! বলিয়া অপূর্ণ চলিয়া যাইত, কিন্তু মাকে গিয়া কহিত,
 মা, এ তোমার বড় অসুখ। দাদারা যাই কেননা করুন, বৌদিরা কিছু
 দুগিও খান না, হোটেলেও ডিনার করেন না, চিরকালটা কি তুমি
 রান্না খাবে?

মা কহিতেন, একবেলা একমুঠো চাল ফুটিয়ে নিতে ত আমার কোন
 দোষই হয় না বাবা। আর নিতান্ত যখন অপারগ হব, ততদিনে তোরা
 বৌও ঘরে এসে পড়বে।

অপূর্ণ বলিত, তাই কেন না একটা বামুন-পণ্ডিতের ঘর থেকে
 শাশুরে নাও না মা? খেতে দেবার সামর্থ্য আমার নেই, কিন্তু তোমার
 দুই দেউলী মনে হয় দাদাদের গলগ্রহ হয়েই না হয় থাকবো।

মা মৃদুগল্গলি হই চক্ষু দাঁপ্ত করিয়া কহিতেন, অমন কথা তুই মুখেও
 নিস্নে অপূ! ছোর সামর্থ্য নেই একটা বৌকে খেতে দেবার?
 তুই মূখুর করলে যে বাড়ীর সবাইকে বসে খাওয়াতে পারিস।

অপূর্ণ মনে হয় ভাষাতে তোমার মত
 এমন কিছু আর কারও নেই। এহ বলিয়া সে উদগত অশ্রু গোপন
 করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িত।

পথে কিন্তু নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে অপূর্ণ বাহাই বলুক, তাই বলিয়া কণ্ঠভার-গ্রাস্তর দল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া বিনোদবাবুকে স্থানে অস্থানে আক্রমণ করিয়া জীবন তাঁহার দূত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিনোদ আসিয়া মার্ক ধরিতেন, না কোথায় কোন নিষ্ঠে-কিষ্ঠে জপ-তপের মেয়ে আছে তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে চুলিয়ে ফেল, না হয় আমাকে দেখছি বাড়ী ছেড়ে পালাতে হয়। বাপের বড় ছেলে,—বাইরে থেকে লোকে ভাবে আমিই বুঝি বা বাড়ী কর্তা।

ছেলের কঠিন ব্যবসা করণাময়ী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন কিন্তু এইখানে তিনি আপনাকে কিছুতেই বিচলিত হইতে দিতেন না। যাহা অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিতেন, লোকে ত মিথ্যা ভাবনা বাবা, তাঁর অবর্তমানে তুমিই বাড়ীর কর্তা, কিন্তু অপুর সম্বন্ধে তুমি কাউকে কোন কথা দিয়া না। আমি রূপ চাইনে, টাকাকড়ি চাইনে,—না বিত্ত, সে আমি আশা নি দেখে শুনে তবে দেব।

বেশ ত মা, তাই দিযো। কিন্তু যা করবে দয়া করে একটু শ্রম করে কর। রাজা মাকাল-কল নাম্নে সুলিয়ে রেখে লোকগুলোকে আর দণ্ডে মেরোনা। এই বলিয়া বিনোদ রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

করণাময়ীর মনে মনে একটা সন্দেহ ছিল। স্বামীর ঘাটে ভারী একটি স্তনক্ষণা মেয়ে কিছুদিন হইতে তাহার চোখে পড়িয়াছিল। মেয়েটি নারের সহিত প্রায়ই গদ্যামনে আদিত। তাহারা যে তাহার স্ব-স্বত এ-সম্বন্ধে তিনি গোপনে সংগত করিয়াছিলেন। মান্যভেদে সে যেটি শিবপূজা করিত, কোথাও কিছু ভুল হয় কি না, করণাময়ী লক্ষ্য লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন। তাহার আরও কিছু কিছু জন্মগত ছিল, এবং সে-পক্ষে তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাহার বাপের মৃত্যু মৃত্যু তথ্য যদি অল্পকাল হয় ত আগামী বৈশাখেই ছেলের বিবাহ হইবে।

এমন সময়ে অপূর্ব আসিয়া অকস্মাৎ সদ্যদ দিল, মা, আমি বেশ একটা চাকরি পেয়ে গেছি।

মা খুসি হইয়া কহিলেন, বলিস্ কি রে? এই ত সেদিন পাশ করুলি, এরই মধ্যে তোকে চাকরি দিলে কে?

অপূর্ব হাসিমুখে কহিল, বাবু গরজ। এই বলিয়া সে মিস্ত্রি ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, তাহাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবই ইহা যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। বোখা কোম্পানি বর্মার বেঙ্গল সহরে একটা নতুন আকিস খুলিয়াছে, তাহারা বিধান, বুদ্ধিমান ও সচরিত্র কোন বাঙালী যুবককে সমস্ত কর্তব্য ভার দিয়া পাঠাইতে চায়। বাসাভাড়া ছাড়া মাহিনা আপাততঃ চারিশত টাকা, এবং চেষ্টা করিগাও কোম্পানিকে যদি ভাল বাতি জালাইতে না পাওয়া যায় ত ছয় মাস পরে আরও দুই হুই প্রত। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিন্তু, বর্মার-যুবকের নাম শুনিয়া মায়ের মুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি নিরুৎসাহকণ্ঠে কহিলেন, তুই কি স্বেপেন্‌ছিস্ অপূ, সে-দেশে কি মাছুষে যায়! সেখানে জাতি, জন্ম, আচার-বিচার কিছু নেই শুনেচি, সেখানে তোকে দেব আমি পাঠিয়ে? এমন টাকায় আমার বাজ নেই।

জননীর বিকলতায় অপূর্ব ভীত হইয়া কহিল, তোমার কাজ নেই, কিন্তু আমার ত আছে মা। তবে, তোমার লক্ষ্যে আমি ভিতরী হয়ে থাকতে পারি, কিন্তু সারা জীবনে কি এমন সুযোগ আর হইবে? তোমার ছেলের মত বিজ্ঞ-বুদ্ধি আজকাল সহরের ঘরে ঘরে আছে, অতএব, বোখা কোম্পানির আটকাবে না, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, যে আমার হয়ে একেবারে কথা দিচ্ছে দিচ্ছেন, তাঁর লজ্জার স্বার্থ থাকবে না। তা' ছাড়া বাড়ীর সত্যকার অবস্থাও ত তোমার জানকীকণ্ঠে?

মা কহিলেন, কিন্তু সেটা যে শুনেচি একেবারে স্বেচ্ছ দেশ।

অপূর্ণ কহিল, কে তোমাকে বাড়িয়ে বলেচে। কিন্তু এটা ত তোমার ব্লেক্স দেশ নয়, অথচ যারা হতে চায় তাদের ত বাধে না মা।

মা সপকাল স্থির থাকিয়া কহিতেন, কিন্তু এই বৈশাখে যে তোমার বিয়ে দেব আমি স্থির করেচি।

অপূর্ণ কহিল, একবারে স্থির করে বসে আছ মা? বেশ ত, দু-এক মাস পিছিয়ে দিয়ে যেদিন তুমি ডেকে পাঠাবে সেই দিনই কিরে এয়ে তোমার অঙ্কা পালন কোরব।

কর্ণাময়ী শাহিরের চক্ষে সে কলে হইলেও অতিশয় বুদ্ধিমতী। তিনি অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া অবশেষে দীরে দীরে কহিলেন, যখন যেতেই হবে তখন আর উপায় কি। কিন্তু তোমার দাদাদের মত নিয়ে।

এই বর্ষাযাত্রা সম্পর্কে তাহার আর দু'টি সন্তানের উল্লেখ করিতে কর্তব্য। কর্তব্যের অতীত ও বর্তমানের সমস্ত প্রান্তর বেদনা যেন একবার আলোড়িত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে দুখে আর তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না। তাহার পিতৃকুল গোকুল-দীধির সুবিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, এবং বংশপরম্পরায় তাহার অতিশয় আচার্যপরায়ণ ও নির্ধাবান হিন্দু। শিশুকাল হইতে সে সংস্কার তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। উত্তরকালে তাহা স্বামী ও পুরুষের হস্তে দাসদুর আহত ও লাঞ্চিত হইবার হইয়াছে, কেবল এই অপূর্ণকে লইয়াই তিনি কোনমতে সহ্য করিয়া আশ্রয় গৃহে বাস করিতেছিলেন, সে ছেলেও আজ তাহার চোখের আড়ালে কোন অজানা দেশে চলিয়াছে। এ দঃ স্মরণ করিয়া তাহার ভয় ও ভাবনার সীমা রহিল না, শুধু মুখে বলেন, যে ক'টা দিন বেঁচে আছি তপু, তুই কিন্তু আর আমাকে ছাপ দিসনে কর। এই বলিয়া তিনি আঁচল মিটা চোখ দু'টি মুছিয়া ফেলিলেন।

অপূর্ণের নিজের চক্ষুও নজল হইয়া উঠিল, সে প্রত্যক্ষ করিল

কহিল, মা, আজ তুমি ইহলোকে আছো, কিন্তু, একদিন তোমার স্বর্গ-বাসের ডাক এসে পৌছবে, সেদিন তোমার অপূর্ণ ফৈলে যেতে হবে জানি, কিন্তু, একটা দিনের জন্তেও যদি তোমাকে চিন্তে পেরে থাকি মা, তাহ'লে সেখানে বসেও কখনো এ ছেলের জন্তে তোমাকে চোখের জল ফেলতে হবে না। এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে অগ্রত প্রস্থান করিল।

সেদিন সন্ধ্যাকালে করুণাময়ী তাঁহার নিয়মিত আফিক হাসপাতালয় মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না, উদ্বেগ ও বেদনার ভাবে তাঁহার দুই চক্ষু পুনঃপুনঃ অশ্রু-আবিল হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং কি করিলে যে কি হয় তাহা কোন মতেই ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে তাঁহার বড় ছেলের ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন। বিনোদকুমার কাছারি হইতে ফিরিয়া জল-যোগান্তে এইবার সান্ধ্য-পোষাকে ক্লাবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেছিলেন, হঠাৎ মাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া গেলেন। বস্তুতঃ, এ ঘটনা এমনি অপ্রত্যাশিত যে সহসা তাঁহার মুখে কথা যোগাইল না।

করুণাময়ী কহিলেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি কিছু।

কি মা ?

মা তাঁহার চোখের জল এখানে আসিবার পূর্বে ভাল করিয়াই মুছিয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাঁহার আত্মকণ্ঠ গোপন রহিল না। তিনি আল্পপুলক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া শেষে অপূর্বর মাসিক বেতনের পরিমাণ উল্লেখ করিয়াও যখন নিরানন্দমুখে কহিলেন, তাই ভাবছি বস, এই একটা টাকার লোভে তাকে সেখানে পাঠাব কিনা, তখন বিস্ময়ময় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে রুদ্ধ-স্বরে কহিল, মা, তোমার অপূর্বর মত হেঁচো ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই সে আমরা সবাই মানি, কিন্তু

পৃথিবীতে বাস করে এ কথাটাও ত না মেনে পারিনে যে, প্রথমে চার শ'-এবং ছ'মাসে ছ'শ টাকা সে ছেলের চেয়েও অনেক বড়।

মা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, কিন্তু, সে যে শুনেছি একেবারে স্বেচ্ছ দেশ।

বিনোদ কহিল, মা, জগতে তোমার শোনা এবং জানাটাই কেবল অভ্রান্ত না হতে পারে।

ছেলের শেষ কথায় মা অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়া কহিলেন, বাবা বিলু এই একই কথা তোমাদের জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত শুনে শুনেও যখন আমার চৈতন্য হকনা, তখন শেষ দশায় আর ও শিক্ষা দিয়োনা। অপূর্ণর দাম কত টাকা সে আমি জানতে আসিনি, আমি শুধু জানতে এসেছিলাম অতদূরে তাকে পাঠানো উচিত কিনা।

বিনোদ হেঁট হইয়া ডান হাতে তাড়াতাড়ি মায়েব দুই পা স্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা, তোমাকে দুখে দেবার জন্ত একথা আমি বলিনি। বাবার সঙ্গেই আমাদের মিলুত সে সত্যি, এবং টাকা জমিদারী যে সংসারে দামী ও দরকারী এ তার কাছেই শেখা। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে সে লোভ তোমাকে আমি দেখাচ্চিনে। তোমার স্বেচ্ছ বিহীন এই আট-কোটের ভেতরটা হয়ত আজও ততবড় মাত্রেব হয়ে উঠেনি যে, ছোট ভাইকে খেতে দেবার ভয়ে স্থান-অস্থানের বিচার করেনা। কিন্তু তবুও বলি, ও বাবু। দেশে আব-হাওয়া যা' বইতে শুরু করেছে মা, তাতে ও যদি দিনকতক দেশ ছেড়ে কোথাও গিয়ে কাজে লেগে যেতে পারে ত এর নিজেরও ভাল হবে, আমরাও সংগোষ্ঠী হয়ত বেঁচে যাবো। তুমি ত জানো মা, সেই স্বদেশী আমলে এর গলা টিপলে ছব বেরোত, তবু এই বিক্রমে বাবার চাকরি বাবার ঘো' হয়েছিল।

করুণায়ী শরিত হইয়া কহিলেন, না না, সে-সব অপু আর কার না। সাত আট বছর আগে তার কি-না বয়স ছিল, সে-না মনে মিশেই যা—

বিনোদ মাথা নাড়িয়া একটু হাসিয়া কহিল, হয়ত, তোমার কথাই ঠিক, অপূর্ব এখন আর কিছু করে না, কিন্তু, সকল দেশেই জনকতক লোক থাকে মা, যাদের জাতই আলাদা,—তোমার ছোট ছেলেটি সেই জাতের। দেশের মাটি এদের গায়ের মাংস, দেশের জল এদের শিরের রক্ত; শুধু কি কেবল দেশের হাওয়া-আলো,—এর পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, চন্দ্র-সূর্য্য, নদী-নালা যেখানে যা কিছু আছে সব যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে এরা শুশু নিতে চায়! পোষ হয় এদেরই কেউ কোন্ সত্যবাদী জননী-জন্মভূমি কথাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল। দেশের সুস্বাদু এদের কখনো বিধাস করোনা মা, ঠকবে। এদের বেঁচে থাকা আর প্রাণ দেওয়ার মধ্যে এই এতটুকু মাত্র প্রভেদ! এই বলিয়া সে তাহার তক্তনীর প্রান্ত-ভাগটুকু বন্ধাবুই দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেখাইয়া কহিল, বরঞ্চ তোমার এই রেজাচারী বিভ্রটিকে তোমার ওই টিকিদারী গীতা-পড়া এম-এম-সি পাশ করা অপূর্বকুমারের চেয়ে ঢের বেশী আপনার বলে ছেনো।

ছেলের কথাগুলো মা ঠিক যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু এক সময়ে নাকি এই লইয়া তাঁহাকে অনেক উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছে তাই মনে মনে চিন্তিত হইলেন। দেশের পশ্চিম দিগন্তে যে একটা মেঘের লক্ষণ দেখা দিয়াছে এ সম্বাদ তিনি জানিতেন। তাহার প্রথমেই মনে হইল তখন অপূর্বের পিতা জীবিত ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি পরলোকগত।

বিনোদ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, কিন্তু তাহার বাহিরে খাইবার দরার ছিল, কহিল, বেশ ত মা, সে তো আর কালই যাচ্ছেনা; সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া একটা স্থির করা যাবে। এই বলিয়া সে একসঙ্গে দুই বাহির হইয়া গেল।

(২)

জাহাজের কয়টা দিন অপূর্ণ চিঁড়া চিবাইয়া সন্দেশ ও ডাবের জল খাইয়া সর্বাঙ্গীণ ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিয়া অর্দ্ধমৃতবৎ কোনমতে গিয়া রেঙ্গুনের ঘাটে পৌঁছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত বোথা কোম্পানির জন দুই দরওয়ান ও একজন মাদ্রাজী কঞ্চচারী জেটিতে উপস্থিত ছিলেন, মানেজারকে তাঁহারা সাদর স্বাগত করিলেন। তিনি ত্রিশ টাকা দিয়া বাসা ভাড়া করিয়া আফিসের খরচায় যথাযোগ্য আসবাব-পত্র ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছেন এ প্রদাদ দিতেও বিলম্ব করিলেন না।

ফাল্গুন মাস শেষ হইতে চলিয়াছে, গরম মন্দ পড়ে নাই। সমুদ্রপথের এই প্রাণান্ত বিড়ম্বনা ভোগের পর নিরীলা গৃহের সজ্জিত শয্যার উপরে হাত-পা ছড়াইয়া একটুখানি শুইত পাইবে কল্পনা করিয়া সে যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করিল। পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে আসিয়াছিল, হালদার পরিবারে বহুদিনের চাকরিতে তাহার নিখুঁত শুদ্ধাচারিতা করুণাময়ীর কাছে সম্ভ্রমণ হইয়া গেছে। তাই বাড়ীর বহু অস্থবিধাসত্ত্বেও এই বিপুল লোকটিকে সঙ্গে দিয়া মা অনেকখানি সাহুনা লাভ করিয়াছিলেন। আবার শুধু কেবল পাচকই নয়, পাক করিবার মত কিছু কিছু চাল-ডাল ঘি-তেল গুঁড়া মশলা মাংস আলু পটল পর্য্যন্ত সঙ্গে দিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং ঈষদুষ্ণ অন্ন-বাগানে মুখের শুকুনা চিঁড়ার স্বাদটাও যে সে অবিলম্বে কিরাইতে পারিবে এ ভরসাও তাহার মনের মধ্যে বিদ্বাৎসুরগের দ্বারা চমকিয়া গেল। গাড়ী ভাড়া হইয়া আসিলে কঞ্চচারী বিনাম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মোট-বাজি নিম্ন-পত্র লইয়া আফিসের দরওয়ানজী পথ দেখাইয়া সঙ্গে চলি, এবং একটানা জলবাত্রা ছাড়িয়া শক ভাঙার উপরে গাড়ীর মধ্যে বসিতে পাইয়া অপূর্ণ আরাম বোধ করিল। কিন্তু মিনিট দশকের মধ্যে গাড়ী শক ভাঙার সম্মুখে আসিয়া থামিল, এবং দরওয়ানজী হাঁক-ডাকে প্রায় উজ্জনখানেক

কলিঙ্গ দেশীয় কুলি জোগাড় করিয়া মোটঘাট উপরে তুলিবার আয়োজন করিল, তখন, সেই তাহার ত্রিশ টাকা ভাড়ার বাটির চেহারা দেখিয়া অপূর্ব হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বাড়ীর শ্রী নাই, ছাঁদ নাই, সদর নাই, অন্তর নাই, প্রাক্ষণ বলিতে এই চলাচলের পথটা ছাড়া আর কোথাও কোন স্থান নাই। একটা অপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি রাস্তা হইতে সোজা তেতালা পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে, সেটা যেমন খাড়া তেমনি অন্ধকার। ইহা কাহারও নিজস্ব নহে, অন্ততঃ ছয়জন ভাড়াটিয়ার ইহাই চলাচলের সাধারণ পথ। এই উঠা নামার কার্যে দৈবাৎ পা কক্ষকালে প্রথমে পাথর-বাধানো রাজার রাজপথ, পরে তাহারই ইসপাতাল, এবং তৃতীয় গতিটা না ভাবাই ভাল। এই দুরারোগ্য দারুণ সোপানশ্রেণীর সহিত পরিচিত হইয়া উঠিতে কিছু দীর্ঘকাল লাগে। অপূর্ব নূতন লোক, তাই সে প্রতিপদক্ষেপে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দরওয়ানের অনুবর্তী হইয়া উঠিতে লাগিল। দরওয়ান কতকটা উঠিয়া ভায় দিকে দোতালার একটা দরজা খুলিয়া নিয়া জানাইল, সাহেব, ইহাই আপনার গৃহ।

ইহারই নুখোমুখি বামদিকের রুদ্ধ দ্বারটা দেখাইয়া অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এটাতে কে থাকে ?

দরওয়ান কহিল, কোই এক চিনা সাহেব রহতেইছে শুনা।

অপূর্ব ঠিক তাহার মাথার উপরে তেতালায় কে থাকে প্রশ্ন করায় সে কহিল, এক কালা সাহেব ত রহতেইছে দেখা। কোই মাদ্রাজ-বালে হোয়েছে জরুর !

অপূর্ব চূপ করিয়া রহিল। এই একমাত্র আনাগোনার পথে উপরে এবং পাশে এই দুটি একান্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর পরিচয়ে তাহার মুখ দিয়া কেবল দীর্ঘশ্বাস পড়িল। নিজের ঘরের মধ্যে চুকিয়া তাহার আঁকড় বঁক খারাপ হইয়া গেল। কাঠের বেড়া দেওয়া পাশাপাশি ছোট বড় তিনটি কুঠরী। একটিতে কল, স্নানের ঘর, রান্নার জায়গা

প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় যাহা কিছু সমস্তই,—মাঝেরটি এই অন্ধকার সিঁড়ির ঘর, গৌরবে বৈঠকখানা বলা চলে, এবং সর্বশেষে রাস্তার ধারের কক্ষটি, অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং আলোকিত,—এইটি শয়ন-মন্দির। আকিসের খরচায় এই ঘরটিকেই খাট, টেবিল এবং গুটিকয়েক চেয়ার দিয়া সাজানো হইয়াছে। পথের উপর ছোট একটুখানি বারান্দা আছে, সময় কাটানো অসম্ভব হইলে এখানে দাঁড়াইয়া লোক চলছিল দেখা যায়। ঘরে হাওয়া নাই, আলো নাই, একটার মধ্যে দিয়া আর একটান যাইতে হয়,—ইহার সমস্তই কাঠের,—দেয়াল কাঠের, মেঝে কাঠের, ছাত কাঠের, সিঁড়ি কাঠের, আগুনের কথা মনে হইলে সন্দেহ হয় এতবড় সর্বাঙ্গসুন্দর জন্তুগৃহ বোধ করি রাজা হুযোয়ানও তাঁর পাণ্ডব ভায়াদের জন্ত তৈরী করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহারই অভ্যন্তরে এই সুদূর প্রবাসে ঘর-বাড়ী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া, বৌদিদিদের ছাড়িয়া, নাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে স্বরণ করিয়া মুহূর্তের দুর্দশতার তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। সামলাইয়া লইয়া সে খানিকক্ষণ এঘর-ওঘর করিয়া একটা জিনিষ দেখিয়া কিছু আগ্রহ হইল যে কলে তখনও জল আছে, স্নান ও রান্না দুইই হইতে পারে। দরওয়ান সাহস দিয়া জানাইল, অপব্যয় না করিলে এ সহরে জলের অভাব হয় না, যেহেতু প্রত্যেক দুই ঘর ভাড়াটিয়ার জন্ত এ বাড়ীতে একটা করিয়া বড় বকনের কলের চৌবাচ্চা উপরে আছে তাহা হইতে দিব্যারাত্রিই জল সরবরাহ হয়। ভরসা পাইয়া অপূর্ণ পাচকেকে কহিল, ঠাকুর, মা ত সমস্তই সন্ত দিয়েছেন, তুমি জান করে দুটি বঁদেবার উল্লাস কর, আমি ততক্ষণ দরওয়ানজীকে নিয়ে জিনিষ-পত্র কিছু কিছু গুছিয়ে ফেলি।

রম্মই ঘরে কয়লা মজুত ছিল, কিন্তু বাধানো চুল্লী। নিশানো মুছানো তেমন হয় নাই, পরীক্ষা করিয়া কিছু কিছু কালীর দাগ

প্রকাশ পাইল। কে জানে এখানে কে ছিল, সে কোন জাত, কি
 ক্রিয়ায় আছে মনে করিয়া তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইল, ঠাকুরকে কহিল,
 এতে তো রাঁধা চলবেনা তেওয়ারী, অত বন্দোবস্ত করতে হবে।
 একটা তোলা-উতুন হলে বাইরের ঘরে বসে আজকের মতো ছুটো
 চাল-ডাল ফুটিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু এ পোড়া দেশে কি তা মিলবে?

দরওয়ান জানাইল কোন অভাব নাই, মূল্য পাইলে সে দশ মিনিটের
 মধ্যে আনিয়া হাজির করিতে পারে। অতএব, সে ট্রাকা লইয়া প্রস্থান
 করিল। ইতিমধ্যে তেওয়ারী রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল, এবং
 অপূর্ব নিজে যথাযোগ্য স্থান মনোনীত করিয়া তোরঙ্গ, বায় প্রভৃতি
 টানাটানি করিয়া ঘর সাজাইতে নিযুক্ত হইল। কাঠের আলনায়া জামা-
 কাপড় স্ট প্রভৃতি গুছাইয়া ফেলিল, বিছানা খুলিয়া ঘাটের উপর
 তাহা পরিপাটি করিয়া বিছাইয়া লইল, তোরঙ্গ হইতে একটা নূতন
 টেবিল-রুখ বাহির করিয়া টেবিলে পাতিয়া কিছু কিছু বই ও লিখিবার
 সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখিল, এবং উত্তরে খোলা জানালার পাশে ছুটা
 আপ্রান্ত প্রসারিত করিয়া তাহার দুই কোণে ছুটা কাগজ গুঁজিয়া
 দিয়া শোবার ঘরটাকে অধিকতর আলোকিত এবং নমনরঞ্জন জ্ঞান
 করিয়া সজ্জাচিত শয্যা চিৎ হইয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস মোচন
 করিল। অনেক পরেই দরওয়ান লোহার চুল্লী কিনিয়া উপস্থিত করিলে
 তাহাতে আগুন দিয়া খিচুড়ী এবং বাহা কিছু একটা ভাজাভুজি যত
 শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়া অপূর্ব আর এক দফা
 বিছানায় গড়াইয়া লইতে যাইতেছিল, হঠাৎ মনে পড়িল মা মাথার
 দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন নামিয়াই একটা টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে।
 অতএব, জুবিলাখে জামাটা গায়ে দিয়া প্রবাসের একমাত্র কর্ণধার
 দরওয়ানকে সঙ্গে করিয়া সে পোষ্টআফিসের উদ্দেশে আর একবার
 বাহির হইয়া পড়িল, এবং তাহারই কথামত তেওয়ারী ঠাকুরকে

আশ্বাস দিয়া গেল, ফিরিয়া আসিতে তাহার একঘণ্টার বেশি লাগিবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে সমস্ত যেন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আজ কি একটা খুঁটান পর্যোপলক্ষে ছুটি ছিল। অপূর্ব পথের দুইধারে চাহিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বুঝিল এই গলিটা দেশী ও বিদেশী মেমসাহেবদের পাড়া, এবং প্রত্যেক বাটতেই বিলাতী উৎসবের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা দিয়াছে। অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, দরওয়ানজী, এখানে আমাদের বাড়ালী লোকও ত অনেক আছে শুনেচি, তাঁরা সব কোন্ পাড়ায় থাকেন?

প্রত্যুত্তরে সে জানাইল যে এখানে পাড়া বলিয়া কিছু নাই, যে যেখানে খুসি থাকে। তবে ‘অপসর লোগ্’ এই গলিটাকেই বেশি পছন্দ করে। অপূর্ব নিজেও একজন ‘অপসর লোপ’, কারণ, সেও বড় চাকরি করিতেই এ দেশে আসিয়াছে, এবং আপনি গোঁড়া হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও কোন ধর্মের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্বেষ ছিল না। তথাপি, এইভাবে আপনাকে উপরে নাঁচে দক্ষিণে বামে বাসায় ও বাসার বাহিরে চারিদিকেই খুঁটান প্রতিবেশী পরিবৃত দেখিয়া তাহার অত্যন্ত বিরূপা বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, আর কি কোথাও বাসা পাওয়া যায় না দরওয়ান?

দরওয়ানজী এ বিষয়ে যথেষ্ট গুয়াকি-বহাল নহে, সে চিন্তা করিয়া যাহা সম্ভব বোধ করিল, তাহাই জবাব দিল, কহিল, খোঁজ করিলে পাওয়া যাইতেও পারে, কিন্তু এ ভাড়ায় এমন বাড়ী পাওয়া কঠিন।

অপূর্ব আর দ্বিধাক্তি না করিয়া তাহারই নির্দেশ মত অনেকখানি পথ হাঁটিয়া একটা ব্রাক্ পোষ্টআফিসে আসিয়া যখন উদ্ভিত হইল, তখন নাদাজী তার-বাবু টিফিন করিতে গিয়াছেন, ঘণ্টা অনেক অপেক্ষা করিয়া যখন তাহার দেখা মিলিল, তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আজ ছুটির দিন, বেলা দুইটার পরে অফিস বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু এখন দু’টা বাজিয়া পনের মিনিট হইয়াছে।

- অপূর্ব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, সে দোষ তোমার, আমার নয়।

স্বামী একঘণ্টা অপেক্ষা করিতেছি।

লোকটা অপূর্বর মুখের প্রতি চাহিয়া নিঃসঙ্কোচে কহিল, না, আমি মাত্র মিনিট দশেক ছিলাম না।

অপূর্ব তাহার সহিত বিস্তর ঝগড়া করিল, মিথ্যাবাদী বলিয়া তিরস্কার করিল, রিপোর্ট করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল, কিন্তু কিছুই হইল না। সে নিরীকারচিত্তে নিজের খাতাপত্র ছুরস্ত করিতে লাগিল, জবাবও দিল না। আর সময় নষ্ট করা নিফল বুদ্ধি অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হৃদয় ও ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে বড় টেলিগ্রাফ আফিসে আসিয়া অনেক ভিড় ঠেলিয়া অনেক বিলম্বে নিজের নিরীক্স পৌছান সম্বাদ যখন মাকে পাঠাইতে পারিল, তখন বেলা আর বড় নাই।

ছুঃখের সাগী দরওয়ানজী সবিনয়ে নিবেদন করিল, সাহেব, হামকো ভি বহুত দূর থানা হয়।

অপূর্ব একান্ত পরিশ্রান্ত ও অত্মমনস্ত হইয়াছিল, ছুটি দিতে আপত্তি করিল না। তাহার ভরসা ছিল নদর-দেওয়া রাস্তাগুলো সোজা ও সমান্তরাল থাকার গন্তব্যস্থান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। দরওয়ান অগ্রত চলিয়া গেল, সেও হাঁটিতে হাঁটিতে এবং গলির হিসাব করিতে করিতে অবশেষে বাটার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সিঁড়িতে পা দিয়াই দেখিল দ্বিতলে তাহার ঘাের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তেওয়ারী ঠাকুর মস্ত একটা লাঠি ঠুকিতেছে এবং অনর্গল বকিতেছে, এবং প্রতিপক্ষ একব্যক্তি খালি গায়ে ওপটলুন পরিয়া তেতালার কোঠায় নিজের খোলা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হিন্দী ও ইংরাজিতে ইহার জবাব দিতেছে, এবং একটা ঘোড়ার চাবুক লইয়া মাঝে মাঝে সাঁই সাঁই শব্দ করিতেছে। তেওয়ারী তাহাকে নীচে ডাকিতেছে,

সে তাহাকে উপরে আহ্বান করিতেছে,—এবং এই সৌজন্তের আদান-প্রদান যে ভাষায় চলিতেছে তাহা না বলাই ভাল।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়া অপূর্ব তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। এইটুকু সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা যে কি ঘটিল, কি উপায়ে তেওয়ারীজী এইটুকু অবসরেই প্রতিবেশী সাহেবের সহিত এতখানি ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল সে তাহার কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু অকস্মাৎ বোধ হয় দুই পক্ষের দৃষ্টিই তাহার উপর নিপতিত হইল। তেওয়ারী মনিবকে দেখিয়া আর একবার সঙ্গে লেগে লাঠি মারিয়া কি একটা মধুর সন্তোষ করিল, সাহেব তাহার জবাব দিয়া প্রচণ্ডশব্দে চাবুক আফালন করিলেন, কিন্তু পুনশ্চ যুদ্ধ ঘোষনার পূর্বেই অপূর্ব দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া লাঠি শুদ্ধ তেওয়ারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তুমি কি ক্ষেপে গেছিস? এই বলিয়া তাহাকে প্রতিবাদেই অবসর না দিয়াই জোর করিয়া ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। ভিতরে গিয়া সে রাগে, ছুখে ক্ষোভে কান্দ-কান্দ হইয়া কহিল, এই দেখুন হারামজাদা সাহেব কি কাণ্ড করেছে।

বাস্তবিক, কাণ্ড দেখিয়া অপূর্বের শ্রান্তি এবং ঘুম, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা একই কালে অন্তহিত হইয়া গেল। সুদীর্ঘ খেচরানের হাঁড়ি হইতে তখন পর্যন্ত উত্তাপ ও মসলার গন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে, কিন্তু তাহার উপরে, নীচে, আশে-পাশে চতুর্দিকে জল থৈ থৈ করিতেছে। এ ঘরে আসিয়া দেখিল তাহার সমস্ত চিত্ত ধপ ধপে বিছানাটি ময়লা কালো জলে ভাসিতেছে। চেয়ারে জল, টেবিলে জল, বইগুলো জল ভিজিয়াছে। বাক্স-বোরঙ্গের উপরে জল জমা হইয়া রহিয়াছে, সে কি এক কোণে রাখা কাপড়ের আলনাটি অবধি বাদ যায় নাই। তাহার দানী নীচের স্টাটের গায়ে পর্যন্ত ময়লা জলের দাগ লাগিয়াছে।

অপূর্ব নিঃশ্বাস রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করে হল?

তেওয়ারী আঙুল দিয়া উপরের ছাদ দেখাইয়া কহিল, ওই শালা
সাহেবের কাজ। ঐ দেখুন—

বস্তুতঃ কাঠের ছাদের ফাঁক দিয়া তখন পর্য্যন্ত ময়লা জলের ফোঁটা
স্থানে স্থানে চুঁয়াইয়া পড়িতেছিল। তেওয়ারী দুর্ঘটনা যাহা বিবৃত করিল
তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

অপূর্ব যাইবার মিনিট কয়েক পরেই সাহেব বাড়ী আসেন।
আজ খুশানের পরদিন। এবং খুব সম্ভব উৎসব ঘোরালো করিবাদ
উদ্দেশ্যেই তিনি বাহিরে হইতেই একেবারে ঘোর হইয়া আসেন।
প্রথমে গীত ও পরে নৃত্য শুরু হয়। এবং অচিরেই উভয় সংযোগে
শাপ্তোক্ত ‘সংগীত’ এরূপ ভূদান হইয়া উঠে যে, তেওয়ারীর আশঙ্কা
হয় কাঠের ছাদ হয়ত বা সাহেবের এত বড় আনন্দ বহন করিতে
পারিবে না, সবশুদ্ধ তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ইহাও সহিয়াছিল,
কিন্তু রান্নার অদূরেই যখন উপর হইতে জল পড়িতে লাগিল, তখন
সমস্ত নষ্ট হইবার ভয়ে তেওয়ারী বাহির হইয়া প্রতিবাদ করে।
কিন্তু সাহেব,—তা কালাই হোন বা ধলাই হোন,—দেশী গোকের
এই স্পর্দ্ধা সহ করিতে পারেন না, উত্তেজিত হইয়া উঠেন, এবং
মূহুর্তকালেই এই উত্তেজনা এরূপ প্রচণ্ড ক্রোধে পরিণত হয় যে,
তিনি ঘরের মধ্যে গিয়া বালুতি বালুতি জল ঢালিয়া দেন। ইহার
পরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য—অপূর্ব নিজেও কিছু কিছু
স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

অপূর্ব কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, সাহেবের ঘরে কি আর
কেউ নেই ?

তেওয়ারী কহিল, কি জানি, আছে হয়ত। কে একজন মাতাল
বাঁটার সঙ্গে বুটোপুটি লড়াই করছিল। এই বলিয়া সে খিচড়ির
হাঁড়িটার প্রতি ক্রণচক্ষে চাহিয়া রহিল। অপূর্ব ইহার অর্থ বুঝিল।

অর্থাৎ কে একজন প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্য একতিল কমাইতে পারে নাই।

অপূর্ব নীরবে বসিয়া রহিল। যাহা হইবার হইয়াছে, কিন্তু নূতন উপদ্রব আর ছিল না। উৎসব-আনন্দ-বিস্ময় সাহেবের নব উদ্ভবের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বোধ করি এখন তিনি জমি লইয়া ছিলেন,—কেবল নিগার তেওয়ারীকে যে এখনও ক্ষমা করেন নাই, তাহারই অশ্রুট উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে শোনা যাইতে লাগিল।

অপূর্ব হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিল, তেওয়ারী, ভগবান না মাপালে এমনি মুখের গ্রাস নষ্ট হয়ে যায়। আয়, আমরা মনে করি আজও জাহাজে আছি। চিঁড়ে-মুড়কি-সন্দেশ এখনো ত কিছু আছে,—রাতটা চল যাবে। কি বলিস্ ?

তেওয়ারী মাথা নাড়িয়া সায় দিল, এবং ওই হাঁড়িটার প্রতি আর একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া চিঁড়ে-মুড়কির উদ্দেশে গাত্ৰোত্থান করিল। সৌভাগ্য এই যে, খাবারের বাক্সটা সেই যে ঢুকিয়াই রান্নাঘরের কোণে রাখা হইয়াছিল আর স্থানান্তরিত করা হয় নাই,—খুঁটানের জল অন্ততঃ এই রস্তুটার জাত মারিতে পারে নাই।

ফলারের খোগাড় করিতে করিতে তেওয়ারী রান্নাঘর হইতে কহিল, বাবু এখানে ত থাকা চলে না!

অপূর্ব অগ্নমনস্কভাবে বলিল, বোধ হয় না।

তেওয়ারী হালদার পরিবারের পুরাতন ভৃত্য, আসিবার কালে না তাহার হাত ধরিয়া যে কথাগুলি বলিয়া দিয়াছিল সেই সকল স্মরণ করিয়া সে উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিল, না বাবু, এ ঘরে আর একদিনও না। রাগের মাথায় ভাল কাজ করিনি, সাহেবকে আমি অনেক গাল দিয়েছি।—

অপূর্ব কহিল, হাঁ, গাল না দিয়ে তোর মারা উচিত ছিল।

তেওয়ারীর মাথায় ক্রোধের পরিবর্তে স্ববুদ্ধির উদয় হইতেছিল, সে তৎক্ষণাত্ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না বাবু, না। ওরা হাজার হোক সাহেব। আমরা বাঙালী।

অপূর্ব চূপ করিয়া রহিল। তেওয়ারী সাহস পাইয়া প্রশ্ন করিল, আফিসের দরওয়ানজীকে বলে কাল সকালেই উঠে যাওয়া যায় না? আমার ত মনে হয় যাওয়াই ভাল।

অপূর্ব কহিল, বেশ ত, বলে দেখিস্। সে মনে মনে বুঝিল সাহেবের প্রতি দেশী লোকের কর্তব্যবুদ্ধি ইতিমধ্যেই তেওয়ারীর স্তূতীক হইয়া উঠিয়াছে। দুর্জনের প্রতি আর তাহার নালিশ নাই, বরঞ্চ, কালব্যয় না করিয়া নিশঙ্কে স্থান ত্যাগই অবশ্যকর্তব্য স্থির করিয়াছে। কহিল, তাই হবে, তুই খাবার জোগাড় কর।

এই যে করি বাবু, বলিয়া সে কতকটা নিশ্চিতচিত্তে স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল, কিন্তু তাহারই কথার স্বত্ব ধরিয়া ওই ওপরওয়ালা ফিরিজিটার দুর্কাহার স্বরণ করিয়া অকস্মাত্ অপূর্বের সমস্ত চিত্ত ক্রোধে জলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এ তো কেবল আমি এবং ওই সাতালটাই শুধু নয়। সবাই মিলিয়া লাঞ্ছনা এমন নিত্যনিয়ত সুহিয়া যাই বলিয়াই ত ইহাদের স্পর্ধা দিনের পর দিন পুষ্ট ও পুঞ্জীভূত হইয়া আজ এমন অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে যে আমাদের প্রতি অত্যাচারে বিচার সে উচ্চ শিখরে আর পৌছিতে পর্য্যন্ত পারে না! নিশঙ্কে ও নিষ্কিচारे সহ করা কেই কেবল নিজেদের কর্তব্য করিয়া তুলিয়াছি বলিয়া অপরের আঘাত করিবার অধিকার এমন স্বতঃই স্বদৃঢ় ও উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ আমার চাকরটা পর্য্যন্ত আমাকে অবিলম্বে পলাইয়া আত্মরক্ষার উপদেশ দিতে পারিল, লজ্জা-সরমের প্রশ্ন পর্য্যন্ত তাহার মনে উদয় হইল না! কিন্তু সে বেচারী রাস্তাঘরে বসিয়া চিড়-মুড়কির কলাহার প্রভুর জগৎ সম্বন্ধে প্রস্তুত করিতে লাগিল, জানিতেও পারিলনা

তাহারি পরিত্যক্ত মোটা বাঁশের লাঠিটা হাতে করিয়া অপূর্ব নিঃশব্দ পদে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

দ্বিতলে সাহেবের দরজা বন্ধ ছিল, সেই রুদ্ধ দ্বারে গিয়া সে বারবার আঘাত করিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ভীত নারীকণ্ঠের ইংরাজিতে সাড়া আসিল, কে ?

অপূর্ব কহিল, আমি নোচে থাকি। সেই লোকটাকে একবার চাই। কেন ?

তাকে দেখাতে চাই সে আমার কত ক্ষতি করেছে। তার ভাগ্য ভাল যে আমি ছিলাম না।

তিনি শুয়েছেন।

অপূর্ব অত্যন্ত পরুষকণ্ঠে কহিল, তুলে দিন, এ শোবার সময় নয়। রাত্রে শুলে আমি বিরক্ত করতে আসব না। কিন্তু, এখন তার মুখের জবাব না নিয়ে আমি এক পা নড়ব না। এবং ইচ্ছা না করিলেও তাহার হাতের মোটা লাঠিটা কাঠের সিঁড়ির উপর ঠকাস্ করিয়া একটা মস্ত শব্দ করিয়া বসিল।

কিন্তু দ্বারও খুলিল না, কোন জবাবও আসিল না। মিনিট দুই অপেক্ষা করিয়া অপূর্ব পুনশ্চ চীৎকার করিল, আমি কিছুতেই যাব না,— বলুন তাকে বাইরে আসতে।

ভিতরে যে কথা কহিতেছিল এবার সে রুদ্ধদ্বারের একান্ত সম্মুখে আসিয়া নয় ও অতিশয় মুহূর্ত্তে কহিল, আমি তাঁর মেয়ে। বাবার হয়ে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। তিনি কিছু করেছেন সজ্ঞানে করেন নি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমার যত ক্ষতি হয়েছে কাল আমরা তার যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ কোরব।

মেয়েটির কোমল স্বরে অপূর্ব নরম হইল, কিন্তু তাহার রাগ পড়িল না। কহিল, তিনি বর্ষের মত আমার যথেষ্ট লোকমান এবং

ততোধিক উৎপাত করেছেন। আমি বিদেশী লোক বটে, কিন্তু আশা করি কাল সকালে নিজে দেখা করে আমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করবার চেষ্টা করবেন।

মেয়েটি কহিল, আচ্ছা। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার মত আমরাও এখানে সম্পূর্ণ নূতন। মাত্র কাল বৈকালে আমরা মৌলমিন থেকে এসেছি।

অপূর্ব আর কোন কথা না কহিয়া আশ্বে আশ্বে নীচে নামিয়া গেল। ঘরে গিয়া দেখিল তখন পর্য্যন্ত তেওয়ারী ভোজনের উদ্বোধনই ব্যাপৃত আছে, এত কাণ্ড সে টেরও পায় নাই।

ছ'টি খাইয়া লইয়া অপূর্ব তাহার শোবার ঘরে আসিয়া ভিজা তোষক বালিশ প্রভৃতি নীচে ফেলিয়া দিয়া বাত্রিটার মত কোনমতে একটা শয্যা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। প্রবাসের মাটিতে পা দিয়া পর্য্যন্ত তাহার ক্ষতি বিরক্তি ও হয়রাণির অবধি নাই; কি জানি এ যাত্রা তাহার কি ভাবে কাটিবে, কোথায় গিয়া ইহার কি পরিণাম ঘটবে, —এই স্বস্তি-শান্তিহীন উদ্ভিন্ন চিন্তার সহিত মিশিয়া আরও একটা কথা তাহার মনে হইতেছিল ওই অপরিচিত গৃহীন মেয়েটিকে। সে সম্মুখে বাহির হয় নাই,—কেমন দেখিতে, কত বয়স, কিরূপ স্বভাব কিছুই অহুমান করিতে পারে নাই,—শুধু এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছে তাহার ইংরাজি উচ্চারণ ইংরাজের মত নয়। হয়ত, মাদ্রাজী হইবে, না হয়ত, গোয়ানিজ কিম্বা আর কিছু হইবে,—কিন্তু আর যাহাই হোক, সে যে আপনাকে উদ্ধত গৃহীন ধর্ম্মাবলম্বী রাজার জাতি মনে করিয়া তাহার পিতার মত অত্যন্ত দপিতা নয়, সে যে তাঁহার অত্যাচারের জন্ত লজ্জা অনুভব করিয়াছে,—তাহার সেই ভীত, বিনীত, কর্ণের ক্ষমভিক্ষা নিজেদের পক্ষ তীব্র অভিযোগের সহিত এখন কেন বেহুয়া বাজিতে লাগিল। স্বভাবতঃ, সে উগ্র প্রকৃতির নহে, কাহাকেও

কঠিন কথা বলিতে তাহার বাধে, বিশেষতঃ, তেওয়ারীর বর্ণনার সহিত মিলাইয়া যখন মনে হইল, হয়ত, এই মেয়েটিই তাহার মাতাল ও দুর্বৃত্ত পিতাকে নিবারণ করিতে নীরবে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহার অহুতাপের সহিত মনে হইতে লাগিল, আজিকার মত চূপ করিয়া গেলেই ভাল হইত। যাহা ঘটিবার তাহা ত ঘটিয়াই ছিল, ক্রোধের উপর উপরে গিলা কথাগুলি না বলিয়া আসিলেই চনিত।

ও-ঘরে তেওয়ারীর ঘসা-মাজার কর্কশ শব্দ অবিশ্রাম শুনা যাইতেছিল, হঠাৎ সেটা থামিল। এবং পরক্ষণেই তাহার গলা শোনা গেল, কে ?

অপূর্ব চকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু জবাব শুনিতে পাইল না। কিন্তু তৎপরিবর্তে তেওয়ারীর প্রবল কণ্ঠস্বরই তাহার কানে আসিয়া পৌছিল। সে তাহার হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিল, না না, মেমসাহেব, ওসব তুমি নিয়ে যাও। বাবুর খাওয়া হয়ে গেছে,—ও-সব আমরা ছুঁইনে।

অপূর্ব উঠিয়া বসিয়া কান খাড়া করিয়া সেই গৃষ্টান মেয়েটির কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল, কিন্তু কথা বুঝিতে পারিল না, বুঝাইয়া দিল তেওয়ারী। কহিল, কে বললে আমাদের খাওয়া হয়নি ? হয়ে গেছে। ও-সব তুমি নিয়ে যাও, বাবু শুনলে তারি রাগ করবেন বল্চি।

অপূর্ব নিশ্চয়ে উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কি হয়েছে তেওয়ারী ?

মেয়েটি চৌকাটের এদিকে ছিল, তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। তখন সেইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে, আলো জ্বালা হয় নাই, সিঁড়ির দিক হইতে একটা অন্ধকার ছায়া ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মেয়েটিকে বেশ স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝা গেল। তাহার রঙ ইংরাজের মত শাদা নয়, কিন্তু খুব ফসর্দী। বয়স উনিশ-কুড়ি কিংবা কিছু বেশি হইতে পারে। এবং একটু লম্বা বলিয়াই বোধ হয় কিছু বোকা দেখাইল। উপরের টোলের নীচে স্বমুখের দাঁত দুটি একটু উচু মনে না হইলে মুখখানি বোধ করি ভালই। পায়ে চটি জুতা, পরণে চমৎকার একখানি

• মাদ্রাজী শাড়ী,—সম্ভবতঃ, উৎসব বলিয়া,—কিন্তু ধরণটা কতক বাঙালী, কতক পার্শীদের মত। একটি জাপানি সাজিতে করিয়া কয়েকটি আপেল, নাশপাতি, গুটি দুই বেদানা এবং এক গোছা আঙুর হুমুখে মেজের উপর রাখা রহিয়াছে।

অপূর্ব কহিল, এ সব কেন ?

মেয়েটি বাহিরে হইতে ইংরাজিতে আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ আমাদের পর্কদিন, মা পাঠিয়ে দিলেন। তা'ছাড়া আজত আপনাদের খাওয়া হয়নি।

অপূর্ব কহিল, আপনার মাকে ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের খাওয়া হয়নি তাঁকে কে বল্লে ?

মেয়েটি লজ্জিতস্বরে কহিল, ওই নিয়েই প্রথমে ঝগড়া হয়। তা'ছাড়া আমরা জানি।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, তাঁকে সহস্র ধন্যবাদ, কিন্তু সত্যি আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েটি এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, তা' বটে, কিন্তু সে ভাল হয়নি। আর এসব ত বাজারের ফল,—এতে ত কোন দোষ নেই।

অপূর্ব বুঝিল তাহাকে কোনমতে শাস্ত করিবার জন্ত অপরিচিত দুটি রমণীর উদ্বেগের অবধি নাই। অলক্ষণ পূর্বে সে লাঠি ও গলার শব্দে তাহার মেজাজের যে পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কাল সকালে যে কি হইবে এই ভাবিয়াই তাহাকে প্রসন্ন করিতে ইহারা এই ভেট লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই, সদয়কণ্ঠে কহিল, না, কোন দোষ নেই। তেওয়ারীকে কহিল, বাজারের ফল, এ নিতে আর দোষ কি থাকুর ?

তেওয়ারী ঠাকুর খুসি হইল না, কহিল, বাজারের ফল ত বাজার থেকে আন্লেই চলবে। আজ রাত্রে আমাদের দরকারও নেই, আর না আমাকে এ সব করতে বার বার নিষেধ করেছেন। মেম সাহেব, এসব তুমি নিয়ে যাও,—আমাদের চাইনে।

মা যে নিষেধ করিয়াছেন, বা করিতে পারেন ইহাতে অসম্ভব কিছু নাই, এবং বহুদিনের পুরাতন ও বিশ্বাসী তেওয়ারী ঠাকুরকে যে এ সকল ব্যাপারে প্রবাসে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন তাহাও সম্ভব। এই সেদিন সে জননীর কাছে কি প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিল, শুধুত কেবল মাতৃ-আজ্ঞা নয়, আমি সত্য দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তথাপি ওই সঙ্কুচিত, লজ্জিত, অপরিচিত মেয়েটি—যে তাহাকে প্রশ্ন করিতে ভয়ে ভয়ে তাহার দ্বারে আসিয়াছে—তাহার উপহারের সামান্য দ্রব্যগুলিকে অস্পৃশ্য বলিয়া অপমান করাকেও তাহার সত্য বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু এ কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, মৌন হইয়া রহিল। তেওয়ারী বলিল, ও-সব আমরা ছোঁবনা মেম সাহেব, তুমি তুলে নিয়ে যাও, আমি যাগগাটা ধুয়ে ফেলি।

মেয়েটি চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া ডালাটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

অপূর্ণ চাপা রুক্ষস্বরে কহিল, না হয় না-ই খেতিস্, নিয়ে চুপি চুপি ফেলে দিতেও ত পারতিস্!

তেওয়ারী আশ্চর্য হইয়া বলিল, নিয়ে ফেলে দেব? ছোঁমিছি নষ্ট করে লাভ কি বাবু!

লাভ কি বাবু! মুখ্য, গোয়ার কোথাকার! এই বলিয়া অপূর্ণ ভইতে চলিয়া গেল। বিছানায় শুইয়া প্রথমটা তাহার তেওয়ারীর প্রতি ক্রোধে সর্বাপেক্ষা জলিতে লাগিল, কিন্তু যতই সে ব্যাপারটা তন্ন তন্ন করিয়া

আলোচনা করিতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল, এ আমি পারিতাম না, কিন্তু হয়ত এ ভালই হইয়াছে সে স্পষ্ট করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। হঠাৎ তাহার বড় মাতুলকে মনে পড়িল। সেই সদাচারী, নিষ্ঠাবান, পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ একদিন তাহাদের বাটীতে অন্নাহার করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। স্বাকার করিবার ঘো নাই করুণাময়ী তাহা জানিতেন, তথাপি স্বামীর সহিত ভ্রাতার মনোমালিঙ্গা বাঁচাইতে কি একটা কৌশল অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহাতে মুহু হাসিয়া কহিয়াছিলেন, না দিদি, সে হতে পারেনা। হালদার মহাশয় রাগী লোক, এ অপমান তিনি সহিবেন না,—হয়ত বা তোমাকেও কিছু ভাগ নিতে হবে;—কিন্তু আমার স্বর্গীয় গুরুদেব বলতেন, মুরারী সত্য পালনের দুঃখ আছে, তাকে আঘাতের মধ্যে দ্বিগুণে বরঞ্চ একদিন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বঞ্চনা প্রতারণার নিষ্ঠ পথ দিয়ে সে কোনদিন আনাগোনা করেনা। এই ভাল, যে আমি না খেয়েই চলে গেলাম বোন।

এই লইয়া করুণাময়ীর অনেকদিন অনেক দুঃখ গিয়াছে, কিন্তু কোনদিন দাদাকে তিনি দোষ দেন নাই। সেই কথা স্মরণ করিয়া অপূর্ব মনে মনে বার বার কহিতে লাগিল,—এ ভালই হয়েছে,—তেওয়ারী ঠিক কাজই করেছে।

(৩)

অপূর্বের ইচ্ছা ছিল সকালে বাজারটা একবার ঘুরিয়া আসে। ইহার স্বেচ্ছাচারের দুর্নাম ত সমুদ্র পার হইয়া তাহার মাথের কানে পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে, অতএব তাহাকে অস্বীকার করা চলে না,—মানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু, হিন্দুদের ধ্বজা বহিয়া সে-ই ত প্রথম কালাপানি পার হইয়া আসে নাই!—সত্যকার হিন্দু আরও ত থাকিতে পারেন বাহারা চাকরির প্রয়োজন ও শাস্ত্রের অহুশাসন দুয়ের মাঝামাঝি একটা

পথ ইতিপূর্বেই আবিষ্কার করিয়া ধর্ম ও অর্থের বিরোধ ভঞ্জন করতঃ স্থখে বসবাস করিতেছেন! সেই স্বগম পথের সন্ধান লইতে ইহাদের সহিত পরিচিত হওয়া অত্যাশঙ্কক, এবং, বিদেশে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার এত বড় সুযোগ বাজার ছাড়া আর কোথায় মিলিবে? বস্তুতঃ, নিজের কানে শুনিয়া ও চোখে দেখিয়া এই জিনিসটাই তাহার স্থির করা প্রয়োজন যে, জননীর বিরুদ্ধাচারী না হইয়া এ দেশে বাস্তবিক বাস করা চলে কিনা। কিন্তু বাহির হইতে পারিল না, কারণ, উপরের সাহেবটা যে কখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিবে তাহার ঠিকানা নাই। সে যে আসিবেই তাহাতে সন্দেহ ছিল না। একেত, উৎপাত সে সজ্ঞানে করে নাই, এবং আজ যখন তাহার নেশা ছুটিবে, তখন খ্রী ও কল্যা তাহাকে কিছুতেই অব্যাহতি দিবে না, তাহাদের মুখের এই অত্যাচারিত ইঙ্গিত সে গত কল্যই আদায় করিয়া আসিয়াছে। মেয়েটিকে আজ ঘুম ভাঙিয়া পঞ্চান্ত অনেকবার মনে পড়িয়াছে। ঘুমের মধ্যেও যেন তাহার ভদ্রতা, তাহার সৌজন্ম, তাহার বিনয়নয় কণ্ঠস্বর কানে কানে একটা জানা-স্বরের রেশের মত আনাগোনা করিয়া গেছে। মাতাল পিতার দুরাচারে ওই মেয়েটিরও যেমন লজ্জার অবধি ছিল না, মূর্খ তেওয়ারীর রুচতায় অপূর্ণ নিজেও তেমনি লজ্জা বোধ না করিয়া পারে নাই। পরের অপরাধে অপরাধী হইয়া এই দুটি অপরিচিত মনের মাঝখানে বোধ করি এইখানেই একটি সমবেদনার সুস্থ সূত্র ছিল, যাহাকে না বলিয়া অস্বীকার করিতে অপূর্বর মন সুরিতছিল না। হঠাৎ মাথার উপরে প্রতিবেশীকে জাগিয়া উঠার সাড়া নীচে আসিয়া পৌছিল, এবং প্রত্যেক সজ্ঞ পদক্ষেপেই সে আশা করিতে লাগিল এইবার সাহেব তাহার দরজায় নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইবেন। ক্ষমা সে করিবে তাহা স্থির, কিন্তু, বিগত দিনের বীভৎসতা কি করিলে যে সহজ এবং সামান্য হইয়া বিবাদের দাগ

‘মুহাইয়া’ দিবে ইহাই হইল তাহার চিন্তা। কিন্তু মার্জনা চাহিবার সময় বহিয়া যাইতে লাগিল। উপরে ছোটখাটো পদক্ষেপের সঙ্গে মিশিয়া সাহেবের জুতার শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে তাহার পায়ের বহর ও দেহের ভারের পরিচয় দিল, কিন্তু দীনতার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। এইরূপে আশায় ও উদ্বেগে প্রতীক্ষা করিয়া ঘড়িতে যখন নয়টা বাজিল, এবং নিজের নূতন আফিসের জন্ত প্রস্তুত হইবার সময় তাহার আগ্রহ হইয়া উঠিল, তখন শোনা গেল সাহেব নীচে নামিতে শুরু করিয়াছেন। তাহার পিছনে আরও দুটি পায়ের শব্দ অপূর্ণ কান পাতিয়া শুনি। অনতিবিলম্বে তাহার কপাটের লোহার কড়ার ভীষণ কন্‌কনা উঠিল, এবং রান্নাঘর হইতে তেওয়ারী ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, বাবু, কালকের সাহেব ব্যাটা এসে কড়া নাড়ছে। তাহার উদ্বেজনা কণ্ঠস্বরে গোপন রহিল না।

অপূর্ণ কহিল, দোর খুলে দিয়ে তাঁকে আসতে বল।

তেওয়ারী দ্বার খুলিয়া দিতেই অপূর্ণ অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইল,—এই, তুম্‌হারা সাব্ কিব্বু?

উত্তরে তেওয়ারী কি কহিল ভাল শুনা গেল না, খুব সম্ভব সম্মুখে অভ্যর্থনা করিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সাহেবের আশ্চর্য্য সিঁড়ির কাঠের ছাদে ধাক্কা থাইয়া ঘেন হুকার দিয়া উঠিল, বোলাও!

ঘরের মধ্যে অপূর্ণ চমকিয়া উঠিল। বাপ্প্রে! একি অনুতাপের গলা! একবার মনে করিল সাহেব সকালেই মদ খাইয়াছে, অতএব, ঐ সময়ে যাওয়া উচিত কিনা ভাবিবার পূর্বেই পুনশ্চ ছকুম আসিল, বোলাও জল্‌দি।

অপূর্ণ আস্তে আস্তে কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সাহেব এক মুহূর্ত্ত তাহার অপদামন্তক নিরীক্ষণ করিয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, • তুমি ইংরাজি জান?

জানি।

আমি ঘুমিয়ে পড়ার পরে কাল তুমি আমার উপরে গিয়েছিলে ?

হাঁ।

সাহেব कहিলেন, ঠিক। লাঠি ঠুকেছিলে ? অনধিকার প্রবেশের জ্ঞান দোর ভাঙতে চেষ্টা করেছিলে ?

অপূর্ব বিষ্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। সাহেব বলিলেন, দৈবাৎ দোর খোলা থাকলে ঘরে ঢুকে তুমি আমার জ্বীকে কিম্বা মেয়েকে আক্রমণ করত। তাই আমি জেগে থাকতে যাওনি ?

অপূর্ব ধীশ্রদ্ধে ধীরে कहিল, তুমি ত ঘুগিয়েছিলে, এ সব জানলে কি করে ?

সাহেব कहিলেন, সমস্ত আমার মেয়ের কাছে শুনেচি। তাকে তুমি গালিগালাজ করে এসেচ। এই বলিয়া সে তাহার পার্শ্ববর্তিনী কন্যাকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিল। এ সেই মেয়েটি কিন্তু কালও ইহাকে ভাল করিয়া অপূর্ব দেখিতে পায় নাই, আজও সাহেবের বিপুলায়তনের অন্তরালে তাহার কাপড়ের পাড়টুকু ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইল না। সে দাড় নাড়িয়া সায় দিল কিনা তাহাও বুঝা গেল না, কিন্তু এটুকু বুঝা গেল ইহার সহজ মাহুষ নয়। সমস্ত ব্যাপারটাকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত ও উল্টা করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব, অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সাহেব कहিলেন, আমি জেগে থাকলে তোমাকে লাঠি মেয়ে বাস্তায় ফেলে দিতাম, এবং এফটা দাঁতও তোমার মুখে আস্ত রাখতাম না, কিন্তু সে স্বযোগ যখন হারিয়েছি, তখন, পুলিশের হাতে যেটুকু আর পাওয়া যায় সেইটুকু নিয়েই এখন সন্তুষ্ট হতে হবে। আমরা যাচ্ছি, তুমি এর জাল প্রস্তুত থাক গে।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া कहিল, আচ্ছা। কিন্তু তাহার মুখ অত্যন্ত য়ান হইয়া গেল।

সাঁথের মেয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, এস। এবং নামিতে নামিতে বলিলেন, কাণ্ডার্ড! অরক্ষিত স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেবার চেষ্ঠা! আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যা' তুমি জীবনে ভুলবে না।

তেওয়ারী পাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতোছিল, তাঁহারা অন্তর্হিত হইতেই কাদ-কাদ হইয়া কহিল, কি হবে ছোটবাবু?

অপূর্ব তাচ্ছল্যভরে কহিল, হবে আবার কি!

কিন্তু তাহার মুখের চেহারা যে অগ্ন্যকথা কহিল, তেওয়ারী তাহা বুঝিল। কহিল, তখনি ত বলেছিলুম বাবু, যা, হবার হয়ে গেছে আর ওদের ঘেঁটিয়ে কাজ নেই। ওরা হ'ল সাহেব-মেম।

অপূর্ব বলিল, সাহেব-মেম তা কি?

তেওয়ারী কহিল, ওরা যে পুলিশে গেল!

অপূর্ব বলিল, গেল তা কি?

তেওয়ারী ব্যাকুল হইয়া কহিল, বড়বাবুকে একটা তার করে দিই ছোটবাবু, তিনি না হয় এসে পড়ুন।

তুই ফেপ্লি তেওয়ারী! যা দেখ্‌গে, ওদিকে বুঝি সব পুড়ে ঝুড়ে গেল। সাড়ে দশটিয় আমাকে বেরোতে হবে। এই বলিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তেওয়ারীও রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, কিন্তু বাধা-বাড়ার কাজ হইতে বাবুর আফিসে যাওয়া পর্য্যন্ত যা কিছু সমস্তই তাহার কাছে একেবারে অর্থহীন হইয়া গেল। এবং যতই সে মনে মনে আপনাকে সমস্ত আপদের হেতু বলিয়া দিক্কার দিতে লাগিল, ততই তাহার উদ্ভাস্ত চিত্ত এদেশের স্বেচ্ছতার উপরে, গ্রহ নক্ষত্রের মন্দ দৃষ্টির উপরে, পুরোহিতের গণনার ভ্রমের উপরে এবং সর্বোপরি করুণাময়ী অর্থলিপ্সার উপরে দোষ চাপাইয়া কোনমতে একটু সান্ত্বনা খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

এমনিপ্রায়া মন লইয়াই তাহাকে রান্নার কাজ শেষ করিতে হইল।

করণাময়ীর হাতে-গড়া মানুষ সে, অতএব মন তাহার যতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকুক, হাতের কাজে কোথাও ভুলচুক হইল না। যথাসময়ে আহারে বসিয়া অপূর্ব তাহাকে সাহস দিবার অভিপ্রায়ে রন্ধনের কিছু বাড়াবাড়ি প্রশংসা করিল। একদফা অন্নব্যঞ্জনের চেহারার ঘণকৌতূহল করিল এবং হুই এক গ্রাম মুখে পুরিয়াই কহিল, আজ রেংদেছি যেন অমৃত, তেওয়ারী। কাদিন খাইনি, ভেবেছিলাম বুঝি বা সব পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে ফেলবি! যে ভীতু লোক তুই—আচ্ছা মানুষটিকে মা বেছে-বেছে সঙ্গে দিয়েছিলেন।

তেওয়ারী কহিল, হঁ।

অপূর্ব তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্তে কহিল, মুখখানা যে একেবারে তোলো হাঁড়ি করে রেখেছিস রে? এবং শুধু কেবল তেওয়ারীর নয়, নিজের মন হইতেও সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার চেষ্টায় কৌতুক করিয়া বলিল, হারামজাদা ফিরিঙ্গির শানানোর ঘটনাটা একবার দেখলি? পুলিশে যাচ্ছেন!—আরে, যা না তাই! গিয়ে করবি কি শুনি? তোরা সাফী আছে?

তেওয়ারী শুধু কহিল, সাহেব-মেমদের কি সাফী-সাব্দ লাগে বাবু, ওরা বললেই হয়।

অপূর্ব কহিল, হাঁ বললেই হয়! আইন-কাহুন যেন নেই! তাছাড়া ওরা আবার কিসের সাহেব মেম? রঙ-টিতো একেবারে আমার বার্বিস করা জুতো! ব্যাটা কচি ছেলেকে যেন জুজুর ভয় দেখিয়ে গেল! নছার, পাঙ্গি, হারামজাদা!

তেওয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আড়ালে গালি-গালাজ করিয়া মত তেজও আর তাহার ছিল না।

অপূর্ব কিছুক্ষণ নিঃশব্দে আহার করার পরে হঠাৎ এত তুলিয়া কহিল, আর ঐ মেয়েটা কি বজ্রাত, তেওয়ারী! কাল এলো যেন ভিজে বেরালটি, আর ওপরে গিয়েই যত সব মিছে কথা লাগিয়েচে! চেনা ভার!

• তেওয়ারী কহিল, থিষ্টান যে !

• তা বটে ! অপূর্বর তৎক্ষণাৎ মনে হইল ইহাদের খাতাখাত্তের জ্ঞান নাই, এঁটো-কাঁটা মানে না, সামাজিক ভাল-মন্দের কোন বোধ নাই,—কহিল, হতভাগা, নছার ব্যাটারা। জানিস্ তেওয়ারী, আসল সাহেবেরা এদের কি রকম থেলা করে—এক টেবিলে বসে কখন খায়না পর্য্যন্ত—যতই হাটকোট পকুন, আর যতই কেননা গির্জ্জয় আনাগোনো করুন। যারা জাত দেয়, তারা কি কথ খনো ভাল হতে পারে তুই মনে করিস্ ?

তেওয়ারী তাহা কোনো দিনই মনে করেনা, কিন্তু নিজেদের এই আসন্ন সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপরে কে ভাল আর কে মন্দ, এ আলোচনায় তাহার প্রবৃত্তি হইল না। ছোটবাবুর অফিসে যাইবার সময় হইয়া আসিতেছে, তখন একাকী ঘরের মধ্যে যে কি করিয়া তাহার সময় কাটিবে সে জানেনা। সাহেব থানায় খবর দিতে গিয়াছে, কিরিয়া আসিয়া হয়ত দোর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, হয়ত পুলিশের দল সঙ্গে করিয়া আনিবে,—হয়ত তাহাকে বাধিয়া লইয়া যাইবে,—কি যে হইবে, আর কি যে হইবে না সমস্ত অনিশ্চিত। এ অবস্থায় আসল ও নকল সাহেবের ঐভেদ কতখানি, একের টেবিলে অপরে খায় কি না, এবং না খাইলে অল্পপক্ষের লাঞ্ছনা ও মনস্তাপ কতদূর বৃদ্ধি পায় এ সকল সখাদের প্রতি সে লেশমাত্র কৌতূহল অনুভব করিল না। আহাৰাদি শেষ করিয়া অপূর্ব কাপড় পরিতেছিল, তেওয়ারী ঘরের পর্দাটা একটুখানি সরাইয়া মুখ বাহির করিয়া কহিল, একটু দেখে গেলে হত না ?

কি দেখে গেলে ?

• ওদের ফিরে আসা পর্য্যন্ত—

অপূর্ব কহিল, তা' কি হয়। আজ আমার চাকরীর প্রথম দিন,—কি তারা ভাববে বলত ?

তেওয়ারী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব কহিল, তুই দোর দিয়ে নির্ভয়ে

বসে থাক না—আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আসবো—দোর ত আর ভাঙতে পারবে না,—কি করবে সে ব্যাটা!

তেওয়ারী কহিল, আচ্ছা। কিন্তু সে যে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিল অপূর্ব তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। বাহির হইবার সময়ে দ্বারে থিল দিবার পূর্বে তেওয়ারী গলাটা খাটো করিয়া বলিল, আজ আর হেঁটে যাবেন না ছোটবাবু, রাস্তায় একটা গাড়ী ডেকে নেবেন।

আচ্ছা, সে দেখা যাবে, এই বলিয়া অপূর্ব সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। তাহার চলার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল না যে তাহার মনের মধ্যে নূতন চাকরির আনন্দ আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে।

বোথা কোম্পানির অংশীদার, পূর্ব অঞ্চলের ম্যানেজার যোজেন সাহেব সম্প্রতি বস্মায় ছিলেন, বেঙ্গলের আফিস তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অপূর্বকে যথেষ্ট সহায়তার সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার চেহারা কথাবার্তা ও ইউনিভারসিটির ডিগ্রী প্রভৃতি দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। সমস্ত কর্মচারীদের ডাকিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন, এবং যে মাস দুই তিন কাল তিনি এখানে আছেন তাহার মধ্যে ব্যবসায়ের সমস্ত রহস্য শিখাইয়া দিবেন আশা দিলেন। কথায় বার্তা, আলাপে পরিচয়ে ও নূতন উৎসাহে ভিতরের গ্লানিটা তাহার এক সময়ে কাটিয়া গেল। একটি লোক তাহাকে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট করিল, সে আফিসের এ্যাকাউন্টেন্ট। নারাতি ব্রাহ্মণ, নাম রামদাস তলওয়ারকর। বয়স বোধ হয় তারুই মত,—হয়ত বা কিছু বেশি। দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ,—স্বপুরুষ বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। পরণে পাটলা নাও লগ্না কোট, মাথায় পাগ্‌ডী, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। হংরাজি কথাবার্তা চমৎকার শুদ্ধ, কিন্তু অপূর্বের সহিত সে প্রথম হইতে হিন্দীতে কথাবার্তা শুরু করিল। অপূর্ব ভাল হিন্দী জানিত না, কিন্তু যখন দেখিল সে হিন্দী ছাড়া আর কিছুতেই জবাব দেয় না, তখন সেও হিন্দী

বলিতে আরম্ভ করিল। অপূর্ব কহিল, এ-ভাষা আমি ভাল জানিনে, অনেক ভুল হবে।

রামদাস কহিল, ভুল আমারও হয়, আমাদের কারও এটা মাতৃভাষা নয়।

অপূর্ব বলিল, যদি পরের ভাষাতেই বলতে হয় ত, ইংরিজি দোষ করলে কি?

রামদাস কহিল, ইংরিজি আমার আরও ঢের বেশি ভুল হয়। একটু হাসিয়া কহিল, আপনি না হয় ইংরাজিতেই বলবেন, কিন্তু আমি হিন্দীতে জবাব দিলে আমাকে মাপ করতে হবে।

অপূর্ব কহিল, আমিও হিন্দী বলতেই চেষ্টা করব, কিন্তু ভুল হলে আমাকেও মাপ করতে হবে।

এই আলাপের মধ্যে রোজেন সাহেব নিজেই ম্যানেজারের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, হল্যাণ্ডের লোক, বেশ-ভূষার পারিপাট্য নাই, মুখে প্রচুর দাড়ি-গোঁফ, ইংরাজি উচ্চারণ ভাঙা-ভাঙা, পাকা ব্যবসায়ী—ইতিমধ্যেই বর্মার নানাস্থানে ঘুরিয়া, নানা লোকের কাছে তথ্য সংগ্রহ করিয়া কাজ-কর্মের একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই কাগজখানা অপূর্বের টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এ-সমক্ষে আপনার মন্তব্য একটা জানতে চাই। তলওয়ার-করকে কহিলেন, আপনার ঘরেও এক কাপি পাঠিয়ে দিয়েছি। না না, এখন থাক—আজ ম্যানেজারের সম্মানে দুটোর সময় অফিসের ছুটি। দেখুন, আমিত শীঘ্রই চলে যাবো, তখন, আপনাদের দুজনের 'পরেই' সমস্ত কাজ-কর্ম নির্ভর করবে। আমি ইংলিশম্যান নই,—যদিচ, এ রাজ্য একদিন আমাদেরই হতে পাবত,—তবুও তাদের মত, আমরা ইণ্ডিয়ানদের ছোট মনে করিনে, নিজেদের সমকক্ষই ভাবি,—কেবল ফার্মের নষ্ট, আপনাদের নিজেদের উন্নতিও আপনাদের নিজেদের কর্তব্য-

জ্ঞানের উপরে—আচ্ছা, শুভ্ ডে—অফিস দুটোর সময় বন্ধ হওয়া চাই—
ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি যেমন ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন,
তেমনি ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেলেন। এবং ইহার অল্পক্ষণ পরেই
তাহার মোটরের শব্দ বাহিরের দ্বারের কাছে শুনিত হইয়া গেল।

বেলা দুইটার সময় উভয়ে একত্র পথে বাহির হইল। তলওয়ারকর
সহরে থাকে না, প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে ইন্সিন্ নামক স্থানে তাহার
বাসা। বাসায় তাহার স্ত্রী ও একটি ছোট মেয়ে থাকে, সঙ্গে খানিকটা
জমি আছে, সেখানে তরি-তরকারি অনায়াসে জন্মাইতে পারা যায়,
চমৎকার খোলা জায়গা, সহরের গুণগোল নাই,—যথেষ্ট ট্রেন, যাতায়াতের
কোন অসুবিধা হয় না।—হালদার বাবুজি, কাল আফিসের পরে আমার
ওখানে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল।

অপূর্ব কহিল, আমি চা খাইনে বাবুজি !

খান না ? আমিও পূর্বে খেতাম না, আমায় স্ত্রী এখনও রাগ
করেন,—আচ্ছা, না হয়, ফলমূল—সরবৎ—কিছা—আমায় আপনার
মতই ব্রাহ্মণ—

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, ব্রাহ্মণ ত বটেই। কিন্তু আপনারা যদি
আমাদের হাতে খান, তবেই আমি শুধু আপনার স্ত্রীর হাতে
খেতে পারি।

রামদাস কহিল, আমি ত খেতে পারিই, কিন্তু আমার স্ত্রীর কথা,—
আচ্ছা, সে তাঁকে জিজ্ঞেসা করে বলব। আমাদের মেয়েরা —আচ্ছা
আপনার বাসা ত কাছেই, চলুন না আপনাকে পৌছে দে আসি,
আমার ট্রেন ত সেই পাঁচটায়।

অপূর্ব প্রমাদ গণিল। এতক্ষণ সে সমস্ত ভুলিয়া ছিল, বাসার কথায়
চক্ষের নিক্স তাহার সমস্ত হাঙ্গামা, সমস্ত কদর্যতা বিহীন স্বপ্নের
ন্যায় চমকিয়া মুখের সরসঙ্গী যেন মুছিয়া দিয়া গেল। এখানে পৌ দিয়াই

সে এমন একটা কদর্যা নেড়ীরা ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এ-কথা জানিতে দিতে তাহার মাথা কাটা গেল। এতক্ষণ সেখানে যে কি হইয়াছে সে কিছুই জানে না। হয়ত, কত কি হইয়াছে। একাকী তাহারই মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এমন একজন পরিচিত মানুষকে সঙ্গে পাইলে কত সুবিধা, কত সাহস। কিন্তু সত্য পরিচয়ের এই আরম্ভকালেই সে যে হঠাৎ কি ভাবিয়া বসিবে এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব একান্ত সঙ্কচিত হইয়া উঠিল, কহিল, দেখুন, সমস্ত বিশৃঙ্খল—মুখের কথাটা সে শেষ করিতেও পারিল না। তাহার সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করিয়া রামদাস সহাস্তে কহিল, এক রাত্রে শৃঙ্খলা আমি ত আশা করিনে বাবুজি। আমাকেও একদিন নূতন বাসা পাততে হয়েছিল, তবুত আমার স্ত্রী ছিলেন, আপনার তাও সঙ্গে নেই। আপনি আজ লজ্জা পাচ্ছেন, কিন্তু তাঁকে না নিয়ে এলে এক বছর পরেও এই লজ্জা আপনার ঘূচবে না তা বলে রাখি। চলুন, দেখি কি করতে পারি,—বিশৃঙ্খলার মাঝখানেই ত বন্ধুর দরকার।

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। সে স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় লোক, তাহার দ্বার একান্ত অসম্ভাবের কথাটা সে অল্প সময়ে কৌতুক করিয়া বলিতেও পারিত, কিন্তু এখন হাসি-তামাসার কথা তাহার মনেও আসিল না। এই নির্বাকদেব দেশে আজ তাহার বন্ধুর একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু, সত্য পরিচিত এই বিদেশী বন্ধুটিকে সেই প্রয়োজনে আহ্বান করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার কথায় সে যে ঠিক সাহায্য দিল তাহা নহে, কিন্তু উভয়ে চলিতে চলিতে যখন তাহার বাসার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তলওয়ারজিকে গৃহে আমন্ত্রণ না করিয়া পারিল না। উপরে উঠিতে গিয়া দেখিতে পাইল সেই ক্রীচান মেয়েটিও ঠিক সেই সময়েই অবতরণ করিতেছে। বাপ তাহার সঙ্গে নাই, সে একা। দুজনে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি কাহারও প্রতি

দৃষ্টিপাত করিল না, ধীরে ধীরে নামিয়া কিছু দূরে রাস্তায় গিয়া যখন পড়িল, রামদাস জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা তে-তালার থাকেন বুঝি ?

অপূর্ব কহিল, হাঁ !

আপনাদেরই বাড়ালী ?

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, না দেশী ক্রীশান। খুব সম্ভব, মাদ্রাজী, কিম্বা গোয়ানিজ, কিম্বা আর কিছু,—কিন্তু বাড়ালী নয়।

রামদাস কহিল, কিন্তু কাপড় পরার ধরণ ত ঠিক আপনাদের মত ?

অপূর্ব কিছু আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, আমাদের ধরণ আপনি জানলেন কি করে ?

রামদাস বলিল, আমি ? বোধায়ে, পুনায়, সিমলায় অনেক বাড়ালী মহিলাকে আমি দেখেছি, এমন হুন্দর কাপড় পরা ভারতবর্ষের আর কোন জাতের নেই।

তা' হবে—এই বলিয়া অগ্রমনস্ক অপূর্ব তাহার বাসার রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। খানিক পরে ভিতর হইতে সতর্ক কণ্ঠের সাড়া আসিল, কে ?

আমি রে, আমি, দোর খোল্, তোর ভয় নেই, বলিয়া অপূর্ব হাসিল। কারণ, ইতিমধ্যে ভ্রমানক কিছু ঘটে নাই, তেওয়ারী নিরাপদে ঘরের মধ্যেই আছে অল্প ভব করিয়া তাহার মস্ত যেন একটা ভার নামিয়া গেল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামদাস এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া খুসি হইল, কহিল, আমি যা' ভয় করেছিলাম তা' নয় ! আপনার চাকরটি ভাল, সমস্তই একপ্রকার গুছিয়ে ফেলেছে। আসবাবগুলি আঁর্ পছন্দ করুন কিনেছিলাম। আপনার আরও কি-কি দরকার আমাকে জানালেই কিনে পাঠিয়ে দেব,—রোজেন সাহেবের জুঁম আছে !

তেওয়ারী মুহূর্ত্তে কহিল, আর আসবাবে কাজ নেই বাবু, ভাল-ভালয় বেরুতে পারলে বাঁচি।

তাহার মন্তব্যে কেহ মনোযোগ করিল না, কিন্তু, অপূর্বর কানে গেল। সে একসময়ে আড়ালে জিজ্ঞাসা করিল, আর কিছু হয়েছিল রে ?

না।

তবে যে ও-কথা বল্লি ?

তেওয়ারী জবাব দিল, বল্লুম সাধে ? সারা দুপুরবেলাটা সাহেব যা' ঘোড়-দৌড় করে বেড়িয়েচে তাতে মানুষ টিকতে পারে ?

অপূর্ব ভাবিল, ব্যাপারটা সত্যই হয়ত গুরুতর নয়, অন্ততঃ, একটা ইতরের ছোটখাটো সমস্ত তুচ্ছ উপদ্রবকেই বড় করিয়া তুলিয়া অন্তর্গণ তেওয়ারীর সহিত একযোগে অশান্তির জের টানিয়া চলাও অত্যন্ত দুঃখের, তাই সে কতকটা তাম্বল্যভরে কহিল, তা' সে কি চলবে না তুই বলতে চাস্ ? কাঠের ছাদে একটু বেশি শব্দ হয়ই।

তেওয়ারী রাগ করিয়া কহিল, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মত পা-টোকা কি চলা ?

অপূর্ব বলিল, তা' হলে হয়ত আবার মদ খেয়েছিল—

তেওয়ারী উত্তর দিল, তা হবে। মুখ শু'কে তার দেখিনি। এই বলিয়া সে বিরক্তমুখে রাস্তাঘরে চলিয়া গেল, এবং বলিতে বলিতে গেল, তা' সে বাই হোক, এ ঘরে বাস করা আর পোষাবে না।

তেওয়ারীর অভিযোগ অত্যাচার নয় অপ্রত্যাশিতও নয়; দুর্জনের অসমাপ্ত অত্যাচার যে একটা দিনেই সমাপ্ত হইবে এ ভরসা সে করে নাই, তথাপি অনিশ্চিত আশঙ্কায় মন তাহার অতিশয় বিষন্ন হইয়া উঠিল। প্রবাসের প্রথম প্রভাতটা তাহার কুয়াসার মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল, মাঝে কেবল আফিসের সম্পর্কে একটুখানি আলোর আভাস দেখা দিয়াছিল, কিন্তু দিনান্তের কাছাকাছি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আবার তাহার চোখে পড়িল।

ট্রেনের সময় হইতে রামদাস বিদায় গ্রহণ করিল। কি জানি তেওয়ারীর নালিশ ও তাহার মনিবের মুখের চেহায়ায় সে কিছু অনুমান করিয়াছিল কিনা, যাইবার সময় সহসা প্রশ্ন করিল, বাবুজি, এ বাসায় কি আপনার সুবিধা হচ্ছে না?

অপূর্ব ঈবং হাসিয়া কহিল, না। এবং রামদাস জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিল, উপরে যারা আছেন আমার সঙ্গে বড় সদয় ব্যবহার করতেন না!

রামদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, ওই মহিলাটি?

হাঁ, গুর বাপ ত বটেই। এই বলিয়া অপূর্ব কাল বিকালের ও আন্ধ্র সকালের ঘটনা বিবৃত করিল। রামদাস কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আনি হলে এর ইতিহাস আর এক রকম হতো। ক্ষমা প্রার্থনা না কোরে এই দরজা থেকে সে এক পা নীচে নামতে পারত না।

অপূর্ব কহিল, ক্ষমা না চাইলে কি করতেন?

রামদাস কহিল, এই যে বল্লুম,—নামতে দিতাম না।

• অপূর্ব কথাটা যে তাহার বিশ্বাস করিল তাহা নয়, তবুও সাহসের কথায় একটু সাহস পাইল। সহাস্তে কহিল, কিন্তু এখন আমরা ত নাশি চলুন, আপনার গাড়ীর সময় হয়ে যাচ্ছে। এই বলিয়া সে বন্ধুর হাত ধরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আসিবার সময় যেমন, যাইবার সময়েও ঠিক তেমনি সিঁড়ির মাপই সেই মেয়েটির সহিত দেখা হইল। হাতে তাহার টে একটি কাগজের মোড়ক, বোধ করি কিছু কিনিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাকে পথ দিবার জগা অপূর্ব একধারে সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হঠাৎ হতবুদ্ধি হইয়া দেখিল, রামদাস পথ না ছাড়িয়া একেবারে সেটা সম্পূর্ণ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজি করিয়া কহিল,

আমাকে এক মিনিট মাপ করতে হবে, আমি এই বাবুজির বন্ধু। এঁদের প্রতি অহেতুক দুর্ভাবহারের জন্ত আপনাদের অন্ততপ্ত হওয়া উচিত।

মেয়েটি চোখ তুলিয়া জুড়ুধরে কহিল, ইচ্ছা হয় এ সব কথা আমার বাবাকে বলতে পারেন।

আপনার বাবা বাড়ী আছেন ?

না।

তাহলে অপেক্ষা করবার আমার সময় নেই। আমার হয়ে তাঁকে বলবেন যে তাঁর উপদ্রবে ইনি থাকতে পারছেন না।

মেয়েটি তেমনি তিক্তকণ্ঠে কহিল, তাঁর হয়ে আমিই জবাব দিচ্ছি যে ইচ্ছে করলে ইনি চলে যেতে পারেন।

রামদাস একটু হাসিল, কহিল, ভারতবর্ষীয় ক্রীষ্টান 'বুলি'দের আমি চিনি। এর চেয়ে বড় জবাব তাদের মুখে আমি আশা করিনি। কিন্তু তাতে তাঁর স্ববিধে হবে না, কারণ, এঁর জায়গায় আমি আসবো। আমার নাম রামদাস তলওয়ারকর,—আমি মারাঠী ব্রাহ্মণ। তলওয়ার শব্দটার একটা অর্থ আছে, আপনার বাবাকে সেটা জেনে নিতে বলবেন। গুড্‌ইভনিং। চলুন বাবুজি,—এই বলিয়া সে অপূর্বের হাত ধরিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

মেয়েটির মুখের চেহারা অপূর্ব কটাঞ্জে দেখিতে পাইয়াছিল, শেষ দিকটায় সে যে কিরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল মনে করিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে কথা কহিতেই পারিল না, তারপরে আস্তে আস্তে বলিল, এটা কি হ'ল তলওয়ারকর ?

তলওয়ারকর উত্তরে কহিল, এই হ'ল. যে আপনি উঠে গৌরবই আমাকে আসতে হবে। শুধু খবরটা যেন পাই।

অপূর্ব কহিল, অর্থাৎ, দুপুরবেলা আপনার স্ত্রী এখানে একাকী থাকবেম?

রামদাস কহিল, না, একাকী নয়, আমার দু'বছরের একটি মেয়ে আছে।

অর্থাৎ, আপনি পরিহাস করচেন ?

না, আমি সত্য বলছি। পরিহাস করতে আমি জানিইনে।

অপূর্ব তাহার সঙ্গীর মুখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, তারপরে ধীরে ধীরে কহিল, তা'হলে এ বাসা আমার ছাড়া চলবে না। তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই রামদাস অকস্মাৎ তাহার দুই হাত নিজের বলিষ্ঠ দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিল, এই আমি চাই বাবুজি, এইত আমি চাই। অত্যাচারের ভয়ে আমরা অনেক পালিয়েছি, কিন্তু,—বাস !

একটা হাত সে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু একটা হাত সে শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়াই রহিল। কেবল ট্রেণ ছাড়িলে সেই হাতে আর একবার মস্ত নাড়া দিয়া নিজের দুই হাত এক করিয়া নমস্কার করিল।

সন্ধ্যা হইতে তখনও বিলম্ব ছিল, ঘণ্টা থানেকের মধ্যে ট্রেনেরও আর সময় ছিল না বলিয়া ষ্টেশনের এই দিকের প্লাটফর্মে যাত্রীর ভিড় ছিল না। এইখানে অপূর্ব পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই একটা দিনের ব্যবধানে জীবনটা যেন কোথা দিয়া কেমন করিয়া একেবারে বহু বৎসর দীর্ঘ হইয়া গেছে। খেলা-ধুলা ও এমনি সব তুচ্ছ কাজের মধ্যে সে কখন যেন ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, অকস্মাৎ ঘেথানে ঘুম ভাঙিল, সেখানে সমস্ত ছনিয়ার কর্ম্মশ্রোত কেবলমাত্র কাজের পোষাই যেন ফেলিয়া উঠিয়াছে। বিশ্রাম নাই, বিরতি নাই, আনন্দ নাই, অবসর নাই,—মানুষে-মানুষে সংঘর্ষের মধ্যাহ্ন সূর্য্য দুই হাতে কেবল মুঠা মুঠা করিয়া অহরহ আগুন ছড়াইয়া চলিয়াছে। এখানে না নাই, দাদার নাই, বৌদিদির নাই,—স্নেহছায়া কোথাও কিছু নাই,—কর্ম্মশালার

অসংখ্য চক্র দক্ষিণে, বামে, মাথার উপরে, পায়ের নীচে, সর্বত্র অন্ধবেগে ঘুরিয়া চলিয়াছে, এতটুকু অসতর্ক হইলে রক্ষা পাইবার কোথাও কোন পথ নাই,—সমস্ত একেবারে নিষ্ঠুরভাবে অবরুদ্ধ। চোখের দুই কোণ জলে ভরিয়া গেল,—অদূরে একটা কাঠের বেঞ্চ ছিল, সে তাহারই উপরে বসিয়া পড়িয়া চোখ মুছিতেছে, হঠাৎ পিছন হইতে একটা প্রবল ধাক্কায় উপড় হইয়া একেবারে মাটির উপর পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি কোনমতে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিল জন পাচ ছয় ফিরিঙ্গী ছোড়া,—

.. কাহারও মুখে সিগারেট, কাহারও মুখে পাইপ,—দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। সম্ভবতঃ, যে ধাক্কা মারিয়াছিল সে বেকের গায়ে একটা লেখা দেখাইয়া কহিল, শালা, ইহ সাহেব লোগুকাবাস্তে তুম্হারা নেহি—

লজ্জায়, ক্রোধে ও অপমানে অপূর্বর সজল চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, চৌকি কাঁপিতে লাগিল, সে প্রত্যুত্তরে কি যে বলিল, বুঝা গেল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া ফিরিঙ্গীর দল অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিল, একজন কহিল, শালা দুধবালা, আত্মি গরম করতা—কাটকমে যায়েগা? সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল,—একজন তাহার মুখের সামনে একটা অশ্লীল ভঙ্গী করিয়া শিব দিল।

অপূর্বর হিতাহিতজ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়া আসিতেছিল, হয়ত মুহূর্ত্ত পরে সে ইহাদের উপরে কাঁপাইয়া পড়িত, কিন্তু কতকগুলি হিন্দুস্থানী কর্মচারী অনতিদূরে বসিয়া বাতি পরিষ্কার করিতেছিল, তাহার মাঝখানে পড়িয়া তাহাকে টানিয়া প্লাটফর্মের বাহির করিয়া দিল; একটা ফিরিঙ্গী ছোড়া ছুটিয়া আসিয়া ভিড়ের মধ্যে পা গলাইয়া অপূর্বর শাদা পিরায়ের উপর বুটের পদচিহ্ন আঁকিয়া দিল। এই হিন্দুস্থানী দলের হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্ত সে টানা-টানি করিতেছিল, একজন তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, আরে বাঙালী

বাবু, সাহেব লোককা বদন্ ভুয়েগা ত ইহা এক বহু জেল খাটেগা—
 যাও—ভাগো—একজন কহিল, আরে বাবু হায়,—দাখা মাং দেও—এই
 বলিয়া সে তারের গেটটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরে তাহাকে
 ঘিরিয়া ভিড় জমিবার উপক্রম করিতেছিল, যাহারা দেখিতে পায় নাই
 তাহারা কারণ জিজ্ঞাসা করিল, যাহারা দেখিয়াছে তাহারা মানারূপ
 মন্তব্য প্রকাশ করিল, একজন হিন্দুস্থানী চানা-ভাজা বিক্রী করে, সে
 কলিকাতায় থাকিয়া বাঙলা শিখিয়াছিল, সেই ভাষায় বুঝাইয়া দিল যে,
 এদেশে চট্টগ্রামের অনেক লোক ছুধের ব্যবসা করে, তাহারা পিরাণ
 গায়ে দেয়, জুতা পরে,—অপূর্ণ আকিসের পোষাক ছাড়িয়া সাধারণ
 বাঙালীর পোষাকে ষ্টেশনে আসিয়াছিল, সুতরাং,—সাহেবেরা সেই
 ছুধবালা মনে করিয়া মারিয়াছে, কেবলি বাবু বলিয়া চিনিতে পারে
 নাই। তাহার কৈফিয়ৎ, সদ্, ও সহানুভূতির দায় এড়াইয়া অপূর্ণ
 ষ্টেশনে খোঁজ করিয়া সোজা ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।
 তিনিও সাহেব,—কাজ করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অপূর্ণ
 জুতার দাগ দেখাইয়া ঘটনা বিবৃত করিল। তিনি বিরক্ত ও অবজ্ঞা
 ভরে মিনিটখানেক শুনিয়া কহিলেন, ইউরোপীয়ানদের বেঞ্চে তুমি
 বসিতে গেলে কেন ?

অপূর্ণ উত্তেজনার সহিত কহিল, আমি জানতাম না—

তোমার জানা উচিত ছিল।

কিন্তু তাই বলে থাম্কা ভদ্রলোকের গায়ে হাত দেবে ?

সাহেব দ্বারের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিলেন—গো—গো—গো—
 চাপ্রাশি ইস্কা বহর কর দেও—বলিয়া কাজে মন দিগেন।

তাহার পরে অপূর্ণ কি করিয়া যে বাসায় ফিরিয়া আসিল সে ঠিক
 জানে না। ঘণ্টা দুই পূর্বে রামদাসের সহিত এই পথে একত্রে
 আসিবার কালে সব চেয়ে যে দুর্ভাবনা তাহার মনে বেশি বাজিতেছিল

সে তাহার অকারণ মধ্যস্থতা। একে ত উৎপাত ও অশান্তির মাত্রা তাহাতে কমিবে না, বরঞ্চ বাড়িবে, তা'ছাড়া, সে ক্রীষ্টান মেয়েটির যত অপরাধই কেন না থাক কেবলমাত্র মেয়ে মানুষ বলিয়াই ত পুরুষের মুখ হইতে ওরূপ কঠিন কথা বাহির হওয়া সম্ভব হয় নাই,—তাহাতে আবার সে তখন একাকী ছিল। তাহার শিক্ষিত, ভদ্র অন্তঃকরণ রামদাসের কথায় ক্ষুব্ধ হইয়াছিল,—কিন্তু এখন ফিরিবার পথে তাহার সে ক্ষোভ কোথায় যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার ঠিকানা ছিল না। তাহাকে মনে যখন হইল, তখন মেয়ে মানুষ বলিয়া আর মনে হইল না,—মনে হইল ক্রীষ্টানের মেয়ে, সাহেবের মেয়ে বলিয়া,—যে ছোড়া-গুলো তাহাকে এইমাত্র অকারণে অপমানের একশেষ করিয়াছে—যাহাদের কুশিক্ষা, ইতরতা ও বর্বরতার অবদি নাই—তাহাদেরই ভগিনী বলিয়া,—যে-সাহেবটা একান্ত অবিচারে তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল—মানুষের সামান্য অধিকারটুকুও দিল না—তাহারই পরম আত্মীয় বলিয়া।

তেওয়ারী আসিয়া কহিল,—ছোটবাবু আপনার খাবার তৈরী হয়েছে। অপূর্ব কহিল, হাই—

মিনিট দশ পনেরো পরে সে পুনরায় আসিয়া জানাইল, খাবার যে সব জুড়িয়ে গেল বাবু—

অপূর্ব রাগ করিয়া বলিল, কেন বিরক্ত করিস্ তেওয়ারী, আমি খাব না,—আমার ক্ষিদে নেই।

চোখে তাহার ধূম আসিল না, রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, ইমন্ত বিছানাটা যেন তাহার কাছে শয্যাকণ্টক হইয়া উঠিল। একটা মনস্তাত্ত্বিক বেদনা তাহার সকল অঙ্গে ফুটিতে লাগিল, এবং তাহারই মাঝে মাঝে মনে পড়িতে লাগিল টেশনের সেই হিন্দুস্থানী লোকগুলোকে, যাহারা সুদলবলে উপস্থিত থাকিয়া তাহার লাঞ্ছনা

কোন অংশ লয় নাই, বরঞ্চ, তাহার অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিতেই সাহায্য করিয়াছে। দেশের লোকের বিরুদ্ধে দেশের লোকের এত বড় লজ্জা, এত বড় গ্লানি জগতের আর কোন দেশে আছে? কেন এমন হইল? কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল?

(৪)

দুই তিন দিন নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল, উপরতলা হইতে সাহেবের অভ্যাচার আর যখন নব-নবরূপে প্রকাশিত হইল না, তখন অপূর্ব বুকিল ক্রীশান মেয়েটা সে দিনের কথা তাহার পিতাকে জানায় নাই। এবং তাহার সেই কল-মূল দিতে আসার ঘটনার সঙ্গে মিলাইয়া এই না-বলার ব্যাপারটা শুধু সম্ভব নহ, সত্য বলিয়াই মনে হইল। অনেক প্রকার কালো ফর্সা সাহেবের দল উপরে যায় আসে, মেয়েটির সহিতও বার দুই সিঁড়ির পথে সাক্ষাৎ হইয়াছে, সে মুখ কিরাইয়া নামিয়া যায়, কিন্তু সেই দুঃশাসন গৃহকর্তার সহিত একদিনও মুখোমুখি ঘটে নাই। কেবল, সে যে ঘরে আছে সেটা বুঝা যায় তাহার ভারি বুটের শব্দে। সেদিন সকালে ছোটবাবুকে ভাত বাড়িয়া দিয়া তেওয়ারী হাসিমুখে কহিল, সাহেব দেখছি নালিশ ফরিদ আর কিছু করলে না।

অপূর্ব কহিল, না। যতটা গর্জিয়া ততটা বর্ধায় না।

তেওয়ারী বলিল, আমাদেরও কিন্তু বেশি দিন এ বাসায় থাকা চলবে না। ব্যাটা মাতাল হলেই আবার কোন দিন ফ্যাসাদ বাধাবে।

অপূর্ব কহিল, নাঃ—সে ভয় বড় নেই।

তেওয়ারী কহিল, তা হোক, তবু মাথার ওপরে মেলেছে ক্রীশান,—
যা সব খায় দায়, মনে হলেই—

আঃ তুই খাম্ তেওয়ারী। সে নিজে তখন খাইতেছিল, ক্রীশানের খাদ্যদ্রব্যের ইঙ্গিতে তাহার সর্বদিকে যেন কাটা দিয়া উঠিল। কহিল,

এ মাসটা 'গেলে উঠে ত যেতেই হবে। কিন্তু একটা ভাল বাসাও ত খুঁজে পাওয়া চাই।

এ সময়ে ও উল্লেখ ভাল হয় নাই, তেওয়ারী মনে মনে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

সেই দিন বৈকালে অফিস হইতে ফিরিয়া অপূর্ব তেওয়ারীর প্রতি চাহিয়া অবাধ হইয়া গেল। সে যেন এই একটা বেলার মধ্যে শুকাইয়া অর্ধেক হইয়া গেছে। কি রে তেওয়ারী?

প্রত্যুত্তরে সে আলপিনে গাঁথা কয়েকখণ্ড ছাপানো হৃদে রঙের কাগজ অপূর্বের হাতে দিল। ফৌজদারী আদালতের শমন, বাদী জে, ডি, জোসেফ, প্রতিবাদী তিন নম্বর ঘরের অপূর্ব বাঙ্গালী ও তাহার চাকর। ধারা একটা নয়, গোটা চারেক। দুপুরবেলা কোর্টের পিয়াদা জারি করিয়া গেছে, এবং কাল সকালে আর একটা জারি করিতে আসিবে। সঙ্গে সেই সাহেব ব্যাটা। হাজির হইবার দিন পরশু। অপূর্ব নিশাকে কাগজগুলো আগোপাস্ত পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিল, তা' আর হবে কি। কোর্টে হাজির হলেই হবে।

তেওয়ারী কাদ কাদ গলায় কহিল, কখনও যে কাঠগড়ার উঠিনি বাবু।

অপূর্ব বিরক্ত হইয়া বলিল, আমি কি উঠেছি না কি? সব তাতেই কাদবি ত বিদেশে আস্তে গেলি কেন?

আমি যে কিছু জানিনে ছোটবাবু!

জানিসনে ত লাঠি নিয়ে বেরুতে গেলি কেন? ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকলেই ত হতো! এই বলিয়া অপূর্ব কাপড় ছাড়িত।

নিজের ঘরে চলিয়া গেল। পরদিন তাহার নিজের পরওয়ানা আসিয়া

পৌঁছিল, এবং তাহার পরদিন তেওয়ারীকে সঙ্গে লইয়া থানায়

আদালতে উপস্থিত হইল। নালিশ মকদ্দমার কোন অভিজ্ঞতাই তাহার

ছিল না; বিদেশ, কোন লোকের সহিত আলাপ পরিচয় নাই, কাহার সাহায্য লইতে হয়, কি করিয়া তদ্বির করিতে হয় কিছুই জানে না, তবুও কোন ভয়ই হইল না। হঠাৎ কি করিয়া যে তাহার মন এমন শক্ত হইয়া গেল সে নিজেই ভাবিয়া পাইল না। এ বিষয়ে রামদাসকে কোন কথা বলিতে, কোন সাহায্য চাহিতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। শুধু কাজের অজুহাতে সাহেবের কাছে সে একটা দিনের ছুটি লইয়া আসিয়াছিল।

যথা সময় ডাক পড়িল। ডেপুটী কমিশনের নিজের ফাইলেই মকদ্দমা রাখিয়াছিলেন। বাদী জোসেফ সাহেব সত্য-মিথ্যা যা খুসি এজাহার দিয়া গেল, প্রতিবাদীর উকিল ছিলনা, অপূর্ব নিজের জবাবে একটি কথাও গোপন করিল না, একটা কথাও বাড়াইয়া বলিল না। বাদীর সাক্ষী তার মেয়ে,—আদালতের মাঝখানে এই মেয়েটির নাম এবং তাহার বিবরণ শুনিয়া অপূর্ব স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইনি কোন এক স্বর্গীয় রাজকুমার ভট্টাচার্যের কন্যা, বাটি পূর্বে ছিল বরিশাল, এখন বাদ্দালোর। নিজের নাম মেরি-ভারতী; ভট্টাচার্য মহাশয় নিজেই স্বেচ্ছায় অন্ধকার হইতে আলোকে আসেন। তাহার স্বর্গীয় হওয়ার পরে না কোন এক মিশনারি ছহিতার দাসী হইয়া বাদ্দালোরে আসেন, সেখানে জোসেফ সাহেবের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভারতী পৈত্রিক ভট্টাচার্য নামটা কদর্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া জোসেফ নাম গ্রহণ করিয়াছে, সেই অবধি সে মিস্ মেরি-ভারতী জোসেফ নামে পরিচিত। হাকিমের প্রণে সে ফল-মূল উপহার দিতে যাওয়া স্বীকার করিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠের হইতে মুখের চেহারা মিথ্যা বলার বিড়ম্বনা এমনি ছুটিয়া উঠিল যে, শুধু হাকিম নয়, তাহার পিয়াদাটার চক্ষুকে পর্যন্ত তাহা ফাঁকি দিতে পারিল না। কোন পক্ষেই উকিল ছিল না, স্বতরাং জেরার প্যাচে প্যাচে পাক খাইয়া তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বস্তু

স্বপ্ন হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইল না। বিচার একদিনেই শেষ হইল, তেওয়ারী রেহাই পাইল, কিন্তু বিচারক অপূর্বর কুড়ি টাকা অর্থ দণ্ড করিলেন। জীবনের এই প্রভাতকালে রাজদ্বারে বিনা অপরাধে দণ্ডিত হইয়া তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। টাকা কয়টি গণিয়া দিয়া সে বাহির হইতেছে, দেখিল, দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রামদাস। অপূর্বর মুখ দিয়া প্রথমেই বাহির হইয়া গেল,—কুড়ি টাকা ফাইন হ'ল রামদাস, কি করা যাবে? আপিল?

আবেগ ও উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটা হঠাৎ বেন কাপিয়া উঠিল। রামদাস তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, অর্থাৎ কুড়ি টাকার বদলে দুহাজার টাকা আপনি লোকসান করতে চান?

তা'হোক,—কিন্তু এ যে ফাইন! শাস্তি! রাজদণ্ড!

রামদাস হাসিয়া কহিল, কিসের দণ্ড? যে মিথ্যে মামলা আনলে, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ালে,—আর যে তাকে প্রশ্রয় দিলে তাদের দণ্ড ত? কিন্তু এর উপরেও একটা আদালত আছে, যার বিচারক ভুল করেন না,—সেখানে আপনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন ব'লে দিচ্ছি।

অপূর্ব বলিল, কিন্তু লোকে ত বুঝবেনা, রামদাস। তাদের কাছে এ ছুঁচু যে আমার চিরকালের সঙ্গী হয়ে রইল।

রামদাস সম্মুখে তাহার হাতের উপর একটা চাপ দিয়া বলিল, চলুন, আমরা নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসিগে।

পথ চলিতে চলিতে কহিল, অপূর্ববাবু, আমি আফিসের কাজে আপনার ছোট হলেও বয়সে বড়। যদি ছোটো কথা বলি কিছু মনে করবেন না। অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। রামদাস বলিতে লাগিল—এ মেকদ্দার কথা আমি আগেই জানতাম, কি হবে তাতেও আমার সন্দেহ ছিল না। লোকের কথা আপনি বলছিলেন, যে লোক, সে

জানবে) হালদারের সঙ্গে জোসেফের মামলা বাকাল ইংরাজের আদালতে
কি হয়! আর কুড়ি টাকার জরিমানার দুর্নাম—

কিন্তু বিনা দোষে যে রামদাস ?

রামদাস কহিল, হাঁ হাঁ, বিনা দোষেই বটে। এমনি বিনা দোষেই
আমি দু'বৎসর জেল খেটেছি।

জেল খেটেচ ? দু'বৎসর ?

হাঁ, দু'বৎসর, এবং,—এই বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিয়া অপূর্বর
হাতখানা তাঁহার পিঠের নীচে টানিয়া লইয়া কহিল, এই জামাটা যদি
সরাতে পারতাম ত দেখতে পেতেন এখানে বেতের দাগে দাগে আর
জায়গা নেই।

বেত খেয়েচ রামদাস ?

রামদাস সহাস্তে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ, এবং এমনই বিনাদোষে।
তবু এত মিলজ্ঞ আমি যে আজও লোকের কাছে মুখ দেখাচ্ছি। আর
আপনি কুড়ি টাকার আঘাত সহিতে পারবেন না বাবুজি ?

অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া শুক্ক হইয়া রহিল। যে ল্যাম্প
পোষ্ট আশ্রয় করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে আলো জালিতে
আসিল। সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া রামদাস চকিত হইয়া কহিল, অটরে
না, চলুন আপনাকে পৌছে দিয়ে আমি বাড়ী যাই।

অপূর্ব আবেগের সহিত বলিল, এখনি চলে যাবেন ? অনেক কথা
দে আমার জানবার রইল বাবুজি ?

রামদাস হাসিমুখে কহিল, সব আজই জেনে নেবে সে হবেনা।
ইয়ত অনেক দিন ধরে আমাকে বলতে হবে। এই তিনেকদিন
কথাটার উপর সে এমনি কি একটা জোর দিল যে অপূর্ব সবিস্ময়ে
তাঁহার মুখের প্রতি না চাহিয়া পারিল না। কিন্তু সেই সহাস্ত প্রণীত
মুখে কোন রহস্যই প্রকাশ পাইল না। রামদাস গলির ভিতরে

আর প্রবেশ করিল না, বড় রাস্তা হইতেই বিদায় লইয়া সোজা স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

অপূর্ব তাহার বাসার দরজায় আসিয়া রুদ্ধ দ্বারে যা দিতেই তেওয়ারী প্রভুর সাড়া পাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সে পূর্বাহ্নে আসিয়া গৃহকর্মে রত হইয়াছিল, মুখ তাহার যেমন গম্ভীর তেমনি বিষন্ন। কহিল, তখন তাড়াতাড়িতে দু'খানা নোট ফেলে গিয়েছিলেন।

অপূর্ব আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ফেলে গিয়েছিলাম রে?

এই যে এখানে, বলিয়া সে পা দিয়া দ্বারের কাছে মেঝের উপর একটা জায়গা নির্দেশ করিয়া দেখাইল। কহিল, আপনার বালিশের তলায় রেখে দিয়েছি। পকেট থেকে বাইরে পড়ে যায় নি এই ভাগ্যি।

কি করিয়া যে পড়িয়া গিয়াছিল এই কথা ভাবিতে ভাবিতে অপূর্ব তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

(৫)

বাত্রে আহালাদির পরে তেওয়ারী করজোড়ে সাক্ষনয়নে কহিল, আর না ছোটবাবু, এইবার বৃড়োমান্নবের কথাটা রাখুন। চলুন, কাল সকালেই আমরা যেখানে হোক্‌ চলে যাই।

অপূর্ব কহিল, কাল সকালেই, কোথায় গুনি? তুই কি ধর্মশালায় গিয়ে থাকতে বলিস্‌ নাকি?

তেওয়ারী বলিল, এর চেয়ে সেও ভাল। মকদ্দমা জিতেছে, এইবার কোন দিন ঘরে ঢুকে আমাদের দু'জনকে মেরে যাবে।

অপূর্ব আর সহিতে পারিল না, রাগ করিয়া কহিল, তোকে কি আমার কাটা ঘায়ে ঘ্রনের ছিটে দিতেই মা সঙ্গে দিয়েছিলেন? তোকে আমি আমার দরকার নেই, কাল জাহাজ আছে তুই বাড়ী চলে যা। আমার কপালে যা আছে তা হবে।

তেওয়ারী আর তর্ক করিল না, আস্তে আস্তে শুইতে চলিয়া গেল। তাহার কথাগুলো অপূর্বকে অপমানের একশেষ করিল বলিয়াই সে এরূপ কঠোর জবাব দিল, না হইলে সে যে বিশেষ অসঙ্গত কিছু কহে নাই অপূর্ব মনে মনে তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না। যাহা হোক পরদিন সকাল হইতেই একটা নূতন বাসার খোজ চলিতে লাগিল, এবং শুধু তলওয়ারকর ছাড়া আফিসের প্রায় সকলকেই সে এই মর্মে অহ্বরোধ করিয়া রাখিল। অতঃপর তেওয়ারীও অহ্বযোগ করিল না, অপূর্বও মনের কথা প্রকাশ করিল না, কিন্তু প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই এক প্রকার সশঙ্কিত ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। আফিস হইতে ফিরিবার পথে অপূর্ব প্রত্যহই ভয় করিত, আজ না জানি কি গিয়া শুনিতে হয়! কিন্তু কোনদিন কিছুই শুনিতে হইল না। মকদ্দমাবিজয়ী জোসেফ পরিবারের নানাবিধ ও বিচিত্র উপদ্রব নব নব রূপে নিত্য প্রকাশ পাইবে ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু উৎপাত ত দূরের কথা, উপরে কেহ আছে কিনা অনেক সময় তাহাই সন্দেহ হইতে লাগিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কেহই কাহাকে কোন কথা কহিত না। নিরুপদ্রবেই দিন কাটিতেছিল—এই ভাল। সপ্তাহখানেক পরে একদিন আফিস হইতে ফিরিবার পথে তেওয়ারী প্রক্লম্বে মনের আনন্দ যথাসাধ্য সংবত করিয়া কহিল, আর শুনেছেন ছোটবাবু?

ত পূর্ব কহিল, কি?

সীহেব যে ঠ্যাঙ ভেঙে একেবারে হাসপাতালে। বাঁচে কিনা বাড়ে! আর ছ'দিন হ'ল,—ঠিক তার পরের দিনই!

অপূর্ব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুই কি কোরে জানিলি?

তেওয়ারী বলিল, বাড়ীওয়ালার সরকার আমাদের জেলার লোক। কিনা, তার সঙ্গে আজ পরিচয় হ'ল। ভাড়া আদায় করতে এসেছিল।

কে বা ভাড়া দেবে,—মদ খেয়ে মারামারি করে জেটি থেকে নীচে পড়ে সাহেবের গিয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছেন।

তা' হবে, বলিয়া অপূর্ব কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কলিকাতা ত্যাগ করার পরে এই প্রথম তেওয়ারীর মন সত্যকার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল এই লইয়া সে আজ বেশ একটুখানি আলোচনা করে, কিন্তু মনিব তাহাতে উৎসাহ দিলেন না। নাই দিন, তবুও সে বাহির হইতে নানা উপায়ে শুনাইয়া দিল যে এরূপ একদিন ঘটবেই তাহা সে জানিত। তেওয়ারী সন্ধ্যা-আফিক শিথিতে পারে নাই, কিন্তু গায়ত্রীটা তাহার মুখস্থ হইয়াছিল, সেই গায়ত্রী সে জরিমানার দিন হইতে সকাল-সন্ধ্যা একশত আট করিয়া দুইশত ষোল বার প্রত্যহ জপ করিয়াছে। সাহেবের পা ভাঙ্গার কথা হেতু কি, ছেলেমানুষ মনিব তাহা অনুধাবন করিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু এই মস্তের অসাদারণ শক্তির প্রতি তেওয়ারীর বিশ্বাস সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল। সেহু হইয়া ব্রাহ্মণের মাথার উপরে যে ঘোড়ার মত পাঠকিয়াছে পা তাহার ভাঙ্গিবে না ত কি!

পরদিন সকালে তাহার আফিসের আরদালির কাছে খবর পাইয়া অপূর্ব তেওয়ারীকে ডাকিয়া কহিল, একটা বাসার সন্ধান পাওয়া গেছে তেওয়ারী, গিয়ে দেখে আয় দেখি পোষাবে কি না।

তেওয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আর বোধ হয় দরকার হইবে না বাবু, সে-সব আমি ঠিক করে নিয়েছি। আসছে পরলী তারিখে যাওয়া যাবার তারাই বাবে। বাসা বদলানো তো সোজা কল্যাট নয় ছোটবাবু।

কল্যাট সে সোজা নয় অপূর্ব নিজেও তাহা জানিত, কিন্তু সাহেবের অবর্তমানে যে উৎপাত বন্ধ হইয়াছে, তাহার প্রত্যাগমনের পরেও যে তাহা বজায় থাকিবে এ ভরসা তাহার ছিল না। বাসা তাহাকে বদল করিতেই হইবে, কিন্তু আফিসে যাইবার পূর্বে তেওয়ারী যখন ছুটি

চাহিয়া জানাইল যে আজ দুপুরবেলা সে বর্ষাদের ফয়ার নদীরে
তামাসা দেখিতে যাইবে, তখন অপূর্ব না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।
সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, তোর যে আবার তামাসা দেখতে সখ হ'ল
তেওয়ারী ?

তেওয়ারী কহিল, বিদেশের যাকিছু সব দেখা ভাল ছোটবাবু।

অপূর্ব বলিল, তা' বটে। খোঁড়া সাহেব হাসপাতালে, এখন আর
রাস্তায় বেরোতে ভয় নেই। তা' যাস, কিন্তু একটু সকাল সকাল ফিরে
আসিস। কেঁউ সঙ্গে থাকবে ত ?

তাহার স্বদেশবাসী যে লোকটির সহিত কাল তেওয়ারীর আলাপ
হইয়াছে সেই আসিয়া আজ তাহাকে তামাসা দেখাইয়া আনিবে স্থির
হইয়াছিল। সাহেবের দুর্ঘটনার সন্বাদে এতই সে খুসী হইয়াছিল যে
তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটে নাই।

তাহাকে বাহিরে যাইবার হুকুম দিয়া অপূর্ব যথাসময়ে আফিসে
চলিয়া গেল, এবং ইহার ঘটনা থানেকের মদ্যেই তেওয়ারীর দেশের
লোক আসিয়া তাহাকে বর্ষা তামাসা দেখাইয়া আনিতে সঙ্গে লইয়া
গেল। তালার একটা চাবি অপূর্বের নিজের কাছেই থাকিত, সুতরাং
ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব ঘটিলেও ছোটবাবুর যে বিশেষ অসুবিধা হইবে
না তেওয়ারীর তাহা জানা ছিল। নিকটক হইয়া আজ আর তাহার
স্বস্তি অবধি ছিল না।

অপরাত্ন বেলায় ঘরে ফিরিয়া অপূর্ব দেখিল দরজায় তালা বন্ধ,
তেওয়ারী তখন পর্যন্ত তামাসা দেখিয়া ফিরে নাই। একটু হইতে
চাবি বাহির করিয়া খুলিতে গিয়া দেখিল চাবি লাগে না, এ কোন এক
অপরিচিত তালা, এ তো তাহাদের নয়! তেওয়ারী এ কোথায়
পৌঁছিয়াছে, কেনই বা সে তাহাদের পুরাতন ভালো তালার বদলে এই একটা
নূতন তালা দিতে গেল, ইহার চাবিই বা কোথায়, কেমন করিয়াই বা

সে ঘরে ঢুকিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। বোধ হয় মিনিট দুই সে এই ভাবে দাঁড়াইয়া, ত্রিতলের দ্বার খুলিয়া সেই জীশান মেয়েটি মুখ বাহির করিয়া কহিল, দাঁড়ান, আমি খুলে দিচ্ছি, এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া আসিয়া অসঙ্কেচে অপূর্বর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে সে বিশ্বয়ে ও লজ্জায় যেন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তেওয়ারী নাই, কি তার হইল, এবং কি জন্ত কেমন করিয়া ঘরের চাবি সাহেবের মেয়ের হাতে গিয়া পড়িল তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। স্বল্প আলোকিত এই সংকীর্ণ সিঁড়িটায় দুজনের দাঁড়াইবার মত যথেষ্ট স্থান ছিল না, অপূর্ব এক ধাপ নীচে নামিয়া আর এক দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অনাত্মীয় যুবতী রমণীর সহিত নির্জনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কথা কহা তাহার অভ্যাসই ছিল না, তাই মেয়েটি যখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মা বন্ধু ছিলেন চাবি বন্ধ করে আমি ভাল কাজ করিনি, হয়ত বিপদে পড়তেও পারি, তখন অপূর্বর মুখ দিয়া সহসা কোন উত্তরই বাহির হইল না। ভারতী কবাট খুলিয়া ফেলিয়া কহিল, আমার মা ভয়ানক ভীতু মানুষ, তিনি আমাকে তখন থেকে বন্ধুছেন যে আপনি বিশ্বাস না করলে আমাকেও চুরির দায়ে জেল খাটতে হবে। আমার কিন্তু সে ভয় একটুও নেই।

অপূর্ব বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে ?

ভারতী কহিল, ঘরে গিয়ে দেখুননা কি হয়েছে। এই বলিয়া সে পথ ছাড়িয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব ঘরে ঢুকিয়া বাহা দেখিল তাহাতে দুই চক্ষু তাহার কপালে উঠিল। তোরঙ্গ দুটার ডালা ভাঙ, বই, কাগজ, বিজ্ঞানা, বালিশ, কাপড়-চোপড় সমস্ত নোয়ের উপর ছড়ানো, তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল, কি কোরে এম হ'ল ? কে করলে ?

ভারতী, একটু হাসিয়া কহিল, আর যেই করুক কিন্তু আমি নয়, ত

শত্রু হলেও আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। এই বলিয়া সে ঘটনাটা যাহা বিবৃত করিল তাহা এই—দুপুরবেলা তাহার সত্তা পরিচিত দেশওয়ালী বন্ধুর সহিত তেওয়ারী যখন তামাসা দেখিতে বাহির হইয়া যায়, ভারতীর মা বারাণ্ডায় বসিয়া তাহাদের দেখিতে পান। অল্পক্ষণ পরেই নীচের ঘর হইতে একপ্রকার সন্দেহজনক শব্দ শুনিতে পাইয়া ভারতীকে দেখিতে বলেন। তাহাদের মেঝের একধারে একটা ফুটা আছে, চোখ পাতিয়া দেখিলে অপূর্বের ঘরের সমস্তই দেখা যায়। সেই ফুটা দিয়া দেখিয়াই সে চীৎকার করিতে থাকে। বাহারা বাক্য ভাঙিতে-ছিল তাহারা সবেগে পলায়ন করে, তখন নীচে নামিয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে থাকে পুনরায় না তাহারা কিরিয়া আসে। এখন অপূর্বকে দেখিতে পাইয়া সে ঘর খুলিয়া দিতে আসিয়াছে।

বিবর্ণ, পাংশুমুখে অপূর্ব তাহার খাটের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া শুক হইয়া রহিল। ভারতী দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এঘরে আপনার কোন খাবার জিনিস আছে কি? আমি ঘরে এসে একবার দেখতে পারি?

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, আসুন।

সে ঘরে আসিলে তাহার মুখপানে চাহিয়া অপূর্ব বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করিল, এখন কি করা যায়?

ভারতী কহিল, করা ত অনেক কিছু যায়, কিন্তু সকলের আগে দেখতে হবে কি কি চুরি গেছে।

অপূর্ব বলিল, বেশ ত, তাই দেখুন না কি কি চুরি গেছে।

ভারতী হাসিল, কহিল, আসবার সময় আপনার তোরঙ্গ ঝুড়িয়েও আমি দাঁড়াই নি, চুরিও করিনি,—সত্যতা, কি ছিল আর কি গেছে অসত্যতা কি করে?

অপূর্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সে তো ঠিক কথা। তাহলে তেওয়ারী

আসুক, সে হয় ত সমস্ত জানে। এই বলিয়া সে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষগুলার প্রতি করুণচক্ষে চাহিল।

তাহার নিরুপায়ের মত মুখের চেহারা য ভারতী আমোদ বোধ করিল। হাসিমুখে কহিল, সে জানতে পারে আর আপনি পারেন না? আচ্ছা, কি কোরে জানতে হয় আপনাকে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ মেবোর উপর বসিয়া পড়িয়া স্নমুখের ভাঙ্গা তোবড়টা হাতের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, আচ্ছা, জামা কাপড়গুলো আগে সব গুছিয়ে তুলি। এসব নিয়ে যাবার বোধ হয় তারা সময় পায় নি। এই বলিয়া সে এলোমেলো ধুতি, চাদর, পিরাণ, কোট প্রভৃতি একটির পরে একটি ভাঁজ করিয়া সাজাইয়া তুলিতে লাগিল। তাহার শিক্ষিত হস্তের নিপুণতা কয়েক মুহূর্তেই অপূর্বর চোখে পড়িল। এটা কি? মুশিদাবাদ শিকের স্ট বুঝি? এ রকম ক' জোড়া আছে বলুন ত?

অপূর্ব কহিল, দু'জোড়া।

ঠিক মিলেছে। এই এখানে আর এক জোড়া, এই বলিয়া সে স্ট দু'টি সাজাইয়া বাক্সে তুলিল। ঢাকাই ধুতি—একটা, দুটো, তিনটে;—চাদর—এক, দুই, তিন,—ঠিক মিলেছে। বোধ হয় তিন জোড়াই ছিল, না?

অপূর্ব কহিল, হাঁ, আমার মনে আছে, তিন জোড়াই বটে।

এটা কি, আলপাকার কোট? কই ওয়েষ্ট কোট, খ্যাট দেখছি না যে? শু—না, এ যে গলা বন্ধ দেখছি। এর স্ট ছিল না?

অপূর্ব বলিল, না, ওটা আলাদাই বটে। ওর স্ট ছিল না।

তাদের গুছাইয়া তুলিয়া ভারতী আর একটা হাতে তুলিয়া এলো, এটা দেখছি ক্রামেল স্ট,—আপনি সেখানে টেনিস খেলতেন বুঝি?

তা'হলে একটা, দুটো, তিনটে, ওই আলনায় একটা, আপনার গায়ে একটা,—সুট তা'হলে পাঁচ জোড়া, না ?

অপূর্ব খুসি হইয়া কহিল, ঠিক তাই। পাঁচ জোড়াই বটে।

কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে উজ্জল কি একটা পদার্থ চোখে পড়িতে টানিয়া বাহির করিয়া কহিল, এ যে সোনার চেন, ঘড়ি গেল কোথায় ?

অপূর্ব খুসি হইয়া বলিল, যাক বাঁচা গেছে—চেনটা তারা দেখতে পায়নি। এটি আমার পিতৃদত্ত, তাঁরই স্থিতিচিহ্ন—

কিন্তু ঘড়িটা ?

এই যে, বলিয়া অপূর্ব তাহার কোটের পকেট হইতে সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া দেখাইল।

ভারতী কহিল, চেন, ঘড়ি পাওয়া গেল, বলুন ত আঙুটি আপনার ক'টা ? হাতে ত একটিও নেই দেখছি।

অপূর্ব বলিল, হাতেও নেই, ব্যাগেও ছিল না। আঙুটিই আমার কখনো হয়নি।

তা' ভাল। সোনার বোতাম ? সে বোধ হয় আপনার গায়ে মাটে লাগানো আছে ?

অপূর্ব ব্যস্ত হইয়া বলিল, কই না। সে যে একটা গরদের পাঞ্জাবীদ সন্ধে তোরঙ্গর মধ্যে স্তম্ভেই ছিল।

ভারতী আলনার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল, যে-সকল বস্ত্র তখনও তোলা হয় নাই একপাশে ছিল, তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিল, তার পরে একটু হাসিয়া কহিল, জামা শুদ্ধ এটা গেছে দেখছি। অত বোতাম ছিল না ?

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া জানাইল, ছিল না। ভারতী জিজ্ঞাসা কহিল, টুকরা টুকরা ছিল ত ? অপূর্ব 'ছিল' বলিয়া মায় দিলে, ভারতী উদ্বিগ্নমুখে কহিল, তা হলে তাও গেছে। কত ছিল জানেন না ?

তা' আমি আগেই বুঝিচি। আপনার মনিব্যাগ আছে জানি। বার করে আমাকে দিন ত দেখি—

অপূর্ব পকেট হইতে তাহার ছোট চামড়ার থলেটি বাহির করিয়া ভারতীর হাতে দিতে সে মেঝের উপর ঢালিয়া ফেলিয়া সমস্ত গণনা করিয়া বলিল, ছ'শ পঞ্চাশ টাকা আট আনা। বাড়ী থেকে কত টাকা নিয়ে বার হয়েছিলেন মনে আছে ?

অপূর্ব কহিল, আছে বৈ কি। ছ'শ টাকা।

ভারতী টেবিলের উপর হইতে এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল লইয়া লিখিতে লাগিল, জাহাজ ভাড়া, ঘোড়া গাড়ী ভাড়া, কুলি ভাড়া, পৌছে বাড়ীতে টেলিগ্রাম করেছিলেন ত ? আচ্ছা, তারও এক টাকা, তারপরে এই দশ দিনের বাসা খরচ—

অপূর্ব বাধা দিয়া কহিল, সে তো তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা না করলে জানা যাবে না।

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা' যাবে, দু'এক টাকার তফাৎ হতে পারে, বেশী হবে না। যে ফুটা দিয়া আজ সে চুরি করা দেখিয়াছিল, সেই ছিদ্রপথে চোখ পাতিয়া সে যে এই ঘরের যাবতীয় ব্যাপার নিরীক্ষণ করিত, তেওয়ারীর বাজার করা হইতে আরম্ভ করিয়া খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন পর্যন্ত কিছুই বাদ যাইত না, এ কথা বলিল না, কাগজে ইচ্ছামত একটা অঙ্ক লিখিয়া সহসা মুখ তুলিয়া কহিল, এ ছাড়া আর বাজে খরচ নেই ত ?

না।

ভারতী কাগজের উপর হিসাব করিয়া কহিল, তা'হলে ছ'শ আশি টাকা চুরি গেছে।

অপূর্ব চমকিয়া কহিল, এত টাকা ? রোস রোস,

টাকা বাদ দাও—করিমানার টাকাটা ধরা হয় নি।

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না সে তো অত্যাচার, মিথ্যে জরিমানা—
এ টাকা আমি বাদ দেবনা।

অপূর্ব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কি বিপদ! জরিমানা করাটা মিথ্যে,
হতে পারে, কিন্তু আমার টাকা দেওয়াটা ত মিথ্যে নয়!

ভারতী কহিল, দিলেন কেন? ও টাকা আমি বাদ দেবনা। দু'শ
আশি টাকা চুরি গেছে।

অপূর্ব বলিল, না, দু'শ যাট টাকা।

ভারতী বলিল, না, দু'শ আশি টাকা।

অপূর্ব আর তর্ক করিলনা। এই মেয়েটির প্রখর বুদ্ধি ও সকল
দিকে অভূত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল; অথচ, এই
সোজা বিষয়টা না বুঝিবার দিকে তাহার জিদ দেখিয়া তাহার বিশ্বাসের
পরিসীমা রহিল না। বিচারের জায় অত্যাচার যাহাই হোক, টাকা ব্যয়
হইলে সে যে আর হাতে থাকে না এ কথা যে বুঝিতে চাহে না
তাহাকে সে আর কি বলিবে?

ভারতী অবশিষ্ট কাপড়গুলি গোছ করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।
অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশে খবর দেওয়া কি আপনি উচিত
মনে করেন?

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, তা' বটে। উচিত শুধু এই দিক
থেকে হতে পারে যে তাতে আমার টানাটানির আর অন্ত থাকবেনা।
নইলে, তারা এসে আপনার টাকার কিনারা করে দিবে। যে এ আশ
বোধ হয় করেন না?

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। ভারতী বলিল, ক্ষতি যা' হবার সম্ভেদে
এর দূরে অধিক তারা এলে অপমান স্বরূপ হবে।

সেই কথার উপর—

অপূর্বের কথা শেষ হইল না, ভারতী অসহিষ্ণু হইয়া দিগিল; বলিল

আইন থাকে থাক্; এ আপনাকে আমি কিছুতে করতে দিতে পারবোনা। আইন সেদিনও ছিল আপনি যেদিন জরিমানা দিয়ে এসেছিলেন। এর মধ্যেই বুঝি তা' ভুলে গেছেন?

অপূর্ব কহিল, লোকে যদি মিথ্যে বলে, মিথ্যে মামলা সাজায়, সে কি আইনের দোষ?

ভারতীর মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে কিছুমাত্র লজ্জা পাইল। বলিল, লোকে মিথ্যে বলবেনা, মিথ্যে মামলা সাজাবেনা, তবেই আইন নিৰ্দোষ হয়ে উঠবে, এই আপনার মত না কি? এ হলে ত ভাড়াই হয়, কিন্তু সংসারে তা' হয়না, এবং হবার বোধ করি বিস্তর বিস্তর আছে। এই বলিয়া সে একটু হাসিল, কিন্তু অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল, তর্কে যোগ দিল না। সেই প্রথম দিনে এই মেয়েটির কণ্ঠস্বরে, তাহার স্মৃতি সলজ্জ ব্যবহারে, বিশেষ করিয়া তাহার এই সক্রিয় সহানুভূতিতে অপূর্বর মনের মধ্যে যে একটুখানি মোহের মত জন্মিয়াছিল, তাহার পুরবর্তী আচরণে সে অভাব আর তাহার ছিল না। ভারতীর এই চুরি আপন করিবার আগ্রহ এখন হঠাৎ কেমন তাহার ভারি খারাপ লাগিল। এই সকল অযাচিত সাহায্যকেও আর যেন সে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না এবং কি একপ্রকার অজানা শঠতার সংশয়ে সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার দেখিতে দেখিতে কালো হইয়া উঠিল। সে-দিনের সেই সভয়ে, সহোচ্রে, গোপনে ফলমূল দিতে আসা, পরক্ষণেই আবার ঘরে গিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া মিথ্যা করিয়া বলা, তাবপর সেই আদালতে গাফ্য হওয়া,—নিমিষে সমস্ত ইতিহাস মনের মধ্যে তড়িত রেখায় খেলিয়া গেল। সেই তাহার গভীর ও কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। এ সমস্তই অসম্ভব, সমস্তই ছলনা! তাহার মুখের এই আকস্মিক পরিবর্তন ভারতী লক্ষ্য করিল, কিন্তু কারণ বুঝিতে পারিল না, বলিল, আমার কথার জবাব দিলেন না যে রকম।

অপূর্ব কহিল, এর আর জবাব কি? চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না,
—পুলিশে একটা খবর দিতেই হবে।

ভারতী ভয় পাইয়া কহিল, সে কি কথা! চোরও ধরা পড়বেনা,
টাকাও আদায় হবে না,—মারো থেকে আমাকে নিয়ে যে টানাটানি
করবে। আমি দেখেচি, তালাবন্ধ করেচি, সমস্ত গুছিয়ে তুলে রেখেচি,
—আমি যে বিপদে পড়ে যাবো।

অপূর্ব কহিল, যা ঘটেছে তাই বলবেন।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া জবাব দিল, বললে কি হবে! এই সেদিন
আপনার সঙ্গে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল, মুখ দেখা-দেখি নেই, কথাবার্তা
বন্ধ, ইঠাং আপনার জন্তে আমার এত মাথাব্যথা পুলিশে বিশ্বাস
করাব কেন?

অপূর্বর মন সন্দেহে অধিকতর কঠোর হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার
আগাগোড়া মিছে কথা তারা বিশ্বাস করতে পারলে আর সত্য কথা
পারবে না? টাকা সামান্যই গেছে, কিন্তু চোরকে আমি শাস্তি না দিয়ে
ছাড়বো না!

তাহার মুখের পানে ভারতী হতবুদ্ধির ন্যায় চাহিয়া রহিল; কহিল,
আপনি বলেন কি অপূর্ব বাবু? বাবা ভাল লোক নন, তিনি অস্বাভাবিক
আপনার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করেছেন, আমি যে সাহায্য করেছি তাও
আমি জানি, কিন্তু তাই বলে, ঘর ভেঙে বাহ্য ভেঙে আপনার টাকা চুরি
কোঁদবো আমি? একথা আপনি ভাবতে পারলেন, কিন্তু আমি তা পারিনি।
এ দুই নাম রটলে আমি বাঁচব কি কোরে! বলিতে বলি, তাহার ঠিক
ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এবং দাঁত দিয়া ছোর করিয়া ঠোট চাঁপে ত
চাপিয়ে দেন যেন বাড়ির বেগে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

পরদিন সকালে কি ভাবিয়া যে অপূর্ব পুলিশ-থানার দিকে পা বাড়াইয়া দিল তাহা বলা শক্ত। চুরির ব্যাপার পুলিশের গোচর করিয়া যেন কোন ফল নাই তাহা সে জানিত। টাকা আদায় হইবে না, সম্ভবতঃ, চোর ধরা পড়িবে না,—এ বিশ্বাসটুকু পুলিশের উপরে তাহার ছিল। কিন্তু ওই ক্রীশান স্লেচ্ছ মেয়েটার প্রতি তাহার ক্রোধ ও বিদ্বেষের আর সীমা ছিল না। ভারতী নিজে চুরি করিয়াছে, কিন্তু চুরি করিতে সাহায্য করিয়াছে এ বিষয়ে তেওয়ারীর মত নিঃসংশয় হইতে সে এখনও পারে নাই, কিন্তু তাহার শঠতা ও ছলনা তাহাকে একেবারে দ্বিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। জোসেক সাহেবকে আর যে-কোন দোষই দেওয়া যাক, আপনাকে সুস্পষ্ট করিবার পক্ষে শুরু হইতে কোন ভ্রুটি তাহার ঘটিয়াছে এ অপবাদ দেওয়া চলে না। তাহার সমতানী নিরতিশয় ব্যক্ত, তাহার চাবুকের আক্ষালন বিদ্যাহীন, জড়িমাঝ্জিত, প্রতিবেশীর প্রতি তাহার মনোভাবে কোথাও কোন হেয়ালী নাই, তাহার কণ্ঠঃসঙ্কেচ, বক্তব্য সরল ও প্রাজ্ঞ, তাহার নদমত্ত পদক্ষেপ অল্পভব করিতে কান খাড়া করিয়া রাখিতে হয় না,—এক কথায়, তাহাকে বুঝা যায়। কিন্তু, এই মেয়েটির কথা ও কাজের যেন কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া মিলে নাই। ক্ষতি সে যত করিয়াছে সেজন্তও তত নয়, কিন্তু গোড়া হইতে তাহার বিচিত্র আচরণ যেন অনুক্ষণ কেবল অপূর্বের সুদিকেই উপহাস করিয়া আসিয়াছে। রাগের মাথায় থানায় ঢুকিয়া সে শেষ যাত্রা সমস্ত কাহিনী পুলিশের কাছে বিবৃত করিতে পারিত কি না জানি, কিন্তু ততদূর গড়াইল না। পিছন হইতে ডাক গুলিল, এ কি অপূর্ব নাকি ? এখানে যে !

অপূর্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোষাকে পরিচিত তাহাকে পরিচিতি নিমাইবাবু। ইনি বাঙলা দেশের একজন

পুলিশ-কর্মচারী। অপূর্বের পিতা ইহার চাকরি করিয়া দেন, তিনিই ছিলেন ইহার মুক্খি। নিমাইবাবু তাঁহাকে দাদা বলিতেন, এবং সেই সূত্রে অপূর্বরা সকলেই ইহাকে নিমাইবাবু বুলিয়া ডাকিত। স্বদেশী যুগে অপূর্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইহারই প্রসাদে। পথের মধ্যেই অপূর্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরির সম্বাদ দিয়া স্ফিজাসা করিল, কিন্তু আপনি যে এদেশে ?

নিমাইবাবু আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, বাবা, কচি ছেলে তুমি, তোমাকে এতটা দূরে ঘর-দোর মা-বোন ছেড়ে আসতে হয়েছে আর আমাকে হাতে পারে না ? পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আমার সময় নেই, কিন্তু তোমার ত আকিসে যাবার এখনও ঢের দূর আছে। চলনা বাবা, পথে যেতে যেতে দুটো কথা শুনি। কতকাল যে তোমাদের গরব নিতে পারিনি তার ঠিক নেই। না ভাল আছেন ? দাদারা ?

সকলেই ভাল আছেন জানাইয়া অপূর্ব প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন ?

জাহাজ ঘাটে। চলনা আমার সঙ্গে।

চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে ?

নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে। যে মহাপুরুষকে সন্দেহনা করে নিজে যাবার জন্তে দেশ ছেড়ে এতদূর আসতে হয়েছে, তাঁর মিজির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করছে। তাঁর যোগাযোগ আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানের পুলিশের দ্বারা বাধা নেই যে তাঁর গায়ে হাত দেয়া আমিই পারব কিনা তাই ভাবচি। অপূর্ব মহাপুরুষের ইঙ্গিত বুঝিল। কোত্থদী হইয়া কহিল, মহাপুরুষটি কে কাকাবাবু ? যখন আপনি এসেছেন, তখন বাতাসটা কেমন নেই,—খুনী আসামী, না ?

• নিমাইবাবু কহিলেন, ঐটি বলতে পারুব না বাবা। তিনি যে কি, এবং কি নয় একথা ঠিক কেউ জানে না। এর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন চার্জও নেই, অথচ যে চার্জ আছে তা' আমাদের পিনাল কোডের কোহিনুর। একে চোখে-চোখে রাখতে এত বড় গবর্ণমেন্ট যেন হিম্-সিম্ খেয়ে গেল।

অপূৰ্ব জিজ্ঞাসা করিল, পোলিটিক্যাল আসামী বুঝি ?

নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ওরে বাবা, পোলিটিক্যাল আসামী ত লোকে তোদেরও এক সময় বলত। কিন্তু স্নেহে বললে এর কিছুই বুঝায় না। ইনি হচ্ছেন রাজবিদ্রোহী! রাজার শত্রু! হাঁ, শত্রু বলবার লোক বটে! বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এঁট ছেলেটির নাম রেখেছিলেন শবাসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবলপ্রতাপাব্যাহিত সরকার বাহাদুরের স্তম্ভ ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ ইন্ড্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক-পিস্তলে এর অভ্যাস লক্ষ্য, পদ্মানদী সাতার কেটে পার হয়ে যান, বাপে না,—সম্প্রতি অনুমান এই যে চট্টগ্রামের পথে হাড় ডিঙিয়ে তিনি বর্ষা মূলুকে পদার্পণ করেছেন। এখন ম্যাগেলে থেকে নদীপথে জাহাজে চড়ে রেঙ্গুনে আসবেন, কিম্বা, রেলপথে ট্রেনে যওয়ার হয়ে শুভাগমন করছেন সঠিক সম্বাদ নেই,—তবে তিনি যে রওনা হয়েছেন সেকথা ঠিক। তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সন্দেহ, কোন তর্ক নেই,—শত্রু মির সকলের মনেই তার স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে আছে, এবং নখর দেহটি তাঁর পঞ্চভূতের জিন্মায় না দিতে পারা পর্য্যন্ত এজ্ঞে যে এর আর পরিবর্তন নেই তাও সকলে জানি, শুধু এদেশে এসে কোন্ মুহূর্তে তিনি পা বাড়াবেন সেইটি কেবল আমরা জানি নে। কিন্তু দুর্য্যোগে বাবা, এসব কথা যেন কোথাও প্রকাশ করো না। তা'লে এই বড় বয়সে সাতাশ বছরের পেন্সনটি ত মারা যাবেই, হয়ত বা উপরি পাওনাও হরণ্যে ঘটেতে পারে।

অপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া কহিল, এতদিন কোথায় এবং কি করছিলেন ইনি? সব্যসাচী নাম ত কখনো শুনেছি মনি হুচে না!

নিমাইবাবু সহাস্তে কহিলেন, ওরে বাবা, এই সব বড় লোকদের: কি আর কেবল একটা নামে কাজ চলে? অজ্ঞানের মত দেশে দেশে কত নামই হয়ত এর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়ত শুনেও থাকবে এখন চিন্তে পারচো না। আর, কি যে ইতিমধ্যে করছিলেন সম্যক্ ওয়াকিবহাল নই। রাজ-শত্রুরা ত তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম ঢাকপিটে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুনায় এক দফা তিন মাস, এবং সিঙ্গাপুরে আর এক দফা তিন বছর জেল খেটেছেন জানি। ছেলেটি দশ কীরোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইয়ি কোথাকার। জার্মেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাশ করেচে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেচে, বিলেতে আইন পাশ করেচে, আমেরিকায় কি পাশ করেচে জানি নে, তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে,—এসব বোধ করি এর তাস-পাশা খেলার সামিল,—রিক্রিয়েশান,—কিন্তু, কিছুই কোন কাজে এলো না বাবা! এর সর্ব্বাঙ্গের শির দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জেলে দিয়েছেন যে শুকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও,—ঐ যে বললুম পঞ্চভূত ছাড়া আর আমাদের শাস্তি স্বস্তি নেই! এদের না আছে দয়া-মায়া, না আছে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, না আছে কোন ঘর-দোর,—বাপ্প্রে বাপ্প! আমরাও ত এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোথেকে এসে পাঙলা মূলকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না!

অপূর্ব সহসা কথা কহিতে পারিল না,—শিরার মধ্যে দিয়া তখন যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে নিমাই কহিল, এঁকে কি আজ আপনি আরোষ্ট করবেন? নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, আগে ত পাই!

অপূর্ব কহিল, ধরুন, পেলেন।

না বাবু, অত সহজ বস্তু নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সে শেষ মুহূর্তে আর কোন পথ দিয়ে আর কোথাও সরে গেছে।

আর যদি তিনি এসেই পড়েন তা'হলে ?

নিমাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাঁকে চোখে চোখে রাখবারই লক্ষ্য আছে। ছুদিন দেখি। ধরার চেয়ে ওয়াচ্ করার মূল্য বেশি,—এই ত সম্প্রতি গভর্ণমেন্টের ধারণা।

কথাটা অপূর্ব ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ, তিনি যাই হোন তবুও পুলিশ। তথাপি, তাহার মুখ দিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। কহিল, এ'র বয়স কত ?

নিমাইবাবু কহিলেন, বেশি নয়। বোধ হয় ত্রিশ বত্রিশের মধ্যেই।

কি রকম দেখতে ?

এইটিই ভারি আশ্চর্য্য বাবা। এত বড় একটা ভয়ঙ্কর লোকের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, যাও শক্ত। আমাদের রিপোর্টের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ করে উল্লেখ করা আছে।

অপূর্ব কহিল, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই ত এ'র হাঁটা-পথে পাহাড়-পর্বত ঘিড়িয়ে আসা ?

নিমাইবাবু বলিলেন, নাও হ'তে পারে। হয়ত কি একটা মতলব আছে, হয়ত পথটা একবার চিনে রাখতে চায়—কিছুই বলা যায় না। এরা যে পথের পথিক, তাতে সহজ মানুষের সোজা হিসেবের হিসেবের হিসেব মেলে না,—আজ এরই ভুল কি আমাদেরই ভুল তার একটা পরীক্ষা হবে। এমনও হ'তে পারে সমস্ত ছুটোছুটিই আমাদের পক্ষে। অত্যাধিকার হাঙ্গামা কহিল, তাই যেন হয় আমি ভগবানেশ্বরী কাঁধে কাঁধে বরণে রাখনি করি কাকাবাবু!

নিমাইবাবু নিজেও হাসিলেন, বলিলেন, বোকা ছেলে, পুলিশেধ কাছে একথা কি বলতে আছে? তোমার বাসার নম্বরটা ব'ললে? তিরিশ? কাল সকালে পারি ত একবার গিয়ে দেখে আসিবা। এই সামনের জেটিতেই বোধ হয় এদের ষ্টিমার লাগে,—আচ্ছা, তোমার আবার আফিসের সময় হয়ে এস,—নতুন চাকরি, দেরি হওয়া ভাল নয়। এই বলিয়া তিনি পাশ কাটাইয়া একটু দ্রুতপদে চলিবার উপক্রম করিতেই অপূর্ব কহিল, শুধু দেরি কেন, আজ আফিস কামাই হয়ে গেলেও আপনাকে ছাড়ি নে। আমি চাই নে যে তিনি এসে আপনার হাতে পড়েন, কিন্তু সে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই তবুও ত একবার চোখে দেখতে পারি। চলুন।

ইচ্ছা না থাকিলেও নিমাইবাবু বিশেষ আপত্তি করিলেন না, শুধু একটু সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, দেখবার লোভ যে হয় তা অস্বীকার করি নে, কিন্তু এসকল লোকের সঙ্গে কোন রকম আলাপ পরিচয়ের ইচ্ছে করাও বিপজ্জনক তা' তোমাকে বলে রাখি অপূর্ব! এখন আর তুমি ছেলেমানুষ নও, বাবাও বেঁচে নেই,—ভবিষ্যৎ ভেবে যাও বাবা, দায়িত্ব এখন একা তোমারই।

উল্লেখ ছেন যে

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, আলাপ পরিচয়ের সুযোগই চাই। ছাড়া কাউকে কখনো দেন কাকাবাবু? দোষ করেন নি, কোন অভিযোগও নেই, তবুও ত তাঁকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় এতদূরে ছুটি এসেছেন।

ইহার উত্তরে নিমাইবাবু শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন। তাৎপর্য অতীব গভীর। মুখে কহিলেন, কর্তব্য।

কর্তব্য! এই ছোট্ট একটি কথাই আড়ালে পৃথিবীর কত ভালবাসা, কত স্নেহই না সম্বিত হইয়া আছে। এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব আর কোন প্রশ্ন করিল না। উভয়ে জেটিতে যখন প্রবেশ করিলেন তখন সেইমাত্র ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড ষ্টিমার ভীয়ে ভিজিবার চেষ্টা করিতে

ছিল। পাঁচ সাতজন পুলিশ-কর্মচারী মাদা পোষাকে পূর্বে হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের একপ্রকার চোখের ইঙ্গিত লক্ষ করিয়া অপূর্ব তাহাদের যরূপ চিনিতে পারিল। ইহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়,—ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত স্বদূর বর্ষায় বিদ্রোহী শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাহাদের করতলগতপ্রায়। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তাহাদের মুখে চোখে প্রকাশ পাইয়াছে অপূর্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল। লজ্জায় ও দুঃখে সে মুখ কিরাইয়া দাঁড়াইতেই অকস্মাৎ এক মুহূর্তে তাহার সমস্ত ব্যক্তিগত চিত্র দিয়া যেন কোন এক অদৃষ্টপূর্ব অপরিচিত ছুতগার পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ছুড়িয়া ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিঙ ধরিয়া তাহাই উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতেছে,—ডেকের উপরে ব্যগ্রতা, কলরব ও ছুটাছুটির অবশিষ্ট নাই,—হয়ত, ইহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমনি উৎসুকভাবে তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের জলে একেবারে ঝাপসা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, জলে, স্থলে এত নরনারী দাঁড়াইয়া, কাহারও নরনারী, কোন অপরাধ নাই, শুধু যে-লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল স্বপ্ন, সকল স্বার্থ, সকল আশা যেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জগৎ হইয়া রহিয়াছে! জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল, কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপূর্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া একশতমনে বলিতে লাগিল, (মুহূর্ত পরে তোমার হাতে শঙ্খল হইবে, নৌতুলনী নর-নারী তোমার লাজনা ও অপমান চোখে দেখিয়া দেখিবে, তাহারা কানিতেও পারিবে না তাহাদের জগৎ ভূমি সর্বস্ব

ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না। তাহাদের চোখ দিয়া বরু বরু করিয়া জল পড়িতে লাগিল, এবং যাহাকে সে কোন দিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও,—তুমি দেশের জ্ঞান সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়; তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়;—কোন বিশ্বৃত অতীতে তোমারই জ্ঞান ত প্রথম শৃঙ্খল বহিতে হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল,—সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জ্ঞান! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্বন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার! এত লোকের ভিড়, এত লোকের অনাগোনা, এত লোকের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না,—নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারে তাহার শিশু, তাহার চিবুক, তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সময় যে কত কাটিল সেদিকেও তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুচিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদন্ত বিহীন ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, বা ভাই কহেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

কি করে পালালো?

নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জান্বো ত শে কি পালায়! প্রায়

শ' তিনেক ঘাত্রী, বিশ পঁচিশটা সাহেব ফিরিঙ্গী, উড়ে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী
 তাও শ' দিড়ে ক হবে, বাকি বর্ষা—সে যে কার পোষাক আর কার
 ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে 'গেল তা' দেবা ন জানন্তি—বুলে না
 বাবাজি—আমরা ত পুলিশ! চেনবার জো নেই তিনি বিলেতের কি
 বাঙলার! কেবল জগদীশবাবু সন্দেহ করে' জন ছয়েক বাঙালীকে
 থানায় টেনে নিয়ে গেছেন, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে
 মনে হয়, কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্য্যন্তই,—সে নয়। যাবে না কি বাবা,
 একবার লোকটাকে চোখে দেখবে?

অপূর্বর বৃকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল, কহিল, তাদের যদি মারধর
 করেন ত আমি যেতে চাইনে।

নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে
 ছেড়ে দিলাম আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের
 প্রতি অত্যাচার কোরবে? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিশকে
 বৃত্ত মন্দ মনে করিস, সবাই তা' নয়। ভাল-মন্দ সকলের মধ্যেই আছে,
 কিন্তু মুখ বুজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা' যদি জানতে ত
 তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতেনা অপূর্ব!

অপূর্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্তব্য করতে এসেছেন, তাই
 বলে আপনাকে ঘৃণা কেন কোরবে কাকাবাবু! এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া
 তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল। নিমাইবাবু খুঁসি হইয়া
 আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েছে, হয়েছে। চল একটু শীঘ্র যাওয়া
 যাক, লোকগুলো স্বেচ্ছায় তুফায় সারা হচ্ছে, একটু পরীক্ষা করে ছেড়ে
 দেওয়া যাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া
 বাহির করিয়া আনিলেন।

পুলিশ-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল স্মুথের হল-ঘরে জন
 ছয়েক বাঙালী মাটীঘাট লইয়া বসিয়া আছে, জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই

তাহাদের টিনের তোরঙ্গ ও ছোট বড় পুঁটুলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে-লোকটির প্রতি তাহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার সকলেই উত্তর-বঙ্গে বর্মা-অয়েল-কোম্পানির তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করিতেছিল, সেখানের জরুহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশ্যে রেশ্মনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া ও সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, পোলিটিক্যাল সান্‌পেক্টে সব্যসাচী যতকাল নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল। লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। বয়স ত্রিশ বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু ভারি রোগা দেখাইল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। সহসা আশঙ্কা হয়, সংসারের মিয়াদ বোধ করি বেশি দিন নাই; ভিতরের কি একটা ছুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্রয় সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোট কি বড় টানা কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন এ সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বুঝা,—অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মত কি যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহা শুধু কোন অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না।—কেবল এই জগতই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে! অপূর্ণ মুগ্ধ হইয়া সেই দিকে চাশি হইল, সহসা নিমাইবাবু তাহার বেশভূষার বাহার ও পাখিপাটোর প্রতি অপূর্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্তে কহিলেন, বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু তবু খোল আনাই বজায় আছে তা' স্বীকার করতে হবে। কি বল অপূর্ণ?

এতক্ষণে অপূর্ণ তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ

ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল। তাহার মাথার সম্মুখদিকে বড় বড় চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,—এমনি ছোট করিয়া ছাটা। মাথায় চেরা সিঁথি,—অপর্যাপ্ত তৈলনিষিক্ত, কঠিন, রুগ্ন কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানী সিকের রামধন্য রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবী, তাহার বুক-পকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা বাইতেছে, উত্তরীয়ের কোন বালাই নাই। পরণে বিলাতী মিলের কালো মকমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ী, পায়ে সবুজ রঙের ফুল মোজা—হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বাণিশ করা পাম্প শু, তলাটা মজবুত ও টিকসই করিতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি,—কয়দিনের জাহাজের ধকলে নমস্তই নোঙরা হইয়া উঠিয়াছে,—ইহার আপাদমস্তক অপূর্ণ বারবার পরীক্ষণ করিয়া কহিল, কাকাবাবু, এ লোকটিকে আপনি কোন কথা জিজ্ঞেসনা না করেই ছেড়ে দিন, যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।

নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ণ কহিল, আর বাই হোক, যাকে খুঁজছেন তাঁর কলচরের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, তোমার নাম কি হে ?

আজ্ঞে, গিরীশ মহাপাত্র।

একদম মহাপাত্র ! তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে, না ? এখন রেঙ্গুনেই থাকবে ? তোমার বাক্স বিছানা ত খানাতল্লাসী হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাকে এবং পকেটে কি আছে ?

তাহার ট্যাক হইতে একটি টাকা ও গুণ্ডা ছয়ক পয়সা বাহির হইল, পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস, মাপ করিবার কাঠের একটা

ফুটল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল।

নিমাইবাবু কহিলেন, তুমি গাঁজা খাও ?

লোকটি অসঙ্কোচে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন ?

আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম, যদি কারও কাজে লাগে তাই তুলে রেখেছি।

জগদীশবাবু এই সময়ে ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, দেখ জগদীশ, কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি। যদি কারও কাজে লাগে—তাই গাঁজার কলিকেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেছেন। দেখি বাবা তোমার হাতটি ? এই বলিয়া সেই প্রবীণ, সুদক্ষ পুলিশ কর্মচারী মহাপাত্রের ডানহাতের অঙ্গুষ্ঠটি তুলিয়া ধরিয়া অণুকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সহাস্তে কহিলেন, অনেক গাঁজা তৈরির চিহ্ন এইখানে বিদ্যমান বাবা, বল্লেই পারতে খাই। কিন্তু ক'দিনই বা বাঁচবে,—এই ত তোমার দেহ,— আর খেয়োনা। বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।

মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মাইরি খাইনে। তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললে দিই,—এই মাত্র ! নইলে নিজে খাইনে।

জগদীশবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর ! পরকে সেজে দিই, নিজে খাইনে ! মিথ্যেবাদী কোথাকার !

অপূর্ব কহিল, বেলা হয়ে গেল, আমি এখন চললাম কাকাবাবু।

নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো মহাপাত্র। কি বল জগদীশ, পারে ত ? জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন, কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায়না ভায়া, আমার মনে

হয় এ সহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার। রাত্রে মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বন্দায় এসেছে এ খবর সত্য।

জগদীশ কহিলেন, তা' হতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করবার দরকার নেই বড়বাবু। নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানাতুচ্চ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে! বড়বাবু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব পুলিশ-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাত্র তাঁহার ভাঙা টিনের তোরঙ্গ ও চাটাই-জড়ানো ময়লা বিছানার বাণ্ডিল বগলে চাপিয়া দীর মন্থর পদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল।

(৭)

আশ্চর্য্য এই যে, এতবড় সব্যাসাচী ধরা পড়িলনা, কোন দুর্ঘটনা ঘটিলনা এমন মোভাগ্যকেও অপূর্বের মন যেন গ্রাহ্যই করিল না। বাসায় কিম্বা দাড়ি-গোঁফ কামানো হইতে শুরু করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, স্নানাহার, পোশাকপরা, আফিস যাওয়া প্রভৃতি নিত্য কাজগুলোয় বাধা পাইলনা সত্য, কিন্তু ঠিক কি যে সে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দেশ নাই। অথচ, চোখ কান ও বুদ্ধি তাহার সাংসারিক সকল ব্যাপার ~~তাই~~ হই একেবারে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন এক অদৃষ্ট অপরিজ্ঞাত রাজবিদ্রোহীর চিন্তাতেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিল। এই অত্যন্ত অন্ত-মনস্থতা তলওয়ারকর লক্ষ করিয়া চিন্তিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বাড়ী থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন না কি?

কই না।

বাড়ীর খবর সব ভাল ত?

অপূর্ব কিছু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, যতদূর জানি সবাই ভালই ত আছেন।

রামদাস আর কোন প্রশ্ন করিল না। টিফিনের সময় উভয়ে একত্র

বসিয়া জলযোগ করিত। রামদাসের স্ত্রী অপূর্বকে একদিন সন্নিবদ্ধ অল্পবয়স্ক বনিতাছিলে, যতদিন তাঁহার মা কিম্বা বাটার আর কোন আত্মীয় নারী এদেশে আসিয়া বাসার উপযুক্ত ব্যবস্থা দি না করেন ততদিন এই ছোট বহিনের হাতের তৈরি যৎসামান্য মিষ্টান্ন প্রত্যহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অপূর্ব রাজী হইয়াছিল। আকিসের একজন ব্রাহ্মণ পিয়াদা এই সকল বহিয়া আনিত। আজও সে নিরান্না পাশের ঘরটার ভোজ্যবস্তুগুলি যখন সাজাইয়া দিয়া গেল, তখন আহায়ে বসিয়া অপূর্ব নিজেই কথা পাড়িল। কাল তাহার ঘরে চুরি হইয়া গেছে; সমস্ত ইতে পারিত, কেবল উপরের সেই কৌশান মেয়েটির ক্রপায় টাকাড়ি ছাড়া আর সমস্ত বাঁচিয়াছে। সে চোর তাড়াইয়া দরজায় নিজের তালা বন্ধ করিয়াছে, আমি বাসায় পৌঁছিলে চাবি খুলিয়া দিয়া অনাহত আমার ঘরে ঢুকিয়া ছড়ানো জিনিসপত্র গুছাইয়া দিয়াছে, সমস্ত ফর্দ করিয়া কি আছে আর কি গেছে তার এমন নিখুঁত হিসাব করিয়া দিয়াছে যে বোধ হয় তোমার মত পাশকরা এ্যাকাউন্টেন্টের পাশেও বিশ্বাসকর, বাস্তবিক, এমন তৎপর, এতবড় কার্যকুশল মেয়ে আর যে কেহ আছে মনে হয় না যে তলওয়ারকর! তা' ছাড়া এত বড় বন্ধু

রামদাস কহিল, তার পর?

অপূর্ব বলিল, তেওয়ারী ঘরে ছিলনা, বর্ষা নাচ দেখতে ফরায় গিয়েছিল, ইত্যবসরে এই ব্যাপার। তার বিশ্বাস এ কাজ ও ছাড়া আর কেউ করেনি। আমারও অল্পমান কতকটা তা' চুরি না করুক, সাহায্য করেছে।

তার পর?

তার পর সকালে গেলাম পুলিশে খবর দিতে। কিন্তু পুলিশের দল এমন কাণ্ড করলে, এমন তামাসা দেখালে যে শুকথ' আর মনেই হলনা। এখন ভাবচি, যা গেছে তা' বাক, তাদের চোর ধরে দিচ্ছি

আর কাজ নেই, তারা বরঞ্চ এমনিধারা বিজ্ঞোহী ধরে ধরেই বেড়াক। এই বলিয়া তাহার গিরীশ মহাপাত্র ও তাহার পোষাক পরিচ্ছদের বিহার মনে পড়িয়া হঠাৎ হাসির ছটায় যেন দম আটকাইবার উপক্রম হইল। হাসি থামিলে সে বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী বিলাতের ডাক্তার উপাধিধারী রাজশঙ্কর মহাপাত্রের স্বাস্থ্য, তাহার শিক্ষা ও কৃতি, তাহার বল-বীৰ্য, তাহার রামধন্য রঙের জামা, সবুজ রঙের মোজা ও লোহার নাল-সোকা পাম্পা শু, তাহার নেবুর তেলের গন্ধবিলাস, সর্বোপরি তাহার পরহিতায় গাঁজার কলিকাটির আবিষ্কারের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিতে করিতে তাহার উৎকট হাসির বেগ কোন মতে আর একবার সম্বরণ করিয়া শেষে কহিল, তলওয়ারকর, মহা হুসিয়ার পুলিশের দলকে আজকের মত নির্দোষ আহম্মক হতে বাব করি কেউ কখনো দেখেনি। অথচ, গভর্নমেন্টের কত টাকাই বা ইয়া বুনা হাঁসের পিছনে ছুটোছুটি করে অপব্যয় করলে!

রামদাস হাসিয়া কহিল, কিন্তু বুনা হাঁস ধরাই যে এদের কাজ; আপনাদের চোর ধরে দেবার জন্তে এরা নেই। আচ্ছা, এরা কি আপনাদের বাড়ী দেশের পুলিশ?

অপূর্ণ কহিল, হাঁ। তা'ছাড়া আমার বড় লজ্জা এই যে এদের যিনি কর্তা তিনি আমার আত্মীয়, আমার পিতার বন্ধু! বাবাই একদিন তাঁর চাকরি করে দিয়েছিলেন।

রামদাস কহিল, তা'হলে আপনাকেই হয়ত আর একদিন তার প্রাশ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সেই একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল,—আত্মীয়ের সম্বন্ধে এরূপ একটা মন্তব্য প্রকাশ করা হয়ত শোভন হয় নাই। অপূর্ণ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অর্থ বুঝিল, কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নয়, ইহাই সন্তোজে ব্যক্ত করিতে সে জোর কাহিয়া বলিল, আমি তাঁকে কাকা বলি, আমাদের তিনি

আ গীয়, শুভাকাজী, কিন্তু তাই বলে আমার দেশের চেয়ে ত তিনি আপনার নন। বরঞ্চ, থাকে তিনি দেশের টাকায়, দেশের লোক দিয়ে শিকারের মত তাড়া করে বেড়াচ্ছেন তিনি ঢের বেশি আমার আপনার।

রামদাস মুচকিয়া একটু হাসিয়া কহিল, বাবুজি, এ সব কথা বলার দুঃখ আছে।

অপূর্ব কহিল, থাকে, তাই নেব। কিন্তু তাই বলে তলওয়ারকর,— শুধু কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর যে কোন দেশে, যে কোন যুগে যে কেউ জন্মভূমিকে তার স্বাধীন করবার চেষ্টা করেছে, তাকে আপনার নয় বলবার সাধ্য আর যার থাক আমার নেই। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার তীক্ষ্ণ এবং চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল : মনে মনে বুঝিল কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সামলাইতে পারিলনা, বলিল, তোমার মত সাহস আমার নেই, আমি ভীক, কিন্তু তাই বলে অবিচারে দণ্ড ভোগ করার অপমান আমাকে শম বাজেনা রামদাস। বিনা দোষে ফিরিঙ্গী ছোড়ারা আমাকে যখন লাথি মেরে প্যাটফর্ম থেকে বার করে দিলে, এবং এই অত্যাচার প্রতিবাদ যখন করতে গেলাম, তখন সাহেব স্টেশনমাষ্টার কেবল আমাকে দেশী লোক বলেই দেশের স্টেশন থেকে কুকুরের মত দূর করে দিলে,—তার লাঞ্ছনা এই কালো চামড়ার নীচে কম জ্বলেনা তলওয়ারকর! এমন ত নিত্য নিয়তই ঘটেছে,—আমার মা, আমার ভাই যখনকে যারা এই সব সহস্র কোটি অত্যাচার থেকে উদ্ধার করতে চান তাদের আপনার বলে ডাকবার যে দুঃখই থাকে আমি আজ থেকে মাথাঘ তুলে নিলাম।

রামদাসের স্ত্রী গৌরবর্ণ মুখ ক্ষণকালের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, কই এ ঘটনা ত আমাকে বলেননি!

অপূর্ব কহিল, বলা কি সহজ রামদাস ? হিন্দুস্থানের লোক সেখানে
 ম ছিলনা, কিন্তু, আমার অপমান কারও গায়েই ঠেকলনা এমনি তাদের
 অভ্যাস হয়ে গেছে। লাথির চোটে আমার যে হাড়-পাঁজ্ৰা ভেঙ্গে যায়নি
 এই স্বথবরে তারা সব খুসি হয়ে গেল। তোমাকে জানাবো কি—মনে
 হলে দুঃখে লজ্জায় ঘুণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই।

রামদাস চূপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার হুই চোখ ছলছল করিয়া
 আসিল। স্বমুখের ঘড়িতে তিনটা বাজিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বোধ
 হয় কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া হঠাৎ হাত বাড়াইয়া
 অপূর্বের ডান হাতটা টানিয়া লইয়া একটা চাপ দিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে
 গিয়া গেল।

সেই দিন বিকালে আফিসের ছুটি হইবার পূর্বে বড় সাহেব
 একখানা লম্বা টেলিগ্রাম হাতে অপূর্বের ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, আমাদের
 আফিসে কোন শৃঙ্খলাই হচ্ছেনা। ম্যান্ডালে, শোএবো,
 নিকুখিলা এবং এদিকে প্রোম সব ক'টা অফিসেই গোলযোগ ঘটচে।
 আমার ইচ্ছা তুমি একবার সবগুলো দেখে আস। আমার অবর্তমানে
 অন্তত তারই ত তোমার,—একটা পরিচয় থাকা চাই,—স্বতরাং বেশি
 দ্রুত না কোরে কাল-পরশ যদি একবার—

অপূর্ব তৎক্ষণাত সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই বার হয়ে যেতে
 পারি। বস্তুতঃ, নানা কারণে রেপুনে তাহার আর এক মুহূর্ত মন
 টকিতে ছিলনা। উপরন্তু, এই সূত্রে দেশটাও একবার দেখা হইবে।
 মৃত্যুও যাওয়াই স্থির হইল, এবং পরদিনই অপরাহ্ন বেলায় সূদূর ভামো
 গরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। সঙ্গে রহিল
 দ্বারদালি এবং আফিসের একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ পিয়াদা। তেওয়ারী
 দ্বারদারীর উত্তরই বাসাতেই রহিল। পা-ভাদ্রা সাহেব হুসপাতালে
 গড়িয়া, স্বতরাং তেমন আর ভয় নাই। বিশেষতঃ, এই স্নেহদেশের

বেরুন সহরটা বরং সহিয়াছিল, কিন্তু আরও অজানা স্থানে পা বাড়াইবার তাহার প্রবৃত্তিই ছিল না। তলওয়ারকর তেওয়ারীর পিঠ ঠুকিয়া দিয়া সাহস দিয়া কহিল, তোমার চিন্তা নেই ঠাকুর, কোন কিছু হলেই আফিসে গিয়ে আমাকে সম্বাদ দিয়ে।

গাড়ী ছাড়িতে বোধ করি তখনও মিনিট পাঁচেক বিলম্ব ছিল, অপূর্ব হঠাৎ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ওই যে।

তলওয়ারকর ঘাড় ফিরাইতেই বুঝিল, এই সেই গিরীশ মহাপাত্র। সেই বাহারে জামা, সেই সবুজ রঙের ফুল মোজা, সেই পাম্প শু এবং ছড়ি, প্রভেদের মধ্যে এখন কেবল সেই বাঘ-আঁকা ক্রমালখানি বুকপকেট ছাড়িয়া তাহার কণ্ঠে জড়ানো। মহাপাত্র এই দিকেই আসিতেছিল, হুমুখে আসিতেই অপূর্ব ডাকিয়া কহিল, কি হে গিরীশ, আমাকে চিন্তে পারো? কোথায় চলেচ?

গিরীশ শশবাস্তে একটা মস্ত নমস্কার করিয়া কহিল, আজ্ঞে, দ্বিধিতে পারি বই কি বাবু মহাশয়। কোথায় আগমন হচ্ছেন?

অপূর্ব সহাস্তে কহিল, আপাততঃ ভামো যাচ্ছি। তুমি কোথায়?

গিরীশ কহিল, আজ্ঞে, এনাজাং থেকে ছ'জন বন্দু নোক আসার কথা ছিল,—আমাকে কিন্তু বাবু বুটমুট হয়রাণ করা। হাঁ, আনে স্টে-কেউ কেউ আপিং সিদ্ধি হুকিয়ে, কিন্তু, আমি বাবু ভারি দম্মভীক্ মানুষ। বলি কাজ কি বাপু জুচ্চরিতে—কথায় বলে শব্দোদম্ভ ভরাবয়। লল্লাটের লেখা ত খণ্ডাবেনা।

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, আমারও ত তাই বিশ্বাস। কিন্তু তোমার বাপু একটা ভুল হয়েছে, আমি পুলিশের লোক নই, আফিম সিদ্ধির কোন ধার ধারিনে,—সেদিন কেবল তামাসা দেখতেই গিয়েছিলাম।

তলওয়ারকর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল, কহিল, বাবুজি ম্যায় নে আপকো তো জকর কঁহা দেখা—

গিরীশ কহিল, আশ্চর্য্য নেহি হয় বাবু সাহেব নৌকরির বাসে
কত্না যায়গায় তো ঘুমত্না হয়,—

অপূর্ব্বকে বলিল, কিন্তু আমার ওপর মিথ্যে সন্দেহ রাখবেন না
বাবু মহাশয়, আপনাদের নজর পড়লে চাকরিও একটা জুটবে না।
বামুনের ছেলে, বাঙলা লেখাপড়া, শাস্ত্রের টাস্তর সবই কিছু কিছু শিখে-
ছিলাম, কিন্তু এমন অদেষ্ট যে—বাবু মহাশয় আপনারা—

অপূর্ব্ব কহিল, আমি ব্রাহ্মণ।

আছে, তা' হলে নমস্কার। এখন তবে আসি,—বাবু সাহেব, রাম
রাম—বলিতে বলিতে গিরীশ মহাপাত্র একটা উদাত্ত কাশির বেগ
সামলাইয়া লইয়া ব্যগ্রপদে সম্মুখের দিকে অগসর হইয়া গেল।

অপূর্ব্ব কহিল, এই সব্যাসাচীটির পিছনেই কাকাবাবু মদলবলে এদেশ
ওদেশ করে বেড়াচ্ছেন তলওয়ারকর! বলিয়া সে হাসিল। কিন্তু এই
হাসিতে তলওয়ারকর যোগ দিল না। পরক্ষণে বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী
ছাড়িয়া দিলে সে হাত বাড়াইয়া বন্ধুর করমর্দন করিল, কিন্তু তখনও
মুখ দিয়া তাহার কথাই বাহির হইল না। নানা কারণে অপূর্ব্ব লক্ষ
করিয়া না, কিন্তু করিলে দেখিতে পাইত এই মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে
হাস্যাসের প্রশস্ত উজ্জল লনাটের উপরে যেন কোন এক অদৃশ্য মেঘের
ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, এবং সেই স্বদূর ছুনিরীক্ষ লোকেই তাহার সমস্ত
মনশ্চক্ষু একেবারে উদ্বাগ হইয়া গিয়াছে।

অপূর্ব্ব প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, তাহার কামরায় আর কেহ লোক ছিল
না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সে পিরানের মধ্যে হইতে পৈতা বাহির করিয়া
বিনা জ্বলেই সাব্বসন্ধ্যা সমাপন করিল, এবং যে সকল ভোজ্যবস্তু শাস্ত্র-
মতে স্পর্শহুষ্ট হয় না জানিয়া সে সঙ্গে আনিয়াছিল পিতলের পাত্র হইতে
বাহির করিয়া আহার করিল, জল ও পান তাহার ব্রাহ্মণ আরদালি
পূর্ব্বাহ্নে রাখিয়া গিয়াছিল, এবং শয্যাও সে প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছিল,

অতএব রাত্রির মত অপূৰ্ণ ভোজনাতি শেষ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া পবিত্র স্মৃতিতে শয্যা আশ্রয় করিল। তাহার ভরসা ছিল প্রভাতকাল পর্যন্ত আর তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে না। কিন্তু ইহা যে কতবড় ভ্রম তাহা কয়েকটা ষ্টেশন পরেই সে অনুভব করিল। সেই রাত্রির মধ্যে বার তিনেক তাহার ঘুম ভাঙাইয়া পুলিশের লোক তাহার নাম ও ধাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়াছে। একবার সে বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদ করায় বন্দী সব-ইনস্পেক্টর সাহেব কটু কণ্ঠে জবাব দেয়, তুমি ত ইউরোপিয়ান নও!

অপূৰ্ণ কহে, না। কিন্তু আমি ত ফাষ্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার,—রাত্রি ত আমার তুমি ঘুমের বিঘ্ন করিতে পারো না।

সে হাসিয়া বলে, ও নিয়ম রেলওয়ে কর্মচারীর জ্ঞাত,—আমি পুলিশ, ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে টানিয়া নীচে নামাইতে পারি।

ইহার পরে আর অপূৰ্ণ প্রত্যুত্তর করে নাই। কিন্তু শেষের দিকে ঘণ্টা তিন চারেক নিক্রপদ্রবে কাটার পরে সকালে যখন তাহার ঘুম ভাঙিল, তখন বিগত রাত্রির গ্লানির কথা আর তাহার মনে ছিল না। একটা বড় পাহাড়ের অনতিদূর দিয়া গাড়ী মহুর গতিতে চলিয়াছিল, খুব সম্ভব এটা চড়াইয়ের পথ। এইখানে জানালার বাহিরে খুব বাড়াইয়া সে অকস্মাৎ বিষ্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। চক্ষের পলকে বুঝিল, পৃথিবীর এতবড় মৌন্দর্য্য সম্পদ সে আর কখনও দেখে নাই। গিরিশ্রেণী অর্কবৃত্তাকারে বিস্তৃত হইয়া যেন পিছন ও গুম্বজের পথ বোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তার বিরাট দেহ ব্যাপিৎ গঙ্গীর বন, এবং গগনস্পর্শী কি বিপুলকায় বৃক্ষরাজ্যই না, তাহার স্তম্ভাঙ্কণ পাদমূল ঘেরিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে! বোধ হয় যবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে, বামদিকের শিখর ডিঙাইয়া রথ তাঁহার আকাশে এখনও দেখা দেয় নাই, কিন্তু অগ্রবর্তী কিরণচ্ছটায় উপরের নীল অরণ্যে সোনা

স্বাধীনতা সেই তাঁহার আশার সংবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইতে আর বাকি নাই। খাদের মধ্যে শিখর-নিঃসৃত জলের ধারা বহিয়াছে, বনের ছায়ায় নীচে তাহার শান্ত প্রবাহ অশ্রুবেগের মতই সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ণ মুখ হইয়া গেছে। এক আশ্রয় সুন্দর দেশ! এখানে যাহারা যুগ-যুগান্ত ধর্মী বাসী আধিতে পাইয়াছে তাহাদের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে? কিন্তু কেবলমাত্র সীমা নাই বলিয়া, শুধু একটা অনির্দিষ্ট আনন্দের আভাসমাত্র লইয়াই মানবের হৃদয় পূর্ণ তৃপ্তি মানিতে চাহেনা তাই সে ইহাকে মূর্তি দিয়া, মূর্তি দিয়া মনে মনে স্বেচ্ছাবিধ রসে ও রঙে পল্লবিত করিয়া, ক্রোশের পূর্ব ক্রোশ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। এমন করিয়া তাহার ভাবুক চিত্ত যখন অন্তরে-বাহিরে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া আসিতেছিল, তখন হঠাৎ যেন কটিন ধাক্কাই চমকিয়া দেখিল তাহার কল্পনার বথচক্র মেদিনী গ্রাস করিতেছে। রামদাস, তাহার কল্পনার কথাগুলো মনে পড়িল। আসিয়া পর্যন্ত এই ব্রহ্মদেশের অনেক গুপ্ত ও ব্যক্ত কাহিনী সে সংগ্রহ করিতেছিল। সেই প্রসঙ্গে একদিন সে বলিয়াছিল, বাবুজি, শুধু কেবল শোভা মৌন্দবাই নয়, প্রকৃতি মাটির দেওয়া এতবড় সম্পদও কম দেশে আছে। ইহার বন ও অরণ্য সম্প্রদায়, মাটির মধ্যে ইহার অফুরন্ত তেলের প্রস্রবণ, ইহার মহামূল্য রত্নখনির মূল্য নিরূপিত হয় না, আর ওই যে আকাশচুম্বি মহাজন্মের সারি, জগতে ইহার তুলনা কোথায়? সে বেশি দিনের কথা নয়, স্বপ্নাদ পাইয়া একদিন ইরাজ বণিকের লুক্করুটি ইহারই প্রতি একেবারে প্রস্তুত হইয়া পড়িল। তাহার অনিবার্য পরিণাম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং শোকা। বিবাদ বাদিল, মানোয়ারি জাহাজ আসিল, বন্দুক কামান আসিল, দৈত্য স্ত্রী আসিল, লড়াই বাদিল, যুদ্ধে হারিয়া দুর্বল অক্ষম রাজা নির্বাসিত হইলেন এবং তাঁহার রাণীদের গায়ে গুহনা বেচিয়া লড়াইয়ের খরচ, আদায়, হইল। অতঃপর, দেশের ও দেশের কল্যাণে

মানবতার কল্যাণে, সভ্যতা ও ন্যায়ধর্মের কল্যাণে ইংরাজ রাজশক্তি বিজিত দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের অশেষবিধ ভালো করিতে কায়মনে লাগিয়া গেলেন। তাহিত আজ তথায় সতর্কতার অবধি নাই, তাহিত সেই বিজিত দেশের পুলিশ কর্মচারী তাহারই মত আর এক পরাধীন দেশের নিরীহ ব্যক্তিকে বারম্বার ঘুম ভাঙ্গাইয়া নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিল, তুমিত সাহেব নও যে তোমাকে অপমান করিতে আমার বাধিবে? অপূর্ব মনে মনে কহিল, বটেই ত! বটেই ত! ইহার অধিক আমাকে সে কি দিবে? ইহার বড় আমিই বা কোন্ মুখে তাহার কাছে দাবী করিব?

অরণ্যশিরে প্রভাতসূর্য্যের কনক আভা তখনও রঙ হারায় নাই, কিন্তু তাহার চোখে অত্যন্ত স্নান ও কান্তিহীন ঠেকিল, সমুন্নত পর্ব্বতমালা তাহার কাছে সামান্য এবং বৃক্ষশ্রেণীর যে বিপুলতা দেখিয়া সে ক্ষণেক পূর্বে বিশ্বয়-মুগ্ধ হইয়াছিল তাহারাই তাহার দৃষ্টিতে সাধারণ ও নির্দোষ বিশেষত্ববজ্জিত বলিয়া বোধ হইল। তাহার নদীমাতৃক, সমতল, শস্তাশ্যামল বঙ্গভূমিকে মনে পড়িয়া দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,— প্রবাসী পীড়িত-চিত্ত তাহার বৃকের মধ্যে আর্তনাদ করিয়া যেন বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, ওরে দুর্ভাগা দেশের শক্তিহীন নরনারী!— ওই অশেষ ঐশ্বর্য্যময়ী জঙ্গভূমির প্রতি তোদের অধিকার কিসের? যে ভার, যে গৌরব তোরা বহিতে পারিবি না তাহার প্রতি এই বার্থ লোভ তোদের কিসের জন্ম? স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার তা কেবল মহুগ্ধদের, শুধু মানুষ বলিয়াই থাকেনা; একথা আজ এই অস্বীকার করিবে? ভগবানও যে ইহা হরণ করিতে পারেন না! তোদের ওই সব ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, পঙ্খ হাত পা গুলাকেই কি তোরা মানুষ বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছিস? ভুল, ভুল; ইহার বড় আত্মঘাতী ভুল ত আর হইতেই পারেনা! এমনি কত কি যে আপনাকে আপনি বলিতে

বলিতে তাহার সময় কাটিতে লাগিল তাহার হিসাব ছিলনা, অকস্মাৎ, ট্রেনের গতি মন্দীভূত হওয়ায় তাহার চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল গাড়ী ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

(৮)

ছেলেবেলা হইতেই মেয়েদের প্রতি অপূর্বর শ্রদ্ধা ছিলনা। বরঞ্চ, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। বৌদিদিরা ঠাট্টা তামাসা করিলে সে মনে মনে রাগ করিত, ঘনিষ্ঠতা করিতে আসিলে দূরে সরিয়া যাইত। মা ভিন্ন আর কাহারও সেবা যত্ন তাহার ভালই লাগিত না। কোন মেয়ে কলেজে পড়িয়া একজামিন পাশ করিয়াছে শুনিলে সে খুসি হইত না এবং সেদিন যখন বিলাতে ইহার কোমর বাঁধিয়া রাজনৈতিক অধিকারের জন্ত লড়াই করিতেছিল খবরের কাগজে সেই সকল কাহিনী পড়িয়া তাহার সর্বদা জ্বলিতে থাকিত। তবে একটা জিনিস ছিল তাহার স্বভাবতঃ কোমল ভদ্র হৃদয়। এইখানে সে নর-নারী-নির্বিশেষে প্রাণীমাত্রকেই অত্যন্ত ভালবাসিত, কাহাকেও কোন কারণেই ব্যথা দিতে তাহার বাবিত। তাহার এই একটি দুর্বলতাই যে ভারতীকে অপরাধী জানিয়াও শেষ পর্য্যন্ত শাস্তি দিতে দেয় নাই এ সম্বাদ তাহার অগোচর ছিল না। কিন্তু পুরুষের যৌবন-চিন্তা-তুলে আরও যে অনেক প্রকারের দুর্বলতা ঐকান্ত সংগোপনে বঁধি করে সেই খবরটাই আজও তাহার কাছে পৌছে নাই। এই জীশান মেয়েটিকে কোনদিন কঠিন দণ্ড দেওয়া যে তাহার পক্ষে একে-বারেই অসম্ভব। ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু নারীর প্রতি তাহার বিমুখতা সত্য বলিয়াই যে মন তাহার ভারতীকেও অনায়াসে চিরদিন দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিবে তাহাও তেমনই সত্য না হইতে পারে।

অথচ, আজ যে সেই নির্মূর মিথ্যাচারিণী রমণীর প্রতি তাহার বিরাগ ও বিদ্বেষের অবধি ছিলনা একথাও ত তাহার অন্তর্যামী দেখিতেছিলেন।

দিন পোনের হইল সে ভামোয় আসিয়াছে। এখানকার কাজ তাহার একপ্রকার সমাধা হইয়াছে, কাল পরশু তাহার মিক্খিলা রওনা হইবার কথা। সন্ধ্যার পরে আজ আফিস হইতে ফিরিয়া নিজের ঘরের বারান্দায় বসিয়া সে মনে মনে একটা অত্যন্ত জটিল সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত ছিল। নারীর স্বাধীনতার প্রসঙ্গে মন তাহার কোনকালেই নায় দিতে চাহিতনা। ইহাতে মঞ্জল নাই, ইহা ভাল নয়—তাহার রুচি ও আদর্শ সংস্কার এ কথা অনুক্ষণ তাহার কানে কানে বলিত। অথচ, শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলার মধ্যেও যে ইহাদের প্রতি গভীর অবিচার নিহিত আছে এ সত্য তাহার তায়-নিষ্ঠ চিন্তা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিত না। ইহাতে সে দৃঃখ পাইত কিন্তু পথ পাইত না। অকস্মাৎ, আজ এই দ্বিধা তাহার যে কারণে একেবারে কাটিয়া গেল তাহা এইরূপ—

যে দ্বিতল ঘরটিতে সে বাসা লইয়াছে তাহার নীচের তলায় একটি ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। সকালে আফিসে যাইবার পূর্বে তাহার সংসারে এক বিবম অনর্থ ঘটে। তাহার চাব-কণা, সকলেই বিবাহিত। কি একটা উৎসব উপলক্ষে জামাতারা সকলেই আজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভোজের সময় সন্ধ্যা ও ইজ্জত লইয়া প্রথমে মেয়েদের মধ্যে এবং অনতিকাল পরেই বাবা-মায়ের মধ্যে লাঠালাঠি রক্তারক্তি বাড়িয়া যায়; অপূর্ণ খবর লইতে গিয়া হতবুদ্ধি হইয়া শুনিল যে ইহাদের একজন মাদ্রাজের চুলিয়া মুসলমান, একজন চট্টগ্রামের বাঙালী-পর্ন্তুগীজ, একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব, এবং ছোট জামাতাটি চীনা, কয়েক পুরুষ হইতে এই সহরেই বাস করিয়া চামড়ার কারবার করিতেছেন। এইরূপ পৃথিবী শুদ্ধ জাতির

শুভর হইবার গৌরব অত্র দুর্লভ হইলেও এখানে অতিশয় সুলভ। তত্রাচ, প্রতিবারেই নাকি ভদ্রলোক সভয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়েদের অপ্রতিহত স্বাধীনতা তাহাতে কান পর্যন্ত দেয় নাই। এক একদিন এক একটি কত্বে বাটীর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেলনা, আবার এক একদিন করিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল, এবং সঙ্গে আসিল এই বিচিত্র জামাইয়ের দল। তাহাদের ভাষা আলাদা, ভাব আলাদা, ধর্ম আলাদা, মেজাজ আলাদা,—শিক্ষা, সংস্কার কাহারও সহিত কাহারও এক নয়,—এই যে দেশের মধ্যে ভারতের হিন্দু মুসলমান প্রণের মত ধীরে ধীরে এক অতি কঠিন সমস্তার উদ্ভব হইতেছে ইহার মীমাংসা হইবে কি করিয়া? ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে, বিরক্তিতে সে মনে মনে লাফাইতে লাগিল, এবং মেয়েদের এই সামাজিক স্বাধীনতাকেই একশু'বার করিয়া বলিতে লাগিল, এ হইতেই পারে না,—এমন কিছুতেই চলিবে না। বন্দা নষ্ট হইতেছে, ইয়োরোপ উচ্ছন্ন বাইতে বসিয়াছে—সেই ধার-করা সভ্যতা আমাদের দেশেও আমদানি করিলে আমরা সমূলে মরিব। আমাদের সমাজ যাহারা গড়িয়াছিলেন নারীকে তাঁহারা চিনিয়াছিলেন, তাইত এই সতর্ক বিধি-নিষেধ! ইহা কঠোর হউক, কিন্তু কল্যাণে পরিপূর্ণ। এ দুদিনে যদি না তাঁহাদের অসংশয়ে ধরিয়া থাকিতে পারি ত মুত্যা হইতে কেহই আমাদের বাঁচাইতে পারিবে না। এমনি ধারা কত কি সে সেই অন্ধকারে একাকী বসিয়া আপন মনে বলিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু হায় রে! ওই মোজা কথাটা তাহার মনে একবারও উদয় হইল না যে, যে-মুক্তিমন্ত্রকে সে এ জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া কায়-মনে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, তাহারই আর এক মূর্তিকে সে দুই হাতে ঠেলিয়া মুক্তির সত্যকার দেবতাকেই অসম্মানে দূর করিয়া দিতেছে! মুক্তি কি তোমার এমনই ছোট একটুখানি জিনিস? তাহাকে কি তোমার আরামে চোখ বুজিয়া স্নান

করিবার চৌবাচ্চা স্থির করিয়া বসিয়া আছ ? সে সমুদ্র । আছেই ত তাহাতে ভয়, আছেই ত তাহাতে উত্তাল তরঙ্গ, আছেই ত তাহাতে কুমীর হাঙর ! তরী সেইখানেই ডোবে,—তবু সেইখানেই আছে জগতের প্রাণ,—তারই মধ্যে আছে সকল শক্তি, সকল সম্পদ, সকল সার্থকতা ! নিরাপদ পুকুর লইয়া কেবলমাত্র প্রাণ ধারণ করাটুকুই চলে, বাঁচা চলে না !

বাবুজি, আপনার খাবার তৈরি ।

অপূর্ব চকিত হইয়া কহিল, রামশরণ একটা আলো নিয়ে আয় । কাল সকালের গাড়ীতেই আমরা মিক্খিলা যাবো । ম্যানেজারকে একটা খবর পাঠিয়ে দে ।

আরদালি কহিল, কিন্তু আপনার যে পরশু যাবার কথা ছিল ?

না, আর পরশু নয়, কালই,—একটা আলো দিয়ে যা, এই বলিয়া অপূর্ব এ সন্ধক্ষে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল । সমাজের মধ্যে মেয়েদের স্বাধীনতার একটা নূতন দিক দেখিয়া মন তাহার উদ্ভাস্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু আরও যে দিক আছে যাহার বর্ণ ও আলো সমস্ত গগন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে, এ দৃশ্য আজ তাহার মনে স্বপ্নেও উদয় হইল না ।

পরদিন যথাসময়ে সে মিক্খিলার উদ্দেশে যাত্রা করিল । কিন্তু এখানে আসিয়া তাহার মন ঢিকিল না । দেশী ও বিলাতী পণ্টনের ছাউনি আছে, বাঙালী অনেকগুলি সপরিবারে বাস করিতেছেন—খাসা সহর, নূতন লোকের পক্ষে দেখিয়া বেড়াইবার অনেক বস্তু আছে, কিন্তু এ সকল তাহার ভালই লাগিল না । মনটা রেঙ্গুনের জগু কেবলই ছুঁফুঁ করিতে লাগিল । ভামোয় থাকিতে রিডাইকেস্ট করা মায়ের একখানা পত্র সে পাইয়াছিল, রামদাসেরও গোটা দুই চিঠি তারপর আসিয়াছিল, কিন্তু সেও প্রায় দশ বারোদিন পূর্বে । রামদাস

জানাইয়াছিল তাহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বাসা বদল করিবার প্রয়োজন নাই, এবং সে নিজে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছে যে তেওয়ারীজি সুখে এবং শান্তিতে বাস করিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সে কেমন আছে, তাহার সুখ শান্তি বজায় আছে, কিম্বা দুইই অন্তর্হিত হইয়াছে কোন খবরই তাহাকে দেওয়া হয় নাই। খুব সম্ভব সমস্তই ঠিক আছে ব্যাঘাত কিছুই হয় নাই, কিন্তু তবু একদিন সে ভামোর মতই হঠাৎ জিনিসপত্র বাধিয়া ষ্টেশনের জন্ত গাড়ী ডাকিতে লুকুম করিয়া দিল। এই স্থানটাকে মনে রাখিবার মত কিছুই তাহার ঘটে নাই, যৎসামান্য কাজ-কর্মের মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না, কিন্তু ছাড়িয়া যাইবার মিনিট পোনের পূর্বে ষ্টেশনে আসিয়া এমন একটা ব্যাপার ঘটিল যাহা আপাততঃ সামান্য ও সাধারণ বোধ হইলেও ভবিষ্যতে বহুদিন তাহাকে স্মরণ করিতে হইয়াছে। একজন মাতাল বাঙ্গালীর ছেলেকে রেলের লোকে টেণ হইতে নামাইয়াছে। পরণে তাহার মলিন ও ছিন্ন ছাট কোট প্রভৃতি বিলাতি পোষাক। সঙ্গে কেবল একটা ভাঙ্গা বেহালার বাক্স, না আছে বিছানা, না আছে কিছু। টিকিটের পরসায় সে মদ কিনিয়া পাইয়াছে এই মাত্র তাহার অপরাধ। বাঙ্গালীর ছেলে, পুলিশে লইয়া যায়,—অপূর্ব তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিল, আরও গোটা পাচেক টাকা তাহার হাতে দিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতেছিল, হঠাৎ সে হাতছোড় করিয়া কহিল, মশাই, আমার এই বেহালাখানা আপনি নিয়ে যান। বিক্রী করে টাকাটা আপনার কেটে নিয়ে বাকি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। তাহার কণ্ঠস্বরের জড়িমা সত্ত্বেও ইহা বুঝা গেল সে সজ্ঞানেই কথা কহিতেছে।

অপূর্ব কহিল, কোথায় ফিরিয়ে দেব?

সে কহিল, আপনার ঠিকানা বলে দিন, আপনাকে আমি চিঠি লিখে জানাব।

অপূর্ব কহিল, তোমার বেহালা তোমার থাক বাপু, ও আমি বিক্রী করতে পারবনা। আমার নাম অপূর্ব হালদার, রেঙ্গুনের বোথা কোম্পানিতে চাকরি করি, যদি কখনো তোমার সুবিধে হয় টাকা পাঠিয়ে দিযো।

সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা মশাই নমস্কার,—আমি নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব। বার হবার পথ বুঝি ওই দিকে? বেশ বড় সহর, না? বোধ হয় সব জিনিসই পাওয়া যায়। বাস্তবিক মশায়, আপনার দয়া আমি কখনো ভুলব না। এই বলিয়া সে আর একটা নমস্কার করিয়া বেহালার বাক্স বগলে চাপিয়া চলিয়া গেল। তাহার চেহারাটা এইবার অপূর্ব লক্ষ করিয়া দেখিল। বয়স বেশি নয় কিন্তু ঠিক কত বলা শক্ত। বোধ হয় সর্বপ্রকার নেশার মাহাত্ম্যে বছর দশেকের ব্যবধান ঘুচিয়া গেছে। বর্ণ গোর, কিন্তু রোদ্রে পুড়িয়া তামাটে হইয়াছে; মাথার রুক্ষ লম্বা চুল কপালের নীচে ঝুলিতেছে, চোখের দৃষ্টি ভাসাভাসা, নাক খাঁড়ার মত সোজা এবং তীব্র। দেহ শীর্ণ, হাতের আঙুলগুলি দীর্ঘ এবং নরু—সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া উপবাস ও অত্যাচারের চিহ্ন আঁকা। সে চলিয়া গেলে অপূর্বর কেমন যেন একটা কষ্ট হইতে লাগিল। তাহাকে আর অধিক টাকা দেওয়া বৃথা এমন কি অন্ডায় একথা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু আর কোন কিছু একটা উপকার করা যদি সম্ভব হইত! কিন্তু, এ লইয়া চিন্তা করিবার আর সময় ছিলনা, তাহাকে টিকিট কিনিয়া গাড়ীর জন্ত প্রস্তুত হইতে হইল।

পরদিন রেঙ্গুনে যখন সে পৌছিল তখন বেলা বারোটা। যেমন কড়া রোদ্র, তেমনি গুমোট গরম। তাহার উপর বিপদ এই হইয়াছিল যে তাড়াতাড়ি ও অসাবধানে তাহার খাবারের পাত্রটা মুসলমান কুলি ছুঁইয়া ফেলিয়াছিল। স্নান নাই, আহার নাই,—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে তাহার দেহ যেন টলিতে লাগিল। কোনমতে বাসায় পৌছিয়া স্নান

ফরিয়া একবার শুইতে পাইলে বেন বাচে। ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া হইয়া আসিলে জিনিসপত্র বোঝাই দিয়া বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে মিনিট দশেক মাত্র লাগিল। কিন্তু উপরের দিকে চাহিয়া তাহার ক্রোধের অবধি রহিলনা। তেওয়ারীর কোন উৎকর্ষাই নাই, রাস্তার দিকে বারান্দার কবাটটা পর্য্যন্ত খোলে নাই, গাড়ীর শব্দে একবার নামিয়াও আসিলনা। ক্রতপদে উঠিয়া গিয়া দ্বারের উপরে সজোরে কড়াঘাত করিয়া ডাকিল, তেওয়ারী! ওরে ও তেওয়ারী! ক্ষণকাল পরে আস্তে, অত্যন্ত সাবধানে কবাট খুলিয়া গেল। ক্রুদ্ধ অপূর্ব ঘরের মধ্যে পা বাড়াইবে কি বিশ্বয়ে অবাক ও হতবুদ্ধি হইয়া গেল। স্তম্ভে দাঁড়াইয়া ভারতী। তাহার এ কি মূর্তি! পায়ে জুতা নাই, পরণে একখানি কালো রঙের শাড়ী, চুল শুকনো এলো-মেলো, মুখের উপর শান্ত গভীর বিষাদের ছায়া,—এ যেন কোন বহুদূরের তীর্থযাত্রী, রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি দিবা পথ চলিয়াছে—তবে কোন মুহূর্তেই পথের পরে পড়িয়া মরিতে পারে। ইহার প্রতি কেহ যে কোনদিন রাগ করিতে পারে অপূর্ব মনে করিতেই পারিলনা। ভারতী মাথা নোয়াইয়া একটু নমস্কার করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আপনি এসেছেন,—এবার তেওয়ারী বাঁচবে।

ভয়ে অপূর্বের স্বর জড়াইয়া গেল, কহিল, কি হয়েছে তার?

ভারতী তেমনিই মৃদুকণ্ঠে বলিল, এদিকে অনেকের বসন্ত হচ্ছে, তারও হয়েছে। কিন্তু আপনি ত এখন এত পরিশ্রমের পরে এঘরে ফেরতে পারেন না। উপরের ঘরে চলুন, এখানে বরঞ্চ স্নান করে একটু জিরিয়ে নীচে আসবেন। তাছাড়া ও ঘুমোঁচ্ছে, জাগলে আপনাকে খবর দেব।

অপূর্ব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, উপরের ঘরে?

ভারতী বলিল, হাঁ। ঘরটা এখনো আমাদেরই আছে, কিন্তু আমি

চলে গেছি। বেশ পরিষ্কার করা আছে, কলে জল আছে; কেউ নেই, আপনার কষ্ট হবেনা, চলুন। কিন্তু আপনার লোকজন কই? সন্দের জিনিসপত্র গুলো তারা শুইখানেই নিয়ে আসুক।

কিন্তু তাদের ত আমি স্টেশন থেকেই ছেড়ে দিয়েছি। তারাও ত আমারি মত ক্লান্ত হয়েছিল।

ভারতী কহিল, তা বটে, কিন্তু এখন কি কুলি পাওয়া যাবে? আচ্ছা, দেখি।

আপনাকে দেখতে হবেনা, আমিই দেখছি। ওই কটা জিনিস আমি নিজেই আনতে পারবো, বলিয়া অপূর্ব নীচে বাইতেছিল, গাড়োয়ান মুগ্ধ বাড়াইয়া ভাড়া চাহিল। ভারতী তাহাকে ইসারায় উপরে ডাকিয়া কহিল, এখন ত লোক পাওয়া যাবেনা, তুমি যদি একটু কষ্ট করে জিনিসগুলো তুলে দিয়ে যাও তোমাকে তার দাম দেব। তাহার স্তম্ভ কথায় খুদি হইয়া গাড়োয়ান জিনিস আনিতে গেল।

সমস্ত আসিয়া পড়িলে ভারতী পথের দিকের ঘরটায় মেঝের উপর পরিপাটি করিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া দিয়া কহিল, এইবার স্নান করে আসুন।

অপূর্ব কহিল, সমস্ত ব্যাপারটা আগে আমাকে খুলে বলুন।

ভারতী কলের ঘরটা দেখাইয়া দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আগে স্নান করে আপনার সন্ধ্যা আহ্নিক গুলো সেরে আসুন।

অপূর্ব জিহ্বা করিল না। খানিক পরে সে স্নান প্রভৃতি শারিরা আসিলে ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, আপনার এই গেলাসটা মিন, জানালায় উপরে কাগজে মোড়া শুই চিনি আছে নিয়ে আমার সঙ্গে কলের কাছে আসুন, কি করে সরবৎ তৈরি করতে হয় আমি শিখিয়ে দিই। চলুন।

অধিক বলার প্রয়োজন ছিলনা, তুষায় তাহার বুক ফাটিতেছিল, সে

নির্দেশমত সরবৎ তৈরি করিয়া পান করিল, এবং একটু নেবুর রস হইলে আরও ভাল হইত তাহা নিজেই কহিল।

ভারতী বলিল, আপনাকে যে আরও একটা দুগ্ধ আমাকে দিতে হবে, বলিয়া সে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অপূর্বের সেই চুরির দিনের কথাবার্ত্তা, কাজ কর্মের ধরণ ধারণ মনে পড়িয়া নিজেরও কথা কহা যেন সহজ হইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দুগ্ধ ?

ভারতী কহিল, নীচে থেকে আমি কয়লা এনে রেখেছি, টেলিগ্রাম পেয়ে স্ত্রীমুখের বাড়ীর উড়ে ছেলেটিকে দিয়ে আপনার সেই লোহার উত্তনটি মাড়িয়ে ধুইয়ে নিয়েছি, চাল আছে, ডাল আছে, আলু, পটল যি, এতল, হুন, সমস্ত মজুর আছে,—পেতলের হাঁড়িটি এনে দিচ্ছি আপনি শুধু একটু জল দিয়ে পুয়ে নিয়ে চড়িয়ে দেবেন। এই বলিয়া সে অপূর্বের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব আন্দাজ করিয়া বলিল, সত্যি বলুটি কিছু শক্ত কাজ নয়। আমি সমস্ত দেখিয়ে দেব, আপনি শুধু চড়াবেন আর নামাবেন। আজকের মত এই কষ্টটি করুন, কাল অন্য ব্যবস্থা হবে।

তাহার কথাবরের ঐকান্তিক ব্যাবুলতা অপূর্বকে হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা মারিল। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনার খাবার ব্যবস্থা কি রকম হয় ? কখন বাসায় যান ?

ভারতী কহিল, বাসায় নাই গেলাম, কিন্তু আমাদের খাবার ভাবনা আছে নাকি ? এই বলিয়া সে কথাটা উড়াইয়া দিয়া প্রয়োজনীয় জিনিস-গুলি আনিতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে অপূর্ব বাঁধিতে বসিলে সে ঘরের চৌকাটের বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল, এখানে দাঁড়ালে দোষ হয় না তা' জানেন ত ?

অপূর্ব কহিল, জানি, কারণ, হলে আপনি দাঁড়াতেন না। জীবনে

সে এই প্রথম রাধিতে বসিয়াছে, অপটু হস্তের সহস্র ক্রটিতে মাঝে মাঝে ভারতীর ঐর্ষ্যচ্যুতি হইতে লাগিল, কিন্তু রাধা ভাল বাটিতে ঢালিতে গিয়া যখন বাটি ছাড়া আর সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল তখন সে আর সহিতে পারিলনা। রাগ করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, আপনাদের মত অকর্ম্মা লোকগুলোকে কি ভগবান সৃষ্টি করেন শুধু আমাদের জন্ম করতে? খাবেন কি করে বলুন তা?

অপূর্ব্ব নিজেই অপ্রতিভ হইয়াছিল, কহিল, এ যে হাড়ির ওদিক দিয়ে না পড়ে এদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে কি করে জানব বলুন? আচ্ছা, ওপর থেকে একটু তুলে নেব?

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, নেবেন বই কি! নইলে আর বিচার থাকবে কি কোরে! নিন্ উঠুন, জল দিয়ে ওসব ধুয়ে ফেলে দিয়ে এই আলু পটলগুলো তেল আর জল দিয়ে 'সেদ্ধ' করে ফেলুন। গুড়ো মশলা ওই শিশিটাতে আছে, তখন দেবার সময়ে আমি না-হয় দেখিয়ে দেব,—তরকারি বলে ওই দিয়ে আজ আপনাকে খেতে হবে। ভারতের ফ্যান তা সব ভারতের মধ্যেই আছে, নেহাৎ মন্দ হবেনা। আঃ—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার রান্না দেখার চেয়ে বরং নরক ভোগ ভাল।

ইহার ঘণ্টা দেড়েক পরে অপূর্ব্বর আহার শেষ হইলে সে কৃতজ্ঞতার আবেগ দমন করিয়া শান্ত মুহুর্ত্তে কহিল, আপনাকে আমি যে কি বোলবো ভেবে পাইনে, কিন্তু এবার আপনি বাসায় যান। এখন থেকে আমিই দেখতে পারবো, আর আপনাকে বোধ হয় এত দুঃ জ্ঞাপ করতে হবেনা।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব্ব নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন। এদিকে আরও দশজনের বসন্ত হচ্ছে তেওয়ারীরও হয়েছে—এ পর্য্যন্ত খুব সোজা। কিন্তু

এ বাসা থেকে আপনাদের সবাই চলে গেলে এই নির্বাসিত দেশে এবং ততোধিক বন্ধুহীন পুরীতে আপনি কি করে যে তার প্রাণ দিতে রয়ে গেলেন এইটেই আমি কোন মতে ভেবে পাইনে। জোসেফ সাহেবও কি আপত্তি করেন নি?

ভারতী কহিল, বাবা বেঁচে নেই, তিনি হাসপাতালেই মারা গেছেন।

— মারা গেছেন? অপূর্ণ অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, আপনার কালো কাপড় দেখে এমনি কোন একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা আমার পূর্বেই অনুমান করা উচিত ছিল।

ভারতী কহিল, তার চেয়েও বড় দুর্ঘটনা ঘোটলো হঠাৎ মা যখন মারা গেলেন—

মা মারা গেছেন? অপূর্ণ স্তব্ধ হুসাড় হইয়া বসিয়া রহিল। নিজের মায়ের কথা মনে পড়িয়া তাহার বুকের মধ্যে কি এক রকম করিতে লাগিল কখনো সে পূর্বে অনুভব করে নাই। ভারতী নিজেও জানালার বাহিরে মিনিট দুই নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অশ্রু সংরোধ করিল। মুখ ঘুরাইতে গিয়া দেখিল অপূর্ণ সজ্জলচক্ষে তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। আবার তাকে জানালার বাহিরে চোখ ফিরাইয়া চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল। কাহারো কাছেই অশ্রুপাত করিতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিত। কিন্তু আপনাকে শাস্ত করিয়া লইতেও তাহার বিলম্ব হইত না, মিনিট দুই তিন পরে ধীরে ধীরে বলিল, তেওয়ারী বড় ভাল লোক। আমার মা অনেকদিন থেকেই শয্যাগত ছিলেন, যে কোন সময়েই তাঁর মৃত্যু হতে পারে আমরা সবাই জানতুম। তেওয়ারী আমাদের অনেক করেছে। আমরা চলে যাবার সময় সে কাঁদতে লাগলো, কিন্তু এত ভাড়া আমি কোথা থেকে দেব?

অপূর্ণ নীরবে শুনিতে লাগিল। ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আপনার

সেই চুরি ধরা পড়েচে, টাকা, বোতাম পুলিশে জমা আছে। আপনি খবর পেয়েছেন?

কই না!

হাঁ, ধরা পড়েচে। ওকে বারো সেরদিন তামাসা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই দল। আরও কার কার চুরি করার পরে বোধ হয় ভাগাভাগি নিয়ে বনিবনাও না হওয়াতেই একজন সমস্ত বলে দিয়েছে। এক চেষ্টির দোকানে যা কিছু জমা রেখেছিল পুলিশ সমস্ত উদ্ধার করেছে। আমি একজন সাফী, এইখানে সন্ধান নিয়ে তাক্স একদিন আমার কাছে উপস্থিত,—সেই খবরটা দিতে এসেই ত দেখি এই ব্যাপার। কবে মকদ্দমা দিক জানিনে, কিন্তু সমস্ত ফিরে পাওয়া বাবে শুনেচি।

এই শেষ কথাটা হয়ত সে না বলিলেই পারিত, কারণ লজ্জার অপূরণীয় মুখ শুধু আরক্তই হইলনা, এই ব্যাপারে নিজের সেই সকল ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইঙ্গিতগুলো মনে করিয়া তাহার গায়ে কাটা দিল। কিন্তু ভারতী এ সব লক্ষণ করিলনা, বলিতে লাগিল, ভেতর থেকে দোর বন্ধ, কিন্তু হাজার ডাকাডাকিতেও কেউ সাড়া দিলে না। আমাদের উপরের ঘরের চাবিটা আমার কাছে ছিল, খুলে ভিতরে গেলাম। মেঝেতে আমার একটা প্রসিদ্ধ ফুটো আছে,—বলিয়া সে একটুখানি লজ্জার মুহূর্ত হাসি গোপন করিয়া কহিল, তা'র মধ্যে দিয়ে আপনার ঘরের সমস্ত দেখা যায়, দেখি, সমস্ত জানালা বন্ধ, অন্ধকারে কে একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে,—তেওয়ারী বলেই বোঝা হইল। সেই ফুটো দিয়ে চেষ্টিয়ে একশ'বার বললাম, তেওয়ারী, খান্নাম, আমি ভারতী, কি হয়েছে দোর খোল। নীচে এসে আবার তেমনি ডাকাডাকি, করতে লাগলাম, মিনিট কুড়ি পরে তেওয়ারী হামাগুড়ি দিয়ে এসে কোনমতে দোর খুলে দিলে। তার চেহারা দেখে আমার বলবার

কিছু আর রইল না। দিন চারেক পূর্বে সন্ধ্যার বাড়ীর নীচের ঘর থেকে বসন্তরুগী জন দুই তেলেগু কুলিকে পুলিশের লোকে হাসপাতালে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাহাদের কান্না আর অতুনয়-বিনয় তেওয়ারী নিজের চোখে দেখেছে,—আমার পা দুটো সে দুহাতে চেপে ধরে একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললে, মাইজি! আমাকে পেলেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়োনা তা'হলে আমি আর বাঁচবনা। কথাটা মিল্পো নেহাৎ নয়, ফিরতে কাউকে বড় শোনা যায়না। সেই ভয়ে সে দোর জানালা দিবারাত্রি বন্ধ করে পড়ে আছে,—পাড়ার কেউ ঘুগাশ্বরে জানলে আর রক্ষে নেই।

অপূর্ব অভিজ্ঞতের গ্রায তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কহিল, আর সেই থেকে আপনি একলা দিনরাত আছেন,—আমাকে একটা খবর পাঠালেন না কেন? আমাদের আফিসের তাৎক্ষণিক তত্ত্ব জানেন, তাঁকে বলে পাঠালেন না কেন?

ভারতী কহিল, কে যাবে? লোক কই? ভেবেছিলাম, হয়ত খবর নিতে একদিন তিনি আসবেন, কিন্তু এলেন না। এ বিপদ যে ঘটেচে তিনিই বা কি করে ভাববেন? তা ছাড়া জানাজানি হয়ে যাবার ভয় আছে।

তা' বটে। বলিয়া অপূর্ব একটা দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া নিস্তক হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, আপনার নিজের চেহারা কি হয়ে গেছে দেখেছেন?

ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ এর চেয়ে আগে ঢের ভাল ছিল?

অপূর্বর মুখে সহসা এ কথার উত্তর যোগাইল না, কিন্তু তাহার হই চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার গঙ্গাজল দিয়া যেন এই তরুণীর বর্ষাঙ্গের সকল গ্লানি, সকল ক্লান্তি ধুইয়া মুছিয়া দিতে চাহিল।

অনেকক্ষণ পরে কহিল, 'মাতুষে যা করে না, তা' আপনি করেছেন, কিন্তু এবার আপনার ছুটি। তেওয়ারী শুধু আমার চাকর নয়, সে আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়,—তার কোলে পিঠে চড়ে আমি বড় হয়েছি। এখন থেকে তার রোগে আমিই সেবা কোরব,—কিন্তু তার জগ্নো আপনাকে আমি পীড়িত হতে দিতে পারবনা। এখনো আপনার স্নানাহার হয়নি, আপনি বাসায় যান। সে কি এখান থেকে বেশি দূরে ?

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। বাসা আমার তেলের কারখানার পাশে, নদীর ধারে। আমি কাল আবার আসবো। দুইজনে নীচে নামিয়া আসিল, তালা খুলিয়া উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। তেওয়ারীর সাজ নাই, ঘুম ভাঙিলেও সে অধিকাংশ সময় অজ্ঞান আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে। অপূর্ণ গিয়া তাহার বিছানার পাশে বসিল। এবং যে দুই চারিটা অপরিষ্কার পাত্র তখনও মাজিয়া ধুইয়া রাখা হয় নাই, সেইগুলি হাতে লইয়া ভারতী স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্বে রোগীর সম্বন্ধে গোটা কয়েক প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া এই দুর্দান্ত ভয়ানক রোগের মধ্যে আপনাকে সাবধানে রাখিবার অত্যাবশ্যকতা বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়া যায়। হাতের কাজ শেষ করিয়া সে এই কথাগুলিই মনে মনে আবৃত্তি করিয়া এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অপূর্ণ অচেতন তেওয়ারীর অতি বিকৃত মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া যেন পাথরের মূর্তির মত বসিয়া আছে, তাহার নিজের মুখ একেবারে ছাইয়ের মত শাদা। বসন্ত রোগ সে জীবনে দেখে নাই, ইহার ভীষণতা তাহার কল্পনার অগম্য। ভারতী কাছে গিয়া দাঁড়াইতে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার দুই চক্ষু ছল্ছল্ করিয়া আসিল, এবং সেই চক্ষে পলক না পড়িতেই ঠিক ছেনেমাতুষের মতই ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি পারব না।

(৯)

ভারতী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া শুধু কহিল, পারবেন না? তাই ত!

তাহার কণ্ঠস্বরে একটুখানি বিস্ময়ের আভাস ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা, কিন্তু এই কি জবাব? এই কি সে তাহার কাছে আশা করিয়াছিল? হঠাৎ যেন মার খাইয়া অপূর্বর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

ভারতী কহিল, তাহলে একটা খবর দিয়ে তাকে হাসপাতালেই পাঠাতে হয়। তাহার কথার মধ্যে শ্লেষও ছিলনা, ঝাঁজও ছিলনা, কিন্তু, লজ্জায় অপূর্বর মাথা হেঁট হইল। লজ্জা শুধু তাহার না-পারার জন্ত নয়, যে পারে তাহাকেই পারিতে বলার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছিতের মধ্যে লুকাইয়া আরও প্রচ্ছন্ন যে দাবী ছিল, ভারতীর শাস্ত প্রত্যাখ্যানে সে যখন কঠিন তিরস্কারের আকারে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বাজিল, তখন আনতমুখে বসিয়া অত্যন্ত অনুশোচনার সহিত তাহাকে আর একবার মনন করিতে হইল, এই মেয়েটিকে সে যথার্থই চিনে নাই। দুঃখ দুশ্চিন্তা কোথাও কিছু ছিলনা,—ছিল যেন কেবল কত দীপ, কত আলো জ্বালা;—হঠাৎ কে যেন সমস্ত এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিয়া অসমাপ্ত নাটকের মঞ্চখানে যবনিকা টানিয়া দিল। ভয়ানক অন্ধকারে রহিল শুধু সে আর তাহার অপরিভ্রাজ্য মরণোন্মুখ অচেতন তেওয়ারী।

ভারতী বলিল, বেলা থাকতে থাকতেই কিছু করা চাই। বলেন ত আমি যাবার পথে হাসপাতালে একটা টেলিফোঁ করে দিয়ে যেতে পারি। তারা গাড়ী এনে তুলে নিয়ে যাবে।

অপূর্ব তাহার আচ্ছন্ন ভাব জোর করিয়া কাটাইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে বল্লেন সেখানে গেলে কেউ বাঁচেনা?

ভারতী কহিল, কেউ বাঁচেনা এ কথা ত বলিনি।

অপূর্ব অত্যন্ত মলিনমুখে বলিল, তা'হলে বেশি লোকেই ত মরে যায় ?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, তা যায়। এই জগ্গই জ্ঞান থাক্তে কেউ সেখানে কিছুতে যেতে চায়না।

অপূর্ব চুপ করিয়া ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তেওয়ারীর কি কিছু জ্ঞান নেই ?

ভারতী কহিল, কিছু আছে বই কি। সব সময়ে না থাকলেও মাঝে মাঝে সমস্তই টের পায়।

এই সময়ে তেওয়ারী সহসা কি এক প্রকার আন্তনাদ করিয়া উঠিতে অপূর্ব এমনি চমকিয়া উঠিল যে, ভারতী তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে কাছে আসিয়া রোগীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই তেওয়ারী ?

তেওয়ারী ঠোট নাড়িয়া যাহা বলিল অপূর্ব তাহার কিছুই বুঝিল না, কিন্তু ভারতী সাবধানে তাহাকে পাশ ফিরাইয়া দিয়া ঘটি হইতে একটুখানি জল তাহার মুখে দিয়া কানে কানে কহিল, তোমার বাব এসেছেন যে !

প্রত্যুত্তরে তেওয়ারী অব্যক্ত ধ্বনি করিল, ডান হাতটা একবার তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নাড়িতে পারিলনা। পরক্ষণেই দেখা গেল তাহার নিম্নলিখিত চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। অপূর্বের নিজের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি কোচার খুঁট দিয়া তাহা সে মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু থামাইতে পারিলনা,—বারে বারে সেই দুটি আর্দ্র চক্ষু প্রাবিত করিয়া মজ্জা ধারায় বারিমা পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মিনিট দুই তিন কেহ কোন কথা কহিল না। সমস্ত ঘরখানি দুঃখ ও শোকের ঘন-মেঘে ঘেন থম্ থম্ করিতে লাগিল। কথা

কহিল প্রথমে ভারতী। সে একটুখানি সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল,
কি আর করা হবে, হাসপাতালেই পাঠিয়ে দিন।

অপূর্ব চোখের উপর হইতে তখনও আবরণ সরাইতে পারিলনা,
কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

ভারতী তেমনি আস্তে আস্তে কহিল, সেই ভাল। আমি এখন
তা'হলে চলুম। যদি সময় পাই কাল একবার আসবো।

তখনও অপূর্ব চোখ খুলিতে পারিলনা, শুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।
যাইবার পূর্বে ভারতী বলিল, সবই আছে, কেবল মোমবাতি ফুরিয়ে
গেছে, আমি নীচে থেকে এক বাণ্ডিল কিনে দিয়ে যাবি, এই বলিয়া
সে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মিনিট কয়েক
পরে বাতি লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন কতকটা পরিমাণে বোধ
হয় আপনাকে অপূর্ব সামলাইয়া লইতে পারিয়াছিল। চোখ মুছা শেষ
হইয়াছে, কিন্তু ভিজা পাতার নীচে সে দুটি রাঙা হইয়া আছে, ভারতী
ঘরের ঢুকিতেই সে আর একদিকে মুখ ফিরাইল। হাতের মোড়কটি
কাছে রাখিয়া দিয়া কি যেন সে একবার বলিতে চাহিল, কিন্তু আর
একজন যখন কথা না কহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, তখন সেও আর প্রশ্ন
না করিয়া পলকমাত্র নিঃশব্দে থাকিয়া প্রস্থানের জন্ত দ্বার খুলিতেই
অপূর্ব অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, তেওয়ারী যদি জল খেতে চায়?

ভারতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, জল দেবেন।

অপূর্ব কহিল, আর যদি পাশ ফিরে শুতে চায়?

ভারতী বলিল, পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেবেন।

বলা ত সহজ। আমি শোব কোথায় শুনি? তাহার কণ্ঠস্বর
ক্ৰোধ চাপা রহিল না, কহিল, বিছানা ত রইল পড়ে ওপরের ঘরে

ভারতী কি মনে করিল তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল না। এক
মুহূর্ত স্থির থাকিয়া তেমনি শান্ত মুহূর্তে কহিল, আর একটা



বিছানা ত আপনার খাটের উপরে আছে, তাতে ত অনায়াসে শুতে পারবেন।

অপূর্ব কহিল, আপনি ত বলবেনই ও কথা। আর আমার খাবার বন্দোবস্ত কি রকম হবে ?

ভারতী চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু এই অসম্ভব ও অত্যন্ত খাপছাড়া প্রশ্নে গোপন হাসির আবেগে তাহার চোখের পাতা দুটি যেন কাঁপিতে লাগিল। খানিক পরে পরম গাভীরোর সহিত কহিল, আপনার শোওয়া এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করার ভার কি আমার উপরে আছে ?

তাই কি আমি বল্চি ?

এই মাত্র ত বললেন। এবং ভাল করে না রাগ করে।

অপূর্ব ইহার আর উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। তাহার মলিন, বিপন্ন মুখের প্রতি চাহিয়া ভারতী দীর্ঘে দীর্ঘে কহিল, আপনার বলা উচিত ছিল, দয়া করে আমার এই সব বিলি-ব্যবস্থা আপনি করে দিন।

অপূর্ব কোন দিকে না চাহিয়া কহিল, তা বলা আর শক্ত কি ?

ভারতী কহিল, বেশ ত, তাই বলুন না !

তাই ত বল্চি, বলিয়া অপূর্ব মুখ ভারি করিয়া আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া রহিল।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখনো কি কারও রোগে সেবা করেন নি ?

না।

আর কখনো বিদেশেও আসেন নি ?

না। মা আমাকে কোথাও যেতে দেন না।

তবে, এবারে যে বড় আপনাকে ছেড়ে দিলেন ?

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। কেমন করিয়া এবং কি কারণে যে তাহার বিদেশে আসায় মা সম্মত হইয়াছিলেন একথা সে পরের কাছে

বলিতে চাহিল না। ভারতী কহিল, এতবড় চাকরি;—না ছেড়ে দিলেই বা চলবে কেন? কিন্তু তিনি সঙ্গে এলেন না কেন?

তাহার এই প্রকার তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশে অপূর্ব ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, আমার মাকে আপনি দেখেন নি, নইলে একথা বলতে পারতেন না। অনেক দুঃখেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু বিধবা মাছুষ, এই স্নেহদেখে তিনি নিজের আসবেন কেমন করে?

ভারতী এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, স্নেহদের প্রতি আপনাদের ভয়ানক ঘণা। কিন্তু রোগ ত শুধু গরীবের জন্য সৃষ্টি হয়নি, আপনারও ত হতে পারতো। এখনো ত হতে পারে,—মা কি তাহলে আসেন না?

অপূর্বর মুখ ফাকাশে হইয়া গেল, কহিল, এমন কোরে ভয় দেখালে আমি কি করে একলা থাকবো?

ভারতী কহিল, ভয় না দেখালেও আপনি একলা থাকতে পারবেন না। আপনি অভ্যস্ত ভীতু মাছুষ।

অপূর্ব প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেসা করি আমি। আমার হাতে জল থেয়ে তেওয়ারীর ত জাত গেছে, ভাল হয়ে সে কি করবে?

অপূর্ব ইহার শাস্ত্রোক্ত বিধি জানিত না, একটু চিন্তা করিয়া কহিল, সে তো আর সজ্ঞানে থাকেনি, মরণাপন্ন ব্যারামে ঠেয়েচে, না থেলে হয়ত মরে যেত। এতে বোধ হয় জাত বায় না, একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই হতে পারে।

ভারতী কক্কিত করিয়া বলিল, হঁ। তার খরচ বোধ হয় আপনাকেই দিতে হবে,—নইলে, আপনি বা তার হাক্ত থাকেন কি কোরে?

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিল, আমিই দেব বৈ কি, নিশ্চয় দেব। ভগবান করুন সে শীঘ্র ভাল হয়ে উঠুক।

ভারতী বলিল, আর আমিই গুপ্তধা করে তাকে ভাল করে তুলি, না?

তাহার শাস্ত কঠিন কণ্ঠস্বর অপূর্ব লক্ষ্যই করিল না, কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উত্তর দিল, সে আপনাদি দয়া। তেওয়ারী বাঁচুক, কিন্তু আপনিই ত তার প্রাণ দিলেন।

ভারতী একটুখানি হাসিল। কহিল, স্নেহে প্রাণ দিলে দোষ নেই, মুখে জল দিলেই তার প্রায়শ্চিত্ত চাই, না? এই বলিয়া সে পুনরায় একটু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, এখন আমি চললাম। কাল যদি সময় পাই ত একবার দেখে যাবো। এই কথা বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আর যদি আস্তে না পারি ত তেওয়ারী ভাল হলে তাকে বল্লেন, আপনি না এসে পড়লে আমি যেতাম না, কিন্তু স্নেহদেবও একটা সমাজ আছে, আপনার সঙ্গে একঘরে রাত্রি কাটালে তারাও ভাল বলে না। কাল সকালে আপনার পিয়ন এলে তলওয়ারকর বাবুকে খবর দেবেন। তিনি পাকা লোক, সমস্ত ব্যবস্থাই করে দিতে পারবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

অপূর্ব কহিল, পাশ ফিরিয়ে দিলে গুরু লাগবে না?

ভারতী বলিল, না।

রাত্রে যদি বিছানা বদলে দেবার দরকার হয়? কি করে দেব?

ভারতী কহিল, সাবধানে দেবেন। আমি মেয়েমানুষ হয়ে যদি পেরে থাকি আপনি পারবেন না?

অপূর্ব শঙ্কিতমুখে স্থির হইয়া রহিল। ভারতী খাইবার জগ্গ ছাড় খুলিতেই অপূর্ব সভয়ে বলিয়া উঠিল, আর যদি হঠাৎ বসে? যদি কঁাদে?

ভারতী, 'এ সকল প্রশ্নের আর কোন জবাব দিবার চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া সাবধানে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার মুহূ পদশব্দ কাঠের সিঁড়ির উপরে যতক্ষণ শুনা গেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপূর্ব কাঠের মূর্তির মত বসিয়া রহিল, কিন্তু শব্দ থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহার চোখের উপরে কোথা হইতে একটা কালো জাল নামিয়া আসিয়া সমস্ত দেহ কি করিয়া যে উঠিল সে জীবনে কখনো অনুভব করে নাই। ভয়ে ছুটিয়া গিয়া বারান্দার কপাট খুলিয়া ফেলিয়া নীচে চাহিয়া দেখিল ভারতী দ্রুতপদে রাস্তায় চলিয়াছে। মিস্ জোসেফ নামটা সে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেই পারিল না, উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, ভারতী!

ভারতী মাথা তুলিয়া চাহিতে অপূর্ব দুই হাত জোড় করিয়া কহিল একবার আস্থন—মুখ দিয়া আর তাহার কথা বাহির হইল না। ভারতী দ্বিকাক্তি না করিয়া ফিরিল। মিনিট দুই পরে দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল অপূর্ব নাই, তেওয়ারী একাকী পড়ে আছে। আগাইয়া আসিয়া উকি মারিয়া দেখিল বারান্দায় সে নাই—কোথাও নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, স্নানের ঘরের কপাট খোলা। কিন্তু মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়াও যখন কেহ আসিল না, তখন সে সন্দ্বিগ্ধচিত্তে দরজার ভিতরে গলা বাড়াইয়া যাহা দেখিতে পাইল তাহাতে ভয়ের আর সীমা রহিল না। অপূর্ব মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া, দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইয়াছিল সমস্ত বমি করিয়াছে, তাহার চোখ মুদিত এবং সর্বাপ ধামে ভাসিয়া যাইতেছে। কাছে গিয়া ডাকিল অপূর্ববাবু!

প্রথম ডাকেই অপূর্ব চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই ভ্রাবার চোখ বুজিয়া তেমনি স্থির হইয়া রহিল। ভারতী মুহূর্তকালমাত্র দ্বিধা করিল, তাহার পরেই সে অপূর্বর কাছে বসিয়া মাথায হাত দিয়া আশ্তে

আন্তে বলিল, উঠে বসতে হবে যে। মাথায় মুখে জল না দিলে ত শরীর শোধরাবেনা অপূর্ববাবু।

অপূর্ব উঠিয়া বসিলে সে হাত ধরিয়া তাহাকে কলের কাছে আনিয়া জল খুলিয়া দিলে সে হাত মুখ ধুইয়া ফেলিল। তখন ধীরে ধীরে তাহাকে তুলিয়া আনিয়া খাটের উপরে শোয়াইয়া দিয়া ভারতী গামছার অভাবে নিজের আঁচল দিয়া তাহার হাত ও পায়ে জল মুছাইয়া দিল এবং একটা হাতপাখা খুঁজিয়া আনিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, এইখার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আপনি স্থস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি যাবোনা।

অপূর্ব লজ্জিত মুহূর্ত্তে কহিল, কিন্তু আপনার যে এখনো খাওয়া হয়নি।

ভারতী বলিল, খেতে আর আপনি দিলেন কই? আপনি ঘুমোন।

ঘুমিয়ে পড়লে ত আপনি চলে যাবেন না?

না, আপনার ঘুম না ভাঙা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরব।

অপূর্ব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনাকে মিস্ ভারতী বলে ডাকলে কি আপনি রাগ করবেন?

নিশ্চয় কোরব। অথচ শুধু ভারতী বলে ডাকলে কোরব না।

কিন্তু অল্প সময়ের সামনে?

ভারতী একটু হাসিয়া কহিল, হলই বা অল্প সকলের সামনে। কিন্তু চুপ করে একটু ঘুমোন দিকি,—আমার ডের কাজ আছে।

অপূর্ব বলিল, ঘুমোতে আমার ভয় করে আপনি পাছে ফাঁকি দিয়ে চলে যান।

কিন্তু জেগে থাকলেও যদি যাই, আপনি আটকাবেন কি কোরে?

অপূর্ব চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। ভারতী কহিল, আমাদের

শ্বেচ্ছসমাজে কি সুনাম দুর্নাম বলে জিনিস নেই? আমাকে কি তার ভয় করে চলতে হয় না?

∴ অপূর্বের বুদ্ধি ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলনা, প্রত্যুত্তরে সে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসিল। কহিল, আমার মা এখানে নেই, আমি রোগে পড়ে গেলে তখন আপনি কি করবেন? তখন ত আপনাকেই থাকতে হবে!

∴ ভারতী কহিল, আমাকেই থাকতে হবে? আপনার বন্ধু তলওয়ারকর বাবুদের খবর দিলে হবেনা?

অপূর্ব সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, তা কিছুতেই হবে না। হয় আমার মা, না হয় আপনি,—একজনকে দেখতে না পেলে আমি কখনো বাঁচবনা। কাল যদি আমার বসন্ত হয়, এ কথা যেন আপনি কিছুতে ভুলে যাবেন না। তাহার অনুরোধের শেষ দিকটা কি যে একরকম শুনাইল, ভারতী হঠাৎ আপনাকে যেন বিগ্ৰহ হইয়া গেল। বিছানার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া সে অপূর্বের গায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—না না, ভুলবনা, ভুলবনা! এ কি কখনো আমি ভুলতে পারি? কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইল। জোর করিয়া একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু ভাল হয়েও ত বিপদ কম ঘটবেনা অপূর্ববাবু! ঘটা করে আবার ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু ভয় নেই, তার দরকার হবেনা। আচ্ছা, চুপ করে একটু ঘুমোন; বাস্তবিক, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

কি কাজ?

∴ ভারতী কহিল, কি কাজ? খাওয়া ত দূরে থাক, সারাদিন স্নান পর্যন্ত করবার সময় পাইনি।

∴ কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় স্নান করলে অস্থখ করবে না?

ভারতী বলিল, করতেও পারে, অসম্ভব নয়। কিন্তু স্বামীর ঘরে যে কাণ্ড করে রেখেছেন তা' পরিস্কার করার পরে না নেয়ে কি কারু উপায় আছে নাকি ? তারপরে দুটো খেতেও হবে ত ?

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, কিন্তু সে সব আমি সাফ করে ফেল্‌বো,—আপনি যাবেন না। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেছিল। ভারতী রাগ করিয়া কহিল, আর বাহাদুরির দরকার নেই, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। কিন্তু এত বড় ঠুনকো জিনিসটুকু যে মা কোন্‌ প্রাণে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন আমি তাই শুধু ভাবিণ সত্যি বল্‌চি, উঠবেন না যেন। তিনি নেই,—কিন্তু এখানে আমার কথা না শুন্‌লে ভারি অশ্রয় হবে বলে দিচ্ছি। এই বলিয়া সে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে শাসনের হুকুম জারি করিয়া দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

উদ্বিগ্ন, শ্রান্ত ও একান্ত নিজ্জীবের ছায় অপূর্ব কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানিতেও পারে নাই, তাহার ঘুম ভাঙিল ভারতীর ডাকে। চোখ মুছিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সম্মুখের ঘড়িতে চাহিয়া দেখিল রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে। ভারতী পাশে দাঁড়াইয়া : অপূর্বের প্রথম দৃষ্টি পড়িল তাহার চুলের আরতন ও দীর্ঘতার প্রতি। সন্তান-সিক্ত বিপুল কেশভার ভিজিয়া যেমন নিবিড় কালো হইয়াছে, তেমনি ঝুলিয়া প্রায় মাটিতে পড়িয়াছে। শিশু সাবানের গন্ধে ঘরের সমস্ত রুদ্ধ বায়ু হঠাৎ যেন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। পরণে একখানি কালপাড়ের সূতার সাড়ী,—গায়ে জামা না থাকায় বাহুর অনেকখানি দেখা যাইতেছে ;—ভারতীর এ যেন আর এক নূতন মুক্তি, অপূর্ব পূর্বে কখনো দেখে নাই। তাহার মুখ দিয়া প্রথমেই বাহির হইল, এত ভিতর চুল শুকোবে কি করে ?

ভারতী কহিল, শুকোবে না। কিন্তু সে জন্তে ভাবতে হবে না, আপনি আসুন দিকি আমার সঙ্গে।

তেওয়ারী কেমন আছে ?

ভাল আছে। অন্ততঃ, আজ রাত্রির মত আপনাকে ভাবতে হবে না। আস্থন।

তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্নানের বরে আসিয়া দেখিল ছোট একটি টুকরিতে কতকগুলি ফল-মূল, একটা বঁটি, একটা খালা, একটা গেলাস— ভারতী দেখাইয়া কহিল, এর বেশি করা ত চলবে না। কলের জলে সমস্ত ধুয়ে ফেলুন,—বঁটি, খালা, গেলাস সব। গেলাসে করে জল নিন, নিয়ে গু-ঘরে আস্থন, আমি আসন পেতে রেখেছি।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এ সকল আপনি কখন আনলেন ?

ভারতী বলিল, আপনি ঘুমোলে। কাছেই একটা ফলের দোকান আছে, দূরে যেতে হয়নি। আর টুকরিটাই আপনাদেরই। এই বলিয়া সে অত্বর চলিয়া গেল, শুধু সতর্ক করিয়া দিয়া গেল, বঁটি দুইতে গিয়া যেন হাত না কাটে।

খানিক পরে আসনে বসিয়া অপূর্ব ফল কাটিতেছিল, এবং ভারতী অদূরে বসিয়া হাসিতেছিল। অপূর্ব কহিল, আপনি হাসুন ক্ষতি নেই। পুরুষ মানুষে বঁটিতে কাটতে পারে না সবাই জানে। কিন্তু আপনি আনার খাবার জগ্গে যে যত্ন করেছেন সে জগ্গে আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। মা ছাড়া এমন আর কেউ করতেন না।

তাহার শেষ কথাটা ভারতী কানেই তুলিল না। আগের কথাই উত্তরে কহিল, হাসি কি সাথে অপূর্ববাবু! পুরুষ মানুষে বঁটিতে কাটতে পারে না সবাই জানে সত্যি, কিন্তু, তাই বলে এমনটি কি সবাই জানে ? তেওয়ারী ভাল হয়ে গেলে মাকে আমি নিশ্চয় চিঠি লিখে দেব, হয় তিনি আস্থন, না হয় ছেলেকে তাঁর ফিরিয়ে নিয়ে যান। এ মানুষকে বাইরে ছেড়ে রাখা চলবে না।

অপূর্ব কহিল, মা তাঁর ছেলেকে ভাল করেই জানেন। কিন্তু, দেখুন,

আমি না হয়ে আমার দাদাদের কেউ হলে আপনার এত কথা আজ চলত না। আপনাকে দিয়েই তাঁরা সব কাজ করিয়ে নিতেন।

ভারতী বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব বলিল, দাদারা ছোঁনা, খান্না এমনি জিনিসই নেই। মুগি এবং হোটেলের ডিনার না হ'লে ত তাঁদের খাওয়াই হয় না।

ভারতী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বলেন কি ?

অপূর্ব কহিল, ঠিক তাই। বাবা ত অর্দ্ধেক ক্রীশ্চান ছিলেন বল্লেই হয়। মাকে কি এই নিয়ে কম দুঃখ পেতে হয়েছে !

ভারতী উৎসাহ হইয়া কহিল, সত্যি নাকি ? কিন্তু মা বুঝি ভয়ানক হিন্দু ?

অপূর্ব বলিল, ভয়ানক আর কি, হিন্দু-ঘরের মেয়ের যথার্থ বা' হওয়া উচিত, তাই। মায়ের কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ এবং ত্রিধ্ব হইয়া উঠিল, বলিল, বাড়ীতে দুটি বউ, তবু মাকে আমার নিজে রেঁধে খেতে হয়। কিন্তু এমনি মা যে কথখনো কাক গুপার জোর করেননা, কথখনো কাউকে এর জগ্গে অহুযোগ করেন না। বলেন, আমিও ত নিজের আচার-বিচার ত্যাগ করে আমার স্বামীর মতে মত দিতে পারিনি, এখন ওরাও যদি আমার মতে মত দিতে না পারে ত নালিশ করা উচিত নয়। আমার বুদ্ধি এবং আমার সংস্কার মেনেই যে বউব্যাটারদের চলতে হবে তার কি মানে আছে ?

ভারতী ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া কহিল, মা সেকেলে মালুষ, কিন্তু দৈব্য ত খুব বেশি।

অপূর্ব উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, দৈব্য ? মায়ের দৈব্যের কি দীমা আছে নাহি ? আপনি তাঁকে দেখেন নি, কিন্তু দেখলে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন বলে দিচ্ছি।

ভারতী প্রসন্ন মৌন মুখে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, অপূর্ব ফলের

খোসা ছাড়ানো বন্ধ রাখিয়া বলিতে লাগিল, ধবুলে, সমস্ত জীবনই মা আমার দুঃখ পেয়ে আসছেন, এবং সমস্ত জীবনই স্বামী পুত্রদের স্বেচ্ছাচার বাঁড়ীর মধ্যে নিঃশব্দে সহ করে আসছেন। তাঁর একটি মাত্র ভরসা আমি। অসুখে-বিসুখে কেবল আমার হাতেই দুটো হবিষ্য সিদ্ধ তিনি মুখে দেন।

ভারতী কহিল, এখন ত তাঁর কষ্ট হতে পারে।

অপূর্ব বলিল, পারেই ত। হয়ত হচ্ছেও। তাইত আমাকে তিনি প্রথমে ছেড়ে দিতে চাননি। কিন্তু, আমিও ত চিরকাল ঘরে বসে থাকতে পারিনে! কেবল তাঁর একটি আশা আমার বউ এলে আর তাঁকে রেখে থেতে হবে না।

ভারতী একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাঁর সেই আশাটি কেন পূর্ণ করেই এলেন না? সেই ত উচিত ছিল!

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ মায়া দিয়া বলিয়া উঠিল ছিলই ত। মেয়ে নিজে পছন্দ করে মা যখন সমস্ত ঠিক করছিলেন তখনি আমাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল, সময় হলনা। কিন্তু বলে এলাম, মা, যখনি চিঠি লিখবে তখনি ফিরে এসে তোমার আদেশ পালন কোরব।

ভারতী বলিল, তাই ত উচিত।

অপূর্ব মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া কহিল, উচিত নয়? বার-ব্রত করবে, বিচার-আচার জানবে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে হবে,—মাকে কখনো দুঃখ দেবেনা,—সেই ত আমি চাই। কাজ কি আমার গান-বাজনা-জানা কলেজে-পড়া বিদুষী মেয়ে?

ভারতী বলিল, দরকার কি!

অপূর্ব নিজেই যে একদিন ইহার বিরোধী ছিল এবং বেদিদির স্বপক্ষে লড়াই করিয়া মাকে রাগ করিয়া বলিয়াছিল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘর হইতে বাহ্যিক একটা মেয়ে ধরিয়া আনিয়া ল্যাঠা চুকাইয়া দিতে,

সে-কথা আজ সে সম্পূর্ণ বিশ্বৃত হইল। বলিতে লাগিল, দেখুন আপনি আমাদের জাতও নয়, সমাজেরও নয়, জলটুকু পর্য্যন্ত নেওয়া যায়না, ছোঁয়া-ছুঁয়ি হলে কাপড়খানা অবধি ছেড়ে ফেলতে হয় এত তক্কা, তবু আপনি যা বোঝেন আমার দাদারা কিয়া বৌদিদিরা তা' বুঝতে চাননা। যার যা ধর্ম তাইত তার মেনে চলা চাই? একবাড়ী লোকের মধ্যে থেকেও যে মা আমার একলা, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য কি আর আছে? তাই ভগবানের কাছে আমি শুধু এই প্রার্থনা করি, আমার কেশন আচরণে আমার মা যেন না কোনদিন ব্যথা পান। বলিতে বলিতে তাহার গলা ভারি হইয়া অশ্রুভারে দুই চক্ষু টল্‌টল্‌ করিতে লাগিল।

এই সময়ে ঘুমন্ত তেওয়ারী কি একটা শব্দ করিতে ভারতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল। অপূর্ব হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া পুনরায় ফল বানাইতে প্রবৃত্ত হইল। মাকে সে অতিশয় ভালবাসিত, এবং বাড়ীতে থাকিতে সেই মাকে খুসি রাখিতে সে মাথার টিকি হইতে একাদশীর দিনে ভাতের বদলে লুচি খাওয়া অবধি সবই পালন করিয়া চলিত। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ সন্তানের আচারভ্রষ্টতাকে সে নিন্দাই করিত, কিন্তু প্রবাসে আসিয়া আচার-বিচারের প্রতি তাহার একুণ গুণাগু অহুরাগ বোধ হয় তাহার জননীও সন্দেহ করিতে পারিতেন না। আসল কথা এই যে, আজ তাহার দেহ-মন ভয়ে ও ভাবনায় নিরতিশয় বিকল হইয়াছিল, মাকে কাছে পাইবার একটা অন্ধ আকুলতায় ভিতরে ভিতরে তাহার কুজ্বটিকার সৃষ্টি করিতেছিল, সেখানে সমস্ত ভাবই যে পরিমাণ হারাইয়া বিকৃত আতিশয্যে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছিল এ খবর অন্তর্যামীর অগোচর रहিল না, কিন্তু ভারতীর বুকের মধ্যেটা অপমানের বেদনায় একেবারে টন্‌টন্‌ করিতে লাগিল।

সে খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অপূর্ব কোনমতে ফল কাটা শেষ করিয়া চূপ করিয়া বসিয়া আছে। কহিল, বসে আছেন, খান্নি ?

অপূর্ব বলিল, না, আপনার জগ্গ বসে আছি।

কিসের জগ্গ ?

আপনি খাবেন না ?

না। দরকার হলে আমার আলাদা আছে।

অপূর্ব ফলের খালাটা হাত দিয়া একটুখানি ঠেলিয়া দিয়া বলিল, বাঃ—তা' কি কখন হয় ? আপনি সারাদিন খান্নি, আর—

তাহার কথাটা তখনো শেষ হয় নাই, একটা অত্যন্ত শুক চাপা কণ্ঠস্বরে জবাব আসিল, আঃ—আপনি ভারি জ্বালাতন করেন। ক্ষিদে থাকে খান, না হয় জানালা দিয়ে ফেলে দিন। এই বলিয়া সে মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল। বস্তুতঃ, মুহূর্ত মাত্রই তাহার মুখের চেহারা অপূর্ব দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তকালই তাহার বুকে মরণকাল পর্য্যন্ত ছাপ মারিয়া দিল। এ মুখ সে আর তুলিলনা। সেই আসার দিন হইতে অনেকবার দেখা হইয়াছে ; বিবাদে, গোল্লাজে, শত্রুতায়, বন্ধুত্বে, সম্পদে ও বিপদে কতবারই ত এই মেয়েটিকে সে দেখিয়াছে, কিন্তু, সে-দেখার সহিত এ-দেখার সাদৃশ্য নাই। এ যেন আর কেহ।

ভারতী চলিয়া গেল, ফলের পাত্র তেমনি পড়িয়া রহিল এবং তেমনি নির্বাক নিম্পন্দ কাঠের মত অপূর্ব বসিয়া রহিল। কিসে যে কি হইল সে যেন তাহার উপলব্ধির অতীত।

ঘণ্টাখানেক পরে সে এ-ঘরে আসিয়া দেখিল তেওয়ারীর শিয়রের কাছে একটা মাড়ুর পাতিয়া ভারতী বাহুতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে।

সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া তাহার

খাটে শুইয়া পড়িল, এবং শ্রান্ত চক্ষু ঘুমে মুদিত হইতে তিলান্বিত বিলম্ব হইল না। এই ঘুম যখন ভাঙিল তখন ভোর হইয়াছে।

ভারতী কহিল, আমি চল্লম।

অপূর্ব ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু ভাল করিয়া চেতনা হইবার পূর্বেই দেখিল, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেছে।

(১০)

শেষোক্ত ঘটনার পরে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তেওয়ারী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু গায়ে এখনও জোর পায় নাই। যে লোকটি সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ গিয়াছিল সেই রক্ষিতেছে। তেওয়ারীকে বাঁচাইবার জন্য প্রায় আফিস তক্ত সকলেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, রামদাস নিজে কতদিন ত বাসায় পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই। সহরের একজন বড় ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছেন, তাহারই সুপারিশে তাহাকে বসন্ত-হাসপাতালে লইয়া যায় নাই। এই ব্রহ্মদেশটা তেওয়ারীর কোনদিনই ভাল লাগে নাই, অপূর্ব তাহাকে ছুটি দিয়াছে, স্থির হইয়াছে আর একটু সারিলেই সে বাড়ী চলিয়া যাইবে! আগামী সপ্তাহে বোধ হয় তাহা অসম্ভব হইবে না, তেওয়ারী নিজে এইরূপ আশা করে। ভারতী সেই যে গিয়াছে, কোনদিন খবর লইতেও আসে নাই। অথচ, এত বড় একটা আশ্চর্য্য ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত হইত না। ইহাতে তেওয়ারীর বিশেষ অপরাধ ছিল না; বরঞ্চ সে যেন ভয়ে ভয়েই থাকিত পাছে কেহ তাহার নাম করিয়া ফেলে। ভারতী শত্রু-পক্ষীয়া, এখানে আসে অবধি তাহাদের অশেষ প্রকারে দুঃখ দিয়াছে, মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে অপূর্বকে জেল খটাইবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছে; মনিষের অবর্ত্তমানে তাহাকেই ঘরে ডাকিয়া আনার কথায় সে লজ্জা ও সঙ্কোচ দুই অনুভব করিত। কিন্তু সে কবে এবং কি ভাবে চলিয়া গেছে তেওয়ারী জানে

না। জানিবার জ্ঞান ছট্‌ফট্‌ করিত,—তাহার উদ্বেগ ও আশঙ্কার অবধি ছিল না, কিন্তু কি করিয়া যে জানা যায় কিছুতেই খুঁজিয়া পাইত না। কখনো ভাবিত ভারতী চালাক মেয়ে, অপূর্বর আসার সংবাদ পাইয়া সে নিজেই লুকাইয়া পলাইয়াছে; কখনো ভাবিত অপূর্বর আসিয়া পড়িয়া হয়ত তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই দু'য়ের যাহাই কেননা ঘটিয়া থাকুক, ভারতী আপনি ইচ্ছা করিয়া যে এ বাটীতে আর তাহাকে দেখিতে আসিবে না সে বিষয়ে তেওয়ারী নিশ্চিন্ত ছিল। অপূর্বর নিজে কিছুই বলে না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তেওয়ারীর এই ভয়টাই সবচেয়ে বেশি করিত পাছে তাহারই জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। বগড়া বিবাদের কথা চুলায় যা'ক, সে যে তাহার হাতে জল খাইয়াছে, তাহার রাঁধা সাগু বালি খাইয়াছে,—হয়ত এমন ভয়ানক জ্ঞাত গিয়াছে যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত নাই। তেওয়ারী স্থির করিয়া রাখিয়াছিল কোনমতে এখান হইতে কলিকাতায় গিয়া সে সোজা বাড়ী চলিয়া যাইবে। সেখানে গঙ্গান্নান করিয়া, গোপনে গোবর প্রভৃতি খাইয়া, কোন একটা ছল-ছুতায় ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া দেহটাকে কাজ-চলা-গোছের শুদ্ধ করিয়া লইবে। কিন্তু ঘাঁটা-ঘাঁটি করিয়া কথাটাকে একবার মায়ের কানে তুলিয়া দিলে যে কিসে কি দাঁড়াইবে তাহার কিছুই বলা যায় না। হালদার বাড়ীর চাকরি ত ঘুচিবেই, এমন কি তাহাদের গ্রামের সমাজ পর্য্যন্ত গিয়া টান্ ধরাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু ইহাই তেওয়ারীর সবটুকু ছিল না। এই স্বার্থ ও ভয়ের দিক-ছাড়া তাহার অন্তরের আর একটা দিক ছিল তাহা যেমন মধুর, তেমনি বেদনায় ভরা। অপূর্বর আফিসে চলিয়া গেলে দুপুরবেলায় সে প্রত্যহ একখানি বেতের মোড়া লইয়া বারান্দায় আসিয়া বসিত। ঊর্ধ্বল দেহটিকে দেওয়ালের গায়ে এলাইয়া দিয়া গলির যে অংশটি গিয়া

বড় রাস্তায় মিলিয়াছে সেইখানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। এই পথে ভারতীর কোনদিন প্রয়োজন হইবে না, ওই মোড় অতিক্রম করিবার বেলা, অভ্যাস বশতঃও একবার এদিকে সে চাহিবে না এমন হইতেই পারে না। অপূর্ব ভাষায় চলিয়া গেলে এই মেয়েটির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। যেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ তাহার মা মরিয়া যায়, তখনও তেওয়ারীর খাওয়া হয় নাই, মেয়েটা কাঁদিয়া আসিয়া তাহার রুদ্ধ দ্বারে কণ্ঠঘাত করে। দিন দুই পূর্বে জোসেফ সাহেব মরিয়াছে, তাহার সে ভয় ছিল না, আসিয়া কবান্ট খুলিতেই ভারতী ঘরে ঢুকিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া সে কি কান্না! কে বলিবে সে স্নেহ, কে বলিবে সে ক্রীড়ার মেয়ে! তেওয়ারীর রাঁধা ভাত হাড়িতেই রহিল, সারাদিন চিঠি লইয়া তাহাকে কোথায় না সেদিন ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল! পরদিন কফিন লইয়া যাইবার বেলা এই বারান্দায় দাঁড়াইয়া চোখের জল যেন তাহার আর থামিতেই চাহে না। এই সময় হইতেই ভারতীকে সে কখনো মা, কখনো বা দিদি বলিতে শুরু করিয়াছিল, এবং জোর করিয়া তাহাকে সে চার পাঁচদিন রাঁধিতে দেয় নাই, নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিল। তারপরে যেদিন ভারতী জিনিসপত্র লইয়া স্থানান্তরে উঠিয়া গেল, সেদিন সন্ধ্যাবেলাটা তাহার যেমন আর কাটিবে না এমনি মনে হইয়াছিল। তাহার বসন্ত রোগে ভারতী কতখানি কি করিয়াছিল তাহা সে ভাল জানিতও না, ভাবিতও না। মনে হইলেই মনে হইত জাত যাইবার কথা। কিন্তু এই সঙ্গেই আর একটা কথা সে সর্বদাই ভাবিবার চেষ্টা করিত। সকালবেলা স্নান করিয়া মস্ত ভিজা চুলের রাশি পিঠে মেলিয়া দিয়া সে একবার করিয়া তেওয়ারীর তত্ত্ব লইতে আসিত। রান্নাঘরেও ঢুকিত না, কোন কিছু স্পর্শও করিত না, চৌকাঠের বাহিরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিত, আজ কি-কি রাঁধলে দেখি তেওয়ারী।

দিদি, একটা আসন পেতে দিই।

না। আবার ত কাচ্তে হবে!

তেওয়ারী কহিত, বাঃ, আসন কি কখনো ছোঁয়া যায় নাকি?

ভারতী বলিত, যায় বই কি। তোমার বাবু ত ভাবেন আমি খাকার জন্তে সমস্ত বাড়ীটাই ছোঁয়া গেছে। নিজের হ'লে বোধ হয় আগুন ধরিয়ে একে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিতেন। ঠিক না তেওয়ারী?

তেওয়ারী হাসিয়া কহিত, তোমার এক কথা দিদি। 'তুমি নিজে দেখতে পারোনা বলে সবাইকে তাই ভাবো। কিন্তু আমার বাবুকে যদি একবার ভাল করে জানতে ত তুমিও বলতে এমন মানুষ সংসারে নেই।

ভারতী বলিত, নেই তা আমিও ত বলি। নইলে যে চুরি করা আঁচকালে, তাকেই গেলেন চোর বলে ধরিয়ে দিতে।

এই ব্যাপারে নিজের অপরাধ স্বরণ করিয়া তেওয়ারী মৰ্ম্মাহত হইয়া পড়িত। কথাটাকে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিত, কিন্তু তুমিও ত কিছু কম করনি! সমস্ত মিথ্যে জেনেও ত বাবুর কুড়ি টাকা দণ্ড করালে, দিদি।

ভারতী অপ্রতিভ হইয়া বলিত, তেমনি দণ্ড ত নিজেই নিলাম তেওয়ারী, তোমার বাবুকে ত আর দিতে হলনা।

দিতে হলনা কি রকম? স্বচক্ষে দেখলাম যে ছ'খানা নোট দিয়ে তবে তিনি বার হলেন।

আমি যে স্বচক্ষে দেখলাম তেওয়ারী, তুমি ঘরে ঢুকেই ছ'খানা নোট কুড়িয়ে পেয়ে তা বাবুর হাতে তুলে দিলে।

তেওয়ারীর হৃৎকের খুস্তি হাতেই থাকিত,—ওঃ! তাই বটে।

কিন্তু ভাজাটী যে পুড়ে উঠল তেওয়ারী, ওবে আর মুখে দেওয়া চল্বেনা।

তেওয়ারী কড়াটা নামাইয়া লইয়া কহিত, বাবুকে কিন্তু একথা আমি বলে দেব দিদি।

ভারতী সহাস্ত্রে জবাব দিত, দিলেই বা। তোমার বাবুকে কি আমি ভয় করি নাকি।

কিন্তু এতবড় আশ্চর্য্য কথাটা চোঁটবাবুকে জানাইবার তেওয়ারীর আর সুযোগ মিলিল না। কবে এবং কেমন করিয়া যে মিলিবে ইহাও সে খুঁজিয়া পাইত না। একদিন আলস্যবশতঃ সে বাসি হলুদ দিয়া তরকারী রান্না দিতে গিয়া ভারতীর কাছে বকুনি খাইয়াছিল। আর একদিন স্নান না করিয়াই রান্না দিয়াছিল বলিয়া ভারতী তাহার হাতে খায় নাই। তেওয়ারী রাগ করিয়া বলিয়াছিল, তোমরা যে ক্রীষ্টান দিদি, তোমাদেরও এত বাচ-বিচার? এ যে দেখি আমাদের মা ঠাকুরুণকেও ছাড়িয়ে গেলে!

ভারতী শুধু হাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল, জবাব দেয় নাই। বস্তুতঃ রান্নার ব্যাপার এক মা-ঠাকুরাণী ছাড়া তাহার শুচিতায় কেহ প্রশ্ন করিতেও পারে ইহাতে সে মনে মনে আহত হইয়াছিল, কিন্তু আচার-বিচার লইয়া এই ম্লেচ্ছ মেয়েটার কাছেই সে সতর্ক না হইয়াও পারে নাই। তখন এ সকল তাহার ভাল লাগে নাই, যাহা ভালও লাগিয়াছে তাহারও তেমন করিয়া মর্যাদা উপলব্ধি করে নাই, অথচ, এই সব চিন্তাই যেন এখন তাহাকে বিভোর করিয়া দিত। বর্ষায় সে আর ফিরিবেনা। যাইবার পূর্বে দেখা হইবার আর আশা নাই, দেখা করিবার হেতু নাই, যত কিছু সে জানে বলিবার লোক নাই,—দিনের পর দিন একই পথে প্রান্তে নিফল দৃষ্টি পাতিয়া একাকী চূপ করিয়া বসিয়া তাহার বুকের মধ্যেটা যেন আঁচড়াইতে থাকিত।

সেদিন আকস্মিক হইতে ফিরিয়া অপূর্ব্ব হঠাৎ জিজ্ঞাসী করিল, ভারতীর বাসাটা ঠিক কোন জায়গায় রে তেওয়ারী?

তেওয়ারী সংশয়ভিত্তিকপক্ষে জবাব দিল, আমি কি গিয়ে দেখে এসেছি নাকি ?

• বাবার সময় তোকে বলে নি ?

আমাকে বলতে যাবে কিসের জ্ঞে !

অপূর্ব কহিল, আমাকে বলেছিল ষটে, কিন্তু জায়গায়টা ঠিক মনে নেই। কাল একবার খুঁজে দেখতে হবে।

তেওয়ারীর মনটা ছলিতে লাগিল, হয়ত কি আবার একটা ফ্যাসাদ জুটিয়াছে, কিন্তু এ সাহস তাহার হইলনা যে কারণ জিজ্ঞাসা করে। অপূর্ব নিজেই বলিল। কহিল, সে চুরির জিনিসগুলো এখন পুলিশের লোকে দিতে চায়, কিন্তু ভারতীর একটা সহি চাই।

তেওয়ারী আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল, অপূর্ব বলিতে লাগিল, সেদিন এই কথাই ত জানাতে এসে তোর অবস্থা দেখে আর ফিরতে পারলেন না। তিনি না দেখলে ত তুই কবে মরে ভূত হয়ে যেতিস্ তেওয়ারী, আমার সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা হোতো না।

তেওয়ারী হাঁ, না কিছুই কহিল না, শেষ কথাটা শুনিবার জ্ঞ নিঃশব্দে কাঠের মত বসিয়া রহিল। অপূর্ব বলিল, এসে দেখি অন্ধকার ঘরে তুই আর তিনি। দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, কি যে ঘটবে তার ঠিক নেই কোথায় থাওয়া কোথায় শোওয়া, দুদিন আগে নিজের বাপ-মা মরে গেছে,—কিন্তু কি শক্ত মেয়েমানুষ, তেওয়ারী, কিছুতে ভ্রক্ষেপই নেই !

তেওয়ারী আর থাকিতে না পারিয়া বলিল, কবে গেলেন তিনি ?

অপূর্ব কহিল, আমার আসার পরদিনই। ভোর না হতেই

• ‘চললুম’ বলে যেন একেবারে উবে গেলেন।

রাগ করে চলে গেলেন নাকি ?

রাগ কোন্সে ? অপূর্ব একটু ভাবিয়া কহিল, কি জানি, হতেও

পারে। তাঁকে বোঝাই ত যায় না,—নইলে তোর উপর এত যত্ন, একবার খবর নিতেও ত এলেন না তুই ভাল হলি কিনা!

এই কথা তেওয়ারীর ভাল লাগিল না। বলিল, তাঁর নিজেরই-
হয়ত অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে।

নিজের অসুখ-বিসুখ! অপূর্ণ চমকিয়া গেল। তাহার সম্বন্ধে অনেকদিন অনেক কথাই মনে হইয়াছে, কিন্তু কোনদিন এ আশঙ্কা মনেও উদয় হয় নাই। যাবার সময়ে সে হয়ত রাগ করিয়াই গিয়াছে, এবং এই রাগ করা লইয়াই মন তাহার যত কিছু কারণ খুঁজিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু অল্প সম্ভাবনাও যে থাকিতে পারে এদিক পানে ক্ষুদ্র চিন্তা তাহার দৃষ্টিপাতই করে নাই। হঠাৎ অসুখের কথায় এ লইয়া যত আলোচনা সে রাত্রে হইয়াছিল সমস্ত এক নিমিষে মনে পড়িয়া অপূর্ণ বসন্ত ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারিল না। তাহার নূতন বাসায় দেখিবার কেহ নাই, হয়ত হাসপাতালে লইয়া গেছে, হয়ত এতদিনে বাঁচিয়াও নাই, মনে মনে সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। একটা চেয়ারে বসিয়া আফিসের কলার নেকটাই ওয়েষ্টকোট খুলিতে খুলিতে তাহাদের আলাপ সুরু হইয়াছিল, হাতের কাজ তাহার সেইখানেই বন্ধ হইয়া গেল, মুখে তাহার শব্দ রহিল না, সেই চেয়ারে মাটির পুতুলের মত বসিয়া এই এক প্রকারের অপরিচিত, অস্পষ্ট অনুভূতি যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল যে সংসারে আর তাহার কোন কাজ করিবার নাই।

কিছুক্ষণ অববি কেহই কথা কহিল না। এমনি একভাবে মিটি কুড়ি পচিশ কাটিয়া গেলেও যখন অপূর্ণ নড়িবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করি না, তখন তেওয়ারী মনে মনে শুধু আশ্চর্য্য নয় উদ্বিগ্ন হইল। আশ্বে আশ্বে কহিল, ছোটবাবু, বাড়ীওয়ালার লোক এসেছিল; যদি তেওয়ারীর ঘরটাই নেওয়া হয়, ত, এই মাসের মধ্যেই বদলানো চাই বলে গেল। আমার ভাবনা হয় পাছে কেউ আবার এসে পড়ে!

অপূর্ব মুখ তুলিয়া বলিল, কে আর আসচে।

তেওয়ারী কহিল, আজ মায়ের একখানা পোষ্টকার্ড পেয়েচি।
দরওয়ানকে দিয়ে তিনি লিখিয়েছেন।

কি লিখেছেন?

আমি ভাল হয়েচি বলে অনেক আহ্লাদ করেছেন। দরওয়ানের
ভাই ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে, তার হাতে বিশ্বেশ্বরের নামে পাঁচ টাকার
পুজো পাঠিয়েছেন।

অপূর্ব কহিল, ভালই ত। মা তোকে ছেলের মত ভালবাসেন।

তেওয়ারী শঙ্কায় বিগলিত হইয়া কহিল, ছেলের বেশি। আমি
চলে যাবো, মার ইচ্ছে ছুটি নিয়ে আমরা দুজনেই যাই। চারিদিকে
অসুখ-বিসুখ—

অপূর্ব বলিল, অসুখ-বিসুখ কোথায় নেই? কলকাতায় হয় না?
তুই বুঝি ভয় দেখিয়ে নানা কথা লিখেছিলি?

আজ্ঞে না। তেওয়ারী ভাবিয়া রাখিয়াছিল আসল কথাটা সে
রাত্রে আহাঙ্গাদির পরে ধীরে স্তম্বে পাড়িবে। কিন্তু আর অপেক্ষা করা
চলিল না। কহিল, কালীবাবু একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছেন।
বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছে মাঝের চোত্ মাসটা বাদ দিয়ে বোশেখের
প্রথমেই শুভ কাজটা হয়ে যায়।

কালীবাবু অতিশয় নির্দ্বাবান ব্রাহ্মণ, তাঁহার পরিবারে আচার-
পরায়ণতার খ্যাতি প্রসিদ্ধ। তাঁহারই কনিষ্ঠ কন্যাকে মাতাঠাকুরাণী
পছন্দ করিয়াছেন এ আভাস তাঁহার কয়েকখানা পত্রেই ছিল।
তেওয়ারীর কথাটা অপূর্বর ভাল লাগিল না। কহিল, এত তাড়াতাড়ি
কিসের? কালীবাবুর গৌরীদানের সবুর না সম, তিনিত আর কোথাও
চেষ্টা করতে পারেন।

তেওয়ারী একটু হাসিবর চেষ্টা করিয়া কহিল, তাড়াতাড়ি

তার কি মা'র কি কোরে জান্বো ছোটবাবু? লোকে হয়ত তাঁকে ভয় দেখায় বর্ষা দেশটা তেমন ভাল নয়,—এখানে ছেলেরা বিগড়ে যায়।

অপূর্ব খামোকা ভয়ানক জলিয়া উঠিয়া কহিল, ছাখ্ তেওয়ারী তুই আমার ওপর অত পণ্ডিত করিস্নে বলে দিচ্ছি। মাকে তুই রোজ রোজ অত চিঠি লিখিস্ কিসের? আমি ছেলেমানুষ নই!

এই অকারণ-ক্রোধে তেওয়ারী প্রথমে বিস্মিত হইল, বিশেষতঃ রোগ হইতে উঠিয়া নানা কারণে তাহারও মেজাজ খুব ভাল ছিল না, সেও রাগিয়া বলিল, আস্বার সময়ে মাকে একথা বলে আস্তে পারেন নি? তা'হলে ত বেঁচে যেতাম, জাত-জন্ম খোয়াতে জাহাজে চড়তে হতো না।

অপূর্ব চোখ রাঙাইয়া চট করিয়া কলার ও নেকটাই তুলিয়া লইয়া গলায় পরিতে লাগিল। তেওয়ারী বহুকাল হইতেই ইহার অর্থ জানিত। কহিল, তা'হলে জলটল্ কিছু খাবেন না?

অপূর্ব তাহার প্রশ্নের জবাবে আলনা হইতে কোট লইয়া তাহাতে হাত গলাইতে গলাইতে ছুম্ ছুম্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তেওয়ারী গরম হইয়া বলিল, কাল রবিবারে চাটগাঁ দিয়ে একটা জাহাজ যায়—আমি তাতেই বাড়ী যাব বলে রাখলাম। অপূর্ব সিঁড়ি হইতে কহিল, না যাস্ তো তোর দিক্বি রইল!—বলিয়া নীচে চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে প্রভু ও ভৃত্যে কিসের জ্ঞা যে এ . . . একটা রাগারাগি হইয়া গেল অনভিজ্ঞ কেহ উপস্থিত থাকিলে সে একেবারে আশ্চর্য হইয়া যাইত, সে ভাবিয়াও পাইত না যে, এম্নি অর্থহীন আঘাতের পথ দিয়াই মানুষের ব্যথিত বিক্ষুব্ধ চিত্ত চিরদিন আপনাকে সহজের মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

অপূর্বর যাইবার জায়গা একমাত্র ছিল তলওয়ারকরের বাটী। এখানে বাঙালীর অভাব নাই, কিন্তু আসিয়া পর্য্যন্ত এমন বাড়-বাপটীর মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়াছে যে কাহারও সহিত পরিচয় করিবার আর ফুরসৎ পায় নাই। বাহির হইয়া আজও*সে রেলওয়ে স্টেশনের দিকেই চলিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল আজ শনিবারে তাহার সস্ত্রীক থিয়েটারে যাইবার কথা। অতএব, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো ব্যতীত এত কিছু করিবার যখন রহিল না এবং কোথায় যাইবে যখন ভাবিতেছে, তখন অকস্মাৎ ভারতীকে মনে পড়িয়া তাহার প্রতি গভীর অকৃতজ্ঞতা আজ তাহাকে তীক্ষ্ণ করিয়া বিদিল। তাহার আহত অপরাধী মন তাহারি কাছে ঘেন জবাব-দিহি করিয়া বারবার বলিতে লাগিল, সে ভালই আছে তাহার কিছুই হয় নাই; নহিলে, এতবড় জীবন-মরণ সমস্যায় একটা খবর পর্য্যন্ত দিত না তাহা হইতেই পারে না, তবুও সে ওই জবাব-দিহির বেশি আর অগ্রসর হইল না। তেলের কারখানার কাছাকাছি কোথাও তাহার নূতন বাসা ইহা সে ভুলে নাই, ইহাই খুঁজিয়া বাহির করিবার কল্পনায় মন তাহার নাচিয়া উঠিল, কিন্তু এমন করিয়া যে-লোক আত্মগোপন করিয়া আছে, এতকাল পরে তাহার তত্ত্ব লইতে ঘাওয়ার লজ্জাও সে সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। হয়ত সে ইহা চাহে না, হয়ত সে তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইবে, তাই চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি সে একশতবার করিয়া বলিতে লাগিল, পুলিশের লোকে তাহার সই চাহে, অতএব কাজের জগুই সে আসিয়াছে; সে কেমন আছে, কোথায় আছে এ সকল অকারণ কৌতূহল তাহার নাই। এতদিন পরে এ অভিযোগ ভারতী কোন মতেই তাহার প্রতি আরোপ করিতে পারিবে না।

এ অঞ্চলে অপূর্ব আর কখনো আসে নাই। পূর্বমুখে প্রশস্ত .

রাস্তা সোজা গিয়াছে, অনেক দূর হাঁটিয়া ডান দিকে নদীর ধারে যে পথ, সেইখানে আসিয়া একজনকে সে জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে সাহেব মেমেরা কোথায় থাকে জানো? লোকটি প্রত্যুত্তরে আশে-পাশের যে সকল ছোট বড় বাড়ীলো দেখাইয়া দিল তাহাদের আকৃতি, অবয়ব ও সাজ-সজ্জা দেখিয়াই অপূর্ব বুঝিল তাহার প্রশ্ন করা ভুল হইয়াছে। সংশোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অনেক বাড়ালীরাও ত থাকে এখানে, কেউ কারিগর, কেউ মিস্ত্রী, তাদের মেয়েছেলেরা—

লোকটি কহিল, ঢের, ঢের। আমিই ত একজন মিস্ত্রী। আমার ভাঁবেই ত পঞ্চাশ জন কারিকর—যা কোরব তাই! ছোট সাহেবকে বলে জবাব পর্য্যন্ত দিতে পারি। কাকে খোঁজেন?

অপূর্ব চিন্তা করিয়া কহিল, দেখো আমি যাকে খুঁজি,—আচ্ছা, যারা বাড়ালী ক্রীস্টান কিম্বা—

লোকটি আশ্চর্য হইয়া বলিল, বোলছেন বাড়ালী,—আবার খুঁটান কি রকম? খুঁটান হলে আবার বাড়ালী থাকে না কি? খুঁটান—খুঁটান। মোচলমান—মোচলমান! বস, এই ত জানি মশায়!

অপূর্ব বলিল, আহা! বাড়লা দেশের লোক ত! বাড়লা ভাষা বলে ত!

সে গরম হইয়া কহিল, ভাষা বললেই হল? যে জাত দিয়ে খুঁটান হয়ে গেল তাতে আর পদার্থ রইল কি মশায়? কোন বাড়ালী তার সঙ্গে আহার-ব্যবহার করুক একবার দেখি ত! ওই যে কোথেকে সব মেয়ে-মাষ্টার এসেচে ছেলেপুলেদের পাড়ায়—বস! তা বলে কে? কি তাদের সঙ্গে থাকে, না বসে?

অপূর্ব কূল দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় থাকেন জানো?

সে কহিল, তা আর জানিনে! এই রাস্তায় সোজা গাড়ের ধারে

গিয়ে জিজ্ঞেসা করবেন নতুন ইস্কুল ঘর কোথায়,—কচি ছেলেটা পর্য্যন্ত দেখিয়ে দেবে। ডাক্তারবাবু থাকেন কি না! মাছুষ ত নয়,—দেবতা! মরা বাঁচাতে পারেন!—এই বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। সেই পথে সোজা আসিয়া অপূর্ব লাল রঙের একখানি কাঠের বাড়ী দেখিতে পাইল। বাড়ীটি দ্বিতল, একেবারে নদীর উপরে। তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক নাই—উপরের খোলা জানালা হইতে আলো আসিতেছে,—কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার জ্ঞান সে সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সন্দেহ রহিল না যে এইখানেই ভারতী থাকে, এবং ওই জানালাহই তাহার দেখা মিলিবে।

মিনিট পনেরো পরে জন দুই তিন লোক বাহির হইয়া তাহাকে দেখিয়া সহসা ঘেন চকিত হইয়া উঠিল। একজন প্রশ্ন করিল, কে? কা'কে চান?

তাহার সন্ধিগত কণ্ঠস্বরে অপূর্ব সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মিস্ জোসেফ বলে কোন স্ত্রীলোক থাকেন এখানে?

সে তৎক্ষণাৎ বলিল, থাকেন বই কি—আসুন।

অপূর্বর ঠিক যাইবার সঙ্কল্প ছিল না, কিন্তু দ্বিধা করিতেই লোকটি কহিল, আপনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন? কিন্তু তিনি ত ঘরেই আছেন,—আসুন। আমরা আপনাকে নিয়ে যাকি, এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

তাহার দ্বারা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল ইহার তাহাকে যাচাই করিয়া লইলে চায়। অতএব, দ্বার হইতে এখন না বলিয়া ফিরিতে চাহিলে সন্দেহ ইহাদের এমনিই বিশী হইয়া উঠিবে যে সে তাহা ভাবিতেই পারিল না। তাই চলুন, বলিয়া সে লোকটির অনুসরণ করিয়া এক মুহূর্ত্ত পরেই এই কাঠের বাড়ীর নীচেকার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারই এক পাশ দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি। ঘরটি হলের মত প্রশস্ত। ছাদ হইতে ঝুলোনো একটা মস্ত আলো, গোটা কয়েক টেবিল

চেয়ার, একটা কালো বোর্ড এবং সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া নানা আকারের ও নানা রঙের মাপ টাঙানো। ইহাই যে নূতন স্কুল-ঘর অপূর্ব তাহা দেখিয়াই চিনিল। তথায় চার পাঁচ জন স্ত্রীলোক ও পুরুষে মিলিয়া বোধ হয় একটা তর্কই করিতেছিল, সহসা একজন অপরিচিত লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চূপ করিল। অপূর্ব একবার মাত্র তাহাদের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া যে তাহাকে আনিয়াছিল তাহারই পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া গেল। ভারতী ঘরেই ছিল, অপূর্বকে দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল, কাছে আসিয়া হাত দরিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ারে বসাইয়া কহিল, এতদিন আমার খোঁজ নেন্নি যে বড় ?

অপূর্ব বলিল, আপনিও ত আমাদের খোঁজ নেন্নি! কিন্তু কথাটা যে জবাব হিসাবে ঠিক হইল না তাহা সে বলিয়াই বুঝিল। ভারতী শুধু একটু হাসিল, কহিল, তেওয়ারী বাড়ী যেতে চাচ্ছে, থাক। না গেলে সে সারবে না।

অপূর্ব কহিল, অর্থাৎ আপনি যে আমাদের খবর নেননা এ অভিযোগ সত্য নয়।

ভারতী পুনশ্চ একটু হাসিয়া কহিল, কাল বিবাহ, কাল কিছু আর হবে না, কিন্তু পরশু বারোটার মধ্যেই কোর্টে গিয়ে টাকা আর জিনিস-গুলো আপনার ফিরিয়ে আনবেন। একটু দেখে শুনে নেবেন, যেন ঠিকায় না।

আপনার কিন্তু একটা সই চাই।

তা' জানি।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, আপনার সঙ্গে তেওয়ারীর বোধ হয় দেখা হয়, না ?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। কিন্তু আপনি যেন গিয়ে তার ওপর মিছে রাগ করবেন না।

অপূর্ব কহিল, মিছে না হোক, সত্যি রাগ করা উচিত। আপনি তার প্রাণ দিয়েছেন এটুকু কৃতজ্ঞতা তার থাকা উচিত ছিল।

ভারতী বলিল, নিশ্চয়ই আছে। নইলে, সে তো আমাকে জেলে পাঠাবার একবার অন্ততঃ চেষ্টা করেও দেখতো।

অপূর্ব এ ইঙ্গিত বুঝিল। আনতমুগ্ধে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনি আমার উপর ভয়ানক রাগ করে আছেন।

ভারতী বলিল, কথখনো না। সারাদিন ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পড়িয়ে ঘরে ফিরে আবার সমিতির সেক্রেটারির কাজে অসংখ্য চিঠিপত্র লিখে, বিছানায় শুতে-না-শুতেই ত ঘুমিয়ে পড়ি,—রাগ করবার সময় কোথায় আমার ?

অপূর্ব কহিল ওঃ—রাগ করবারও সময়টুকু নেই।

ভারতী বলিল, কই আর আছে ? আপনি বরঞ্চ কোন দিন সকাল থেকে এসে দেখবেন সত্যি না মিছে !

অপূর্বর মুখ দিয়া অলক্ষিতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। কহিল, দেখবার আমার দরকার কি ! একটুখানি থামিয়া কহিল, ইস্কুলে আপনাকে কত মাইনে দেয় ?

ভারতী হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, বেশ ত আপনি ! মাইনের কথা বন্ধি কাউকে জিজ্ঞাসা করতে আছে ? এতে তার অপমান হয় না ?

অপূর্ব ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, অপমান করবার জন্তে ত আর বলিনি। চাকুরিই যখন করছেন—

ভারতী কহিল, না করে কি শুকিয়ে মরতে বসেন ?

অপূর্ব বলিল, এ যা চাকরি, এই ত শুকিয়ে মরা ! তার চেয়ে বরঞ্চ আমাদের আফিসে একটা চাকুরি আছে, মাইনে একশ' টাকা,—হয়ত দু'এক ঘণ্টার বেশি খাটতেও হবে না।

ভারতী প্রশ্ন করিল, আমাকে সেই চাকরি করতে বলেন ?

অপূর্ব কহিল, দোষই বা কি ?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি কোরব না। আপনি ত তার কর্তা, কাজে ভুলচুক হলেই লাঠি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াবেন।

অপূর্ব জবাব দিল না। সে মনে মনে বুকিল ভারতী শুধু পরিহাস করিয়াছে, তথাপি তাহার সেই একটা দিনের আচরণের ইঙ্গিত করায় তাহার গা জলিয়া গেল। কিছুক্ষণ হইতেই একটা তর্ক-বিতর্কের কলরোল নীচে হইতে শুনা যাইতেছিল, সহসা তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিল। অপূর্ব ভালমাহুটির মত জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ইচ্ছা বোসুলো বোধ হয়—ছেলেয়া সব পড়ায় মন দিয়েছে।

ভারতী গম্ভীরমুখে কহিল, তা'হলে হাঁকা-হাঁকিটা কিছু কম হতো। তাদের শিক্ষকেরা বোধ করি বিষয় নির্বাচনে মন দিয়েছেন।

আপনি যাবেন না ?

যাওয়া ত উচিত, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যেতে যে মন সরেনা। এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিল। কিন্তু অপূর্বর কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। সে আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া পাশের দেয়ালের গায়ে সাজানো কাঁচা কাউপাতা দিয়া লেখা কয়েকটা অক্ষরের প্রতি সহসা দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, ওটা কি লেখা শুধানে ?

ভারতী কহিল, পড়ুন না।

অপূর্ব স্বাকাল মনঃসংযোগ করিয়া বলিল, পথের দাবী। তার মানে ?

ভারতী কহিল, ওই আমাদের সমিতির নাম, ওই আমাদের মন্ত্র, ওই আমাদের সাদনা ! আপনি আমাদের সভ্য হবেন ?

অপূর্ব বলিল, আপনি নিজে একজন সভ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু কি আমাদের করতে হবে ?

ভারতী বলিল, আমার সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙে-চুরে চলুবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারেন, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ। আসবেন আমাদের দলে ?

অপূর্ব কহিল, আমরা পরাধীন জাতি, ইংরেজ নই, করানী নই, আমেরিকান নই,—কোথায় পাবো আমরা অপ্রতিহত গতি ?। ষ্টেশনের একটা বেঞ্চে বসবার আমাদের অধিকার নেই, অপমানিত হয়ে নালিশ করবার পথ নেই,—বলিতে বলিতে সেদিনের সমস্ত লাজুনা,—কিরিঙ্গী ছোড়াদের বুটের আঘাত হইতে ষ্টেশন মাষ্টারের বাহির করিয়া দেওয়া অবধি সকল অপমান কষ্ট অনুভব করিয়া তাহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আমরা বসলে বেঞ্চ অপবিত্র হয়, আমরা গেলে ঘরের হাওয়া কুলবিত হয়,—আমরা যেন মানুষ নই ! আমাদের যেন মানুষের প্রাণ, মানুষের রক্ত মাংস গায়ে নেই ! এই যদি আপনাদের সাধনা হয়, আছি আমি আপনাদের দলে।

ভারতী কহিল, আপনি কি মানুষের জালা টের পান অপূর্ববাবু ? সত্যি কি মানুষের ছোয়ায় মানুষের আপত্তি করবার কিছু নেই, তার গায়ে বাতাসে আর একজনের ঘরের বাতাস অপবিত্র হয়ে ওঠে না ?

অপূর্ব তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় নয়। মানুষের চামড়ার রঙ ত তার মনুষ্যত্বের মাপকাঠি নয় ! কোন একটা বিশেষ দেশে জন্মানই ত তার অপরাধ হতে পারে না ! মাপ করবেন আপনি, কিন্তু জোসেফ সাহেব ক্রীশ্চান বলেইত শুধু আদালতে আমার কুড়ি টাকা দণ্ড হয়েছিল। ধর্মমত ভিন্ন হলেই কি মানুষে হীন প্রতিপন্ন হবে ? এ কোথাকার দ্বিচার ! এই বল্চি আপনাকে আমি, এর জগ্গই এরা একদিন মরবে। এই যে মানুষকে অকারণে ছোট করে দেখা,

এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, এ অপরাধ ভগ্নবান কণ্ঠনো ক্ষমা করবেন না।

বেদনা ও লাঞ্ছনার মত মানুষের সত্যবস্তটিকে টানিয়া বাহিরে আনিতে ত দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তাই সে সমস্ত ভুলিয়া অপমানকারীর বিরুদ্ধে অপমানিতের পীড়কের বিরুদ্ধে পীড়নের মর্যাদাত্মক অভিযোগে সহস্রমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতী তাহার দৃষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়াছিল, কিন্তু কথা তাহার শেষ হইতেই সে শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। অপূর্ব চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখের উপর কে যেন সজোরে মারিল। ভারতীর কোন প্রশ্নই এতক্ষণ সে খেয়াল করে নাই, কিন্তু সেগুলি অগ্নিরেখার মত তাহার মাথার মধ্যে দিয়া সশব্দে খেলিয়া গিয়া তাহাকে একেবারে বাক্যহীন করিয়া দিল।

মিনিটখানেক পরে ভারতী পুনরায় যখন মুখ ফিরাইয়া চাহিল, তখন তাহার গুষ্ঠাধরে হাসির চিহ্নমাত্র ছিল না, কহিল, আজ শনিবারে আমাদের ইস্কুল বন্ধ, কিন্তু সমিতির কাজ হয়। চলুন না, নীচে গিয়ে আপনাকে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে পথের দাবীর সভ্য করে নিই।

তিনি বুঝি সভাপতি ?

সভাপতি ? না, তিনি আমাদের মূল শিকড়। মাটির তলায় থাকেন, তাঁর কাজ চোখে দেখা যায় না।

শিকড়ের প্রতি অপূর্বের কিছুমাত্র কৌতুহল জন্মিল না। জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের সভ্যরা বোধহয় সকলে ক্রীশ্চান ?

ভারতী কহিল, না, আমি ছাড়া সকলেই হিন্দু।

অপূর্ব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কিন্তু মেয়েদের গলা পরাঙ্ঘি যে ?

• ভারতী কহিল, তাঁরাও হিন্দু।

অপূর্ব মুহূর্তকাল দ্বিধা করিয়া বলিল, কিন্তু তাঁরা বোধ হয় জাতিভেদ,
—অর্থাৎ কিনা, খাওয়া ছোঁয়ার বিচার বোধ করি করেন না ?

ভারতী বলিল, না। তারপরে হাসিমুখে কহিল, কিন্তু কেউ যদি
মেনে চলেন, তাঁর মুখেও আমরা কেউ খাবার জিনিস জোর করে
গুঁজে দিইনে। মানুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিকে আমরা অত্যন্ত সম্মান
করে চলি। আপনার ভয় নেই।

অপূর্ব বলিল, ভয় আবার কিসের ? কিন্তু,—আচ্ছা, আপনার মত
শিক্ষিতা মহিলাও বোধ করি আপনাদের দলে আছেন ?

আমার মত ? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, আমাদের প্রেসিডেন্ট
যিনি, তাঁর নাম স্মিত্রা, তিনি একলা পৃথিবী ঘুরে এসেছেন,—শুধু
ডাক্তার ছাড়া তাঁর মত বিদুষী বোধ হয় এ-দেশে কেউ নেই।

অপূর্ব বিষ্ময়াপন্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, আর ডাক্তার থাকে বলছেন,
তিনি ?

ডাক্তার ? অন্ধায় ও ভক্তিতে ভারতীর দুই চক্ষু যেন সজল হইয়া
উঠিল, কহিল, তাঁর কথা থাক অপূর্ববাবু। পরিচয় দিতে গেলেই হয়ত
তাঁকে ছোট করে ফেলবো।

অপূর্ব আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চূপ করিয়া রহিল। দেশের
প্রতি ভালবাসার নেশা তাহার রক্তের মধ্যে—এই দিক দিয়া পথের
দাবীর বিচিত্র নামটা তাহাকে টানিতে লাগিল। এই সঙ্কীর্ণ, বন্ধুহীন
বিদেশে এতগুলি অসাধারণ শিক্ষিত নর-নারীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা,
চেষ্টা ও উত্তম, তাহাদের ইতিহাস, তাহাদের রহস্যময় কর্মজীবনের
অপরিস্রুত পদ্ধতি ওই যে অদ্ভুত নামটাকে জড়াইয়া উঠিতে চাহিতেছে
তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের লোভ সম্বরণ করা কঠিন, কিন্তু তবুও কেমন
এমন একপ্রকার বিজাতীয়, ধর্মবিহীন, অস্বাস্থ্যকর বাষ্প নীচে হইতে
উঠিয়া তাহার মনটাকে ধীরে ধীরে প্লানিতে ভরিয়া আনিতে লাগিল।

কলরব বাড়িয়া উঠিতেই ছিল, ভারতী কহিল, চলুন যাই।

অপূর্ব সায় দিয়া বলিল, চলুন—

উভয়ে নীচে আসিলে ভারতী তাহাকে একটা বেতের সোফায় বসিতে দিয়া স্থানাভাবে তাহার পার্শ্বেই উপবেশন করিল।

এই আসনটা এমন সঙ্গীর্ণ যে এত লোকের সম্মুখে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া দুজনের বসা চলেনা। একরূপ অদ্ভুত আচরণ ভারতী কোনদিন করে নাই, অপূর্ব শুধু সঙ্কোচ নয়, অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিতে লাগিল, কিন্তু এখানে এই সকল ব্যাপারে জ্ঞেপ করিবারও যেন কাহারও অবসর নাই। সে আর একটা বস্তু লক্ষ করিল যে, তাহার মত অপরিচিত ব্যক্তিকে আসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া প্রায় সকলেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু, যে বিতণ্ডা উদ্যমবেগে বহিতেছিল তাহাতে লেশমাত্র বাধা পড়িল না। কেবল, একটি মাত্র লোক যে পিছন ফিরিয়া কোণের টেবিলে বসিয়া লিখিতেছিল সে লিখিতেই রহিল তাহার আগমন বোধ হয় জানিতেই পারিল না। অপূর্ব গণিয়া দেখিল ছয়জন রমণী এবং আটজন পুরুষে মিলিয়া এই ভীষণ আলোচনা চলিতেছে। ইহাদের সকলেই অচেনা, কেবল একটি ব্যক্তিকে অপূর্ব চক্ষের পলকে চিনিতে পারিল। বেশভূষার কিছু পরিবর্তন ঘটয়াছে বটে, কিন্তু এই মূর্তিকেই সে কিছুকাল পূর্বে মিকথিলা রেলওয়ে ষ্টেশনে টিকিট না কেনার দায় হইতে পুলিশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এবং টাকাটা বতশীঘ্র সম্ভব ফিরাইয়া দিতে যিনি স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। লোকটি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু মদের নেশায় তাহার কাছে হাত পাতিয়া উপহার গ্রহণ করিয়াছিল, মদ না-খাওয়া অবস্থায় তাহাকে স্বরণ করিতে পারিল না। কিন্তু ইহার জ্ঞান নয়, ভারতীকে মনে করিয়া তাহার বুকে এই ধ্যাতা অতিশয় বাজিল যে একরূপ সংসর্গে সে আসিয়া পড়িল কিরূপে?

স্বমুখে কে একজন দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িতেই অপূর্বর কানের কাছে মুখ আনিয়া ভারতী চুপি চুপি কহিল, উনিই আমাদের প্রেসিডেন্ট স্মিথ্রা।

বলিবার প্রয়োজন ছিল না। অপূর্ব দেখিয়াই চিনি। কারণ, নারীকে দিয়াই যদি কোন সমিতি পরিচালনা করিতে হয়, এই ত সেই বটে! বয়স বোধ করি ত্রিশের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু যেন রাজ-রাণী! বর্ণ কাঁচা সোণার মত, দাক্ষিণাত্যের ধরণে এলো করিয়া মাথার চুল বাঁধা, হাতে গাছকয়েক করিয়া সোণার চুড়ি, ঘাড়ের কাছে সোণার হারের কিয়দংশ চিক্ চিক্ করিতেছে, কানে সবুজ পাথরের তৈরি ছুলের উপর আলো পড়িয়া যেন সাপের চোখের মত জলিতেছে,— এই ত চাই!—ললট, চিবুক, নাক, চোখ, জা, ওষ্ঠাধর,—কোথাও যেন আর খুঁত নাই,—একি ভয়ানক আশ্চর্য রূপ! কালো বোর্ডের গায়ে একটা হাত রাখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, অপূর্বর চোখে আর পলক পড়িল না। সে আঁক কষিয়াই মাতুষ হইয়াছে, কাব্যের সহিত পরিচয় তাহার অভ্যস্ত বিরল, কিন্তু, কাব্য ষাঁহার লেখেন, কেন যে তাঁহার এত কিছু থাকিতে তরুণ লতিকার সঙ্গেই নারীদেহের তুলনা করেন তাহার জানিবার কিছু আর রহিল না। সম্মুখে একটি বিশ বাইশ বছরের সাধারণ গোছের মহিলা আনতমুখে দাঁড়াইলেন, ভাবে বোধ হয়, তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই তর্কের ঝড় উঠিয়াছে। আবার তাঁহারই অনতিদূরে বসিয়া প্রোট গোছের একজন ভদ্রলোক। তাঁহার পরণের কাটিছাঁট পরিশুদ্ধ বিলাতি পোষাক দেখিয়া অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। খুব সম্ভব তিনিই প্রতিপক্ষ, কি বলিতেছিলেন অপূর্ব ভাল শুনিতেনও পায় নাই, মনোযোগও করে নাই, তাহার সমস্ত চিন্তা স্মিথ্রার প্রতিই একেবারে একাগ্র হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে কি জানি কোন পরম বিশ্বাস রাখিয়া পড়িবে এই ছিল তাহার আশা। অনতিকাল

পূর্বের ক্ষোভের হেতু তাহার মনেও ছিল না। সাহেবি পোষাক-পরা ভদ্রলোকটির প্রত্যুত্তরে এইবার তিনি কথা কহিলেন। এইত! নারীর কণ্ঠস্বর ত একেই বলে! ইহার কণাটুকুও না বাদ যায়, অপূর্ব এমনি করিয়াই কান পাতিয়া রহিল। সুমিত্রা কহিলেন, মনোহরবাবু, আপনি ছেলেমানুষ উকিল নন, আপনার তর্ক অসংলগ্ন হয়ে পড়লে ত মীমাংসা করতে পারব না।

মনোহরবাবু উত্তর দিলেন, অসংলগ্ন তর্ক করা আমার পেশাও নয়।

সুমিত্রা হাসিমুখে কহিলেন, তাই ত আশা করি। বেশ, বক্তব্য আপনার ছোট করে আনলে এইরূপ দাঁড়ায়। আপনি নবতারার স্বামীর বন্ধু। তিনি জোর করে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে চান না, দেশের কাজ করতে চান, এতে অগ্ৰায় কিছু ত দেখিনে।

মনোহর বলিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য আছে ত? দেশের কাজ কোরব বললেই ত তার উত্তর হয় না।

সুমিত্রা কহিলেন, দেখুন মনোহরবাবু, নবতারার কোন্ কাজ করবেন, না করবেন, সে বিচার তাঁর উপর, কিন্তু তাঁর স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি যে কর্তব্য ছিল, তিনি তা কোনদিন করেন নি, এ কথা আপনারা সবাই জানেন! কর্তব্য ত কেবল একদিকে নয়।

মনোহর রাগিয়া কহিলেন, কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকেও যে অসতী হয়ে যেতে হবে, সেও ত কোন যুক্তি হতে পারে না! এই বয়সে এই দলের মধ্যে থেকেও উনি সতীত্ব বজায় রেখে যে দেশের সেবা করতে পারাবন, —এ ত কোনমতেই জোর করে বলা চলেনা!

সুমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়াই তখন সহজ হইয়া গেল, বলিলেন, জোর কসে কিছু বলাও উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখছি নবতারার সুদয় আছে, প্রাণ আছে, সাহস আছে, এবং সবচেয়ে বড় যা সেই ধর্মজ্ঞান

আছে। দেশের সেবা করতে এইটুকুই আমরা যথেষ্ট জ্ঞান করি। তবে, আপনি যাকে সতীত্ব বলছেন, সে বজায় রাখবার ঠাঁর স্ত্রীবিধে হবে কিনা সে উনিই জানেন!

মনোহর নবতারার আনত মুখের প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, খাসা ধর্মজ্ঞান ত! দেশের কাছে এই শিক্ষাই বোধহয় উনি দেশের মেয়েদের দিয়ে বেড়াবেন?

সুমিত্রা বলিলেন, ঠাঁর দায়িত্ব-বোধের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র আলোচনা করা আমাদের নিয়ম নয়, কিন্তু যে-স্বামীকে উনি ভালবাসতে পারেন নি, আর একটা বড় কাজের জগৎ থাকে ত্যাগ করে আসা উনি অগ্রায় মনে করেননি, সেই শিক্ষাই যদি দেশের মেয়েদের উনি দিতে চান ত আমরা আপত্তি কোরব না।

মনোহর কহিলেন, আমাদের এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে এমনি শিক্ষা উনি গ্রহণ মেয়েদের দেবেন?

সুমিত্রা সায় দিয়া বলিলেন, দেওয়া ত উচিত। মেয়েদের কাছে শুধু অর্থহীন বুলি উচ্চারণ না করে নবতারা যদি বলেন যে, এই দেশে একদিন সীতা আত্মসম্মান রাখতে স্বামী ত্যাগ করে পাতালে গিয়েছিলেন, এবং রাজকন্যা সাবিত্রী দরিদ্র সত্যবানকে বিবাহের পূর্বে এত ভালবেসেছিলেন যে অত্যন্ত স্বল্পায়ু জেনেও তাঁকে বিবাহ করতে তাঁর বাধেনি,—এবং আমি নিজেও যে দুর্বৃত্তি স্বামীকে ভালবাসতে পারিনি তাকে পরিত্যাগ করে এসেছি, অতএব, আমার মত অবস্থায় তেঁমরাও তাই কোরো,—এ শিক্ষায় ত দেশের মেয়েদের ভালই হবে মনোহরবাবু।

মনোহরের ওষ্ঠাধর ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, প্রথমটা ত তাঁহার মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না, তারপরে বলিয়া উঠিলেন, তা'হলে—দেশ উচ্ছন্ন যাবে। হঠাৎ হাত জোড় করিয়া কহিলেন, দোহাই

আপনাদের, নিজেরা যা' ইচ্ছে করুন, কিন্তু অপরকে এ শিক্ষা দেবেন না। ইউরোপের সভ্যতা আমদানি করে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তাহার প্রচার করে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে আর রসাতলে পাঠাবেন না।

স্বমিত্রার মুখের উপর বিরক্তি ও ক্লান্তি যেন একই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন, রসাতল থেকে বাঁচাবার যদি কোন পথ থাকে ত এই। কিন্তু, ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আপনার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই, সুতরাং, এ নিয়ে তর্ক করলে শুধু সময় নষ্ট হবে। অনেক সময় গেছে,—আমাদের অন্ত কাজ আছে।

মনোহরবাবু যথাসাধ্য ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, সময় আমারও অপরিণাপ্ত নয়। নবতারা তাহলে যাবেন না?

নবতারা এতক্ষণ মুখ তুলিয়াও চাহে নাই, সে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

মনোহর স্বমিত্রাকে প্রশ্ন করিলেন, এর দায়িত্ব তাহ'লে আপনারাই নিলেন?

নবতারাই ইহার জবাব দিল, কহিল, আমার দায়িত্ব আমিই নিতে পারবো, আপনি চিন্তিত হবেন না।

মনোহর বক্রদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া স্বমিত্রাকেই পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কহিলেন, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, স্বামিগৃহে বিবাহিত জীবনের চেয়ে গৌরবের বস্ত্র নারীর আর কিছু আছে আপনি বলতে পারেন?

স্বমিত্রা কহিলেন, অপরের বাই হোক, অন্ততঃ, নারীর স্বামিগৃহে তার বিবাহিত জীবনকে আমি গৌরবের জীবন বলতে পারি।

এই উত্তরের পরে মনোহর আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন।

না। অত্যন্ত কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু এইবার ঘরের বাইরে তার অসতী জীবনটাকে বোধ করি গৌরবের জীবন বলতে পারবেন?

.. কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এত বড় কদর্য্য বিদ্রোহেও কাহারও মুখে কোন-রূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। সুমিত্রা শাস্তস্বরে বলিলেন, মনোহরবাবু, আমাদের সমিতির মধ্যে সংযতভাবে কথা বলা নিয়ম।

আর এ নিয়ম যদি না মানতে পারি?

আপনাকে বার করে দেওয়া হবে।

. মনোহরবাবু যেন ফেপিয়া গেলেন। জ্যা-মুক্ত শরের ঠায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, আচ্ছা চল্লুম! গুড্‌বাই! এই বলিয়া ঘরের কাছে আসিয়া তাঁহার উন্নত ক্রোধ যেন সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িল। হাত পা ছুড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সমস্ত খবর তোমাদের জানি। ইংরেজ রাজত্ব তোমরা ঘুচাবে? মনেও কোরোনা! আমি চাষা নই, আমি অ্যাডভোকেট। কোথায় বিচার পেতে হয়, কোথায় তোমাদের হাতে শিকল পরাতে হয় ভাল রকম জানি! আচ্ছা,—এই বলিয়া তিনি অন্ধকারে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

হঠাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। উদ্বেজনা কেহই প্রকাশ করিল না, কিন্তু সকলের মুখেই যেন কি একপ্রকার ছায়া পড়িল। কেবল যে লোকটা কোণে বসিয়া লিখিতেছিল, সে একবার চোখ তুলিয়াও চাহিল না। অপূর্ব্বর মনে হইল, হয় সে সম্পূর্ণ বখির, না হয়, একেবারে পাষাণের ছায় নিরাকুল, নিষ্কিঞ্চর। ভারতীর মুখের চেহারাটা সে দেখিতে চাহিল, কিন্তু সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে ঘাড় ফিরাইয়া রহিল। মনোহর ব্যক্তিটি যেই হোক বাগের মাথায় এই সমিতির বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিয়া গেলেন তাহা অতিশয় সন্দেহজনক। এতগুলি আশ্চর্য্য নরনারী কোথা হইতে

আসিয়াই বা এখানে সমিতি গঠন করিলেন, কি বা তাহার সত্যকার উদ্দেশ্য, হঠাৎ ভারতীই বা কি করিয়া ইহাদের সন্ধান পাইল ? আর ওই যে লোকটি টিকিটের পরিবর্তে একদিন অনায়াসে মদ কিনিয়া খাইয়া তাহারই চোখের সম্মুখে ধরা পড়িয়াছিল,—আর সকলের বড় এই নবতারা !—স্বামী ত্যাগ করিয়া দেশের কাজ করিতে আসিয়াছে,—সত্য স্বাক্ষর কথা ভাবিবার এখন যাহার সময় নাই,—অথচ এই লোকগুলা এত বড় অন্তায়কে শুধু সমর্থন নয়, প্রাণপণে প্রশংসা দিতেছে। এবং যিনি ইহাদের কট্রী, স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি প্রকাশ্য সভায় এতগুলি পুরুষের সমক্ষে সতীধর্মের প্রতি তাঁহার একান্ত অবজ্ঞা অনকোচে প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধটুকুও করিলেন না !

কিছুক্ষণ অবধি সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল ; বাহিরে অন্ধকার, অপ্রশস্ত রাজপথ তেমনি জনহীন নীরব, কমন একপ্রকার উদ্বিগ্ন আশঙ্কায় অপূর্বর মনের ভিতরটা যেন ভার হইয়া উঠিল।

হঠাৎ স্মিত্রার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, অপূর্ববাবু !

অপূর্ব চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

স্মিত্রা কহিলেন, আপনি আমাদের চেনেন না, কিন্তু ভারতীর কাছ থেকে আমরা সবাই আপনাকে চিনি। শুনলাম আপনি আমাদের সমিতির মেম্বর হতে চান। সত্য ?

অপূর্ব না বলিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। যে লোকটি একমনে লিখিতেছিল স্মিত্রা তাহাকে লক্ষ করিয়া কহিলেন, ডাক্তার, অপূর্ববাবুর নামটা লিখে নেবেন। অপূর্বকে হাসিয়া বলিলেন, আমাদের কোন রকম চান্দা নেই,—টাকাকড়ি দিতে হয় না। এতে আমাদের সমিতির বিশেষত্ব।

প্রত্যুত্তরে অপূর্ব নিজেও একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একটা মোটা বাঁধানো খাতায় যথার্থই তাহার নাম লেখা হইয়া গেল।

দেখিয়া মনে মনে সে অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল ; এবং চূপ করিয়া থাকিতে আর না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, কিন্তু কি উদ্দেশ্য, কি আমাকে করতে হবে কিছুই ত জানতে পারলাম না !

• ভারতী আপনাকে জানান নি ?

অপূর্ব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, কিছু জানিয়েছেন, কিন্তু একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, নবতারার আচরণ আপনারা কি সত্যই অগ্নায় মনে করেন না ?

• সুমিত্রা কহিলেন, অন্ততঃ আমি করিনে। কারণ, দেশের বড় আমার কাছে কিছুই নেই।

অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে কহিল, দেশকে আমিও প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। এবং দেশের সেবা করবার অধিকার স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান, কিন্তু এঁদের কর্মক্ষেত্র ত এক নয় ; আমরা পুরুষে বাইরে এসে কাজ করব, কিন্তু নারী গৃহের মধ্যে, শুদ্ধান্তঃপুরে স্বামী পুত্রের সেবার মধ্যে দিয়েই সার্থক হবেন। তাঁদের সত্যকার কল্যাণে দেশের যত বড় কাজ হবে বাইরে এসে পুরুষের সঙ্গে ভিড় করে দাঁড়ালে ত সে কাজ কিছুতেই হবেনা।

সুমিত্রা হাসিলেন। অপূর্ব লক্ষ করিয়া দেখিল সকলেই যেন তাঁহার প্রতি চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসি গোপন করিল। সুমিত্রা কহিলেন, অপূর্ববাবু, এটা অনেক দিনের এবং অনেকের মুখের কথা তা আমরা অস্বীকার করিনে। কিন্তু আপনি ত জানেন কোন একটা কথা কেবলমাত্র বহুদিন ধরে বহু লোকে বলতে থাকলেই তা সত্য হয়ে ওঠেনা। এ ফাঁকির কথা। যারা কোনদিন দেশের কাজ করেনি এ তাদের কথা, দেশের চেয়ে নিজের স্বার্থ যাদের ঢের বড় এ তাদের কথা। এর মধ্যে এতটুকু সত্য নেই। আপনি নিজে যখন কাজে লাগবেন, তখনই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করবেন যে যাকে আপনি নারীর বাইরে এসে ভিড় করা

বল্চেন সে যদি কখনো ঘটে, তখন দেশের কাজ হবে, নইলে কেবলমাত্র পুরুষের ভিড়ে শুকনো বালির মত সমস্ত ঝরে ঝরে পড়বে, কোনোদিন জমাট বাঁধবে না।

অপূর্ব মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু এতে কি দুর্নীতি বাড়বে না? চরিত্র কলুষিত হবার ভয় থাকবে না?

সুমিত্রা বলিলেন, ভয় কি ভিতরেই কম থাকে নাকি? অপূর্ববাবু ওটা বাইরে আসার দোষ নয়, দোষ বিধাতার, যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন; তাদের মধ্যে অচুরাগের আকর্ষণ দিয়াছেন তার। অপূর্ববাবু মনের মধ্যে একটুখানি বিনয় রেখে পৃথিবীর অন্ত্য দেশের দিকে একবার চেয়ে দেখুন দিকি?

এই মন্তব্য শুনিয়া অপূর্ব খুসি হইতে পারিল না, বরঞ্চ, একটুখানি তীব্রতার সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, অগ্র দেশের কথা অগ্র দেশ ভাবুক, আমি আমাদের নিজেদের কল্যাণ চিন্তা করতে পারলেই যথেষ্ট মনে কোরব। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু এখানে একটা বস্তু আমি লক্ষ্য না করে পারিনি যে, বিবাহিত জীবনের প্রতি আপনাদের আস্থা নেই, এমন কি নারীদের বা' চরম উৎকর্ষ, সেই সতীত্ব ও পতিব্রতা-ধর্মকেও আপনারা অবহেলার চক্ষে দেখেন। এর থেকে আসবে দেশের কল্যাণ?

সুমিত্রা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া সঙ্কৌতুক স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, অপূর্ববাবু, আপনি একটু রাগ করে বল্চেন, নইলে ঠিক ও ভাব ত আমি প্রকাশ করিনি। তবে, আগাগোড়াই যে আপনি ভুল বুঝেছেন তাও নয়। যে সমাজে কেবলমাত্র পুত্রার্থেই গ্রাম্য গ্রহণের বিধি আছে, নারী হয়ে তাকে ত আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারিনি। আপনি সতীত্বের চরম উৎকর্ষের বড়াই করছিলেন, কিন্তু, এই যে-দেশে বিবাহের ব্যবস্থা, সে-দেশে ও-বস্তু বড় হয় না, ছোটই হয়।

সত্যি ত শুধু দেহেই পর্যাবসিত নয়, অপূর্ববাবু, মনেরও ত দরকার ? কাগমনে ভালবাসতে না পারলে ত ওর উচ্চ স্তরে পৌছান যায় না ? আপনি কি সত্যি মনে করেন মস্ত পড়ে বিয়ে দিলেই যে-কোন বাঙাল মেয়ে যে-কোন বাঙালী পুরুষকে ভালবাসতে পারে ? একি পুরুষের জল যে, যে-কোন পাত্রে ঢেলে মুখ বন্ধ করে দিলেই কাজ চলে যাবে ?

অপূর্ব হঠাৎ কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, কিন্তু চিরকাল চলেও ত যাচ্ছে ?

• স্মিত্রা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তা যাচ্ছে । প্রাণাধিক স্বামী বলে পাঠ লিখতেও তার বাধেনা, কর্তব্যবোধে শ্রদ্ধাভক্তি করতেও হয়ত তার আটকাই না । বস্তুতঃ, ঘর-কন্নার কাজে এর বেশি তার প্রয়োজন হয়না । আপনি ত গল্প পড়েছেন, কোন্ এক ঋষি-পুত্রের ছুঁবের বদলে চালের গুঁড়োর জল খেয়েই আরামে দিন কাটতো । কিন্তু আরাম যেমনই হোক, যা নয় তাকে তাই বলে গরু করা ত যায় না ।

এই আলোচনা অপূর্বর অত্যন্ত বিস্মী ঠেকিল, কিন্তু এবারেও সে জবাব দিতে না পারিয়া কহিল, আপনি কি বলতে চান এর অধিক কারও ভাগেই জোটে না ?

স্মিত্রা কহিলেন, না তা আমি বলতেই পারিনে । কারণ, সংসারে দৈবাত্ব বলেও একটা শব্দ আছে ।

অপূর্ব কহিল, ওঃ—দৈবাত্ব ! কিন্তু কথা যদি আপনার সত্যও হয় তবুও আমি বলি সমাজের মঙ্গলের জন্ত, উত্তর পুরুষের কল্যাণের জন্ত আমাদের এই-ই ভাল ।

স্মিত্রা তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ় কর্তে বলিলেন, না অপূর্ববাবু, সমাজ এবং আপনার উত্তর পুরুষ কোনটারই এতে শেষ পর্যন্ত কল্যাণ হবে না । সমাজ ও বংশের নাম কোরে ব্যক্তিকে একদিন বলি দেওয়া

হোতো, কিন্তু ফল তার ভাল হয়নি,—আজ তা' অলস। ভালবাসার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন উত্তর পুরুষের জ্ঞান না হলে এমন ভয়ানক স্নেহের ব্যবস্থা তার মাঝখানে স্থান পেতনা। এই ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের মোহ নারীকে কাটাতেই হবে। তাকে বুঝাতেই হবে, এতে তার লজ্জাই আছে গোরব নেই।

অপূর্ব ব্যাকুল হইয়া কহিল, কিন্তু ভেবে দেখুন আপনাদের এই সকল শিক্ষায় আমাদের স্থানীয়ত্ব সমাজে অশান্তি এবং বিপ্লব এসেই উপস্থিত হবে।

সুমিত্রা বলিলেন, হলই বা। অশান্তি এবং বিপ্লব মানেই ত অকল্যাণ নয় অপূর্ববাবু। যে রুগ্ন, জীর্ণ, জরাগ্রস্ত সেই শুধু উৎকর্ষিত মতর্কতায় আপনাকে আগলে রাখতে চায় কোন দিক দিয়ে না তার গায়ে ধাক্কা লাগে। অন্তর্ক্ষণ এই ভয়েই সে কাঁটা হয়ে থাকে এতটুকু নাড়াচাড়াতেই তার প্রাণবায়ু চোখের পলকে বেরিয়ে যাবে। আর এমনি অবস্থাই যদি সামাজ্যের হয়ে থাকে ত বাক্ না একটা হেস্ট-নেস্ট হয়ে। দু'দিন আগে-পাছের জ্ঞান কি-ই বা এমন ক্ষতি হবে?

এ কথা'র অপূর্ব আর জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল। সুমিত্রা নিজেও অণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, ঋষি-পুত্রের উপমা দিয়ে হয়ত আপনাকে আমি ব্যথা দিগেছি। কিন্তু ব্যথা যে আপনার পাওনা ছিল, তার থেকে আপনাকে আমি বাঁচাতামই বা কি করে?

তাহার শেষের কথাটা অপূর্ব বুঝিতে পারিল না, কিন্তু বিরক্তির পাত্র তাহার পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই প্রত্যুত্তরে বলিয়া ফেলিল, জগন্নাথের পথে দাঁড়িয়ে ক্রীশ্চান মিশনারিরা যাত্রীদের অনেক ব্যথা দেয়। তবুও সেই ঠুঁটো জগন্নাথকে ত্যাগ করে ঐ উচ্চ-ওয়াল খুটকেও ভজে না। ঠুঁটো নিয়েই তাদের কাজ চলে যায়, এই আশ্চর্য্য!

হুমিত্রা রাগ করিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, সংসারে আশ্চর্য্য আছে বলেই ত মানুষের বাঁচা অসম্ভব হয়ে ওঠেনা অপূর্ব্ববাবু। গাছের পাতার রঙ যে সবাই সবুজ দেখেনা এ তারা জানেও না। তবু যে লোকে তাকে সবুজ বলে, সংসারে এই কি কম আশ্চর্য্য! সত্যীত্বের সত্যিকার মূল্য জানলে কি—

হুমিত্রা! যে লোকটি নিঃশব্দে এতক্ষণ লিখিতেছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল।

• অপূর্ব্ব দেখিল, গিরীশ মহাপাত্র।

ভারতী তাহার কানে কানে বলিল, উনিই আমাদের ডাক্তার। উঠে দাঁড়ান।

কলের পুতুলের মত অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ক্রুদ্ধ মনোহরের শেষ কথাগুলো তাহার চক্ষুর নিমেষে মনে পড়িয়া সমস্ত দেহের রক্ত যেন হিম হইয়া গেল।

গিরীশ কাছে আসিয়া কহিলেন, আমাকে বোধ হয় আপনি ভুলে বান্ধি? আমাকে এঁরা সবাই ডাক্তার বলেন। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

অপূর্ব্ব হাসিতে পারিল না, কিন্তু আস্তে আস্তে বলিল, আমার কাকাবাবুর খাতায় কি একটা ভয়ানক নাম লেখা আছে—

গিরীশ সহসা তাহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপিচুপি কহিলেন, সবাসাচী ত? এই বলিয়া পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু রাত হয়ে গেছে অপূর্ব্ববাবু, চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। পথটা তেমন ভাল নয়,—পাঠান গুয়ার্কমেন-গুলোর মদ খেলে আর যেন জ্ঞান কাণ্ড থাকে না। চলুন। এই বলিয়া যেন একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

হুমিত্রাকে একটা নমস্কার করা হইলনা, ভারতীকে একটা কথা বলা

হইলনা,—কিন্তু সবচেয়ে যে কথাটা তাহার বৃকে ধাক্কা মারিল সে ওই বাঁধানো খাতাটা,—তাহার নাম যাহাতে লেখা রহিল।

(১২)

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই অপূর্ব সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কহিল, আপনার এই অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে আর পথ হেঁটে কাজ নেই। এই তো সোজা রাস্তা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েচে,—আমি অনায়াসে যেতে পারবো।

ডাক্তার চলিতে চলিতেই একটু হাসিয়া বলিলেন, অনায়াসে এলেই কি অনায়াসে যেতে পারা যায় অপূর্ববাবু? তখন সন্ধ্যাবেলা যে পথটা সোজাই ছিল, এখন, এতরাত্রে জেরবাদীপাঠান আর বেকার কাফ্রিতে মিলে হয়ত তাকে রীতিমত বাঁকিয়ে রেখেচে। চলুন, আর দাঁড়াবেন না।

অপূর্ব ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, কি করে এরা? মারামারি?

তাহার সঙ্গী পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন, করে বই কি! মদের খরচাটা তারা পরের ঘাড়ে চাপাবার কাজে ও-অহুষ্ঠানটুকু বোধ করি ঠিক বাদ দিয়ে উঠতে পারে না। এই যেমন সোনার ঘড়িটা আপনার। অপরের পকেটে চালান বাবার সময়ে আপত্তি হবারই সম্ভাবনা। তার পরের ব্যাপারটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঠিক না?

অপূর্ব সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক বটে, কিন্তু এ যে আমার বাবার ঘড়ি!

ডাক্তার বলিলেন, এই তো তারা বুঝতে চায় না! কিন্তু আজ না বুঝলে চলবেনা।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আজ এর বদলে কারুরই মদ খাবার সুবিধে হবে না।

অপূর্ব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সন্ধিগুরু কহিল, বরঞ্চ চলুন, আর কোন পথ দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক।

ডাক্তার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অনেকটা মেয়েদের মত স্নিগ্ধ সর্কোতুক হাসি। কহিলেন, ঘুরে? এই দুপুর রাতে? না না, তার আবশ্যক নেই, চলুন—এই বলিয়া সেই শীর্ণ হাতখানি দিয়া অপূর্বর ডান হাতটি টানিয়া লইয়া একটা চাপ দিতেই অপূর্বর অনেক দিনের অনেক জিমনাস্টিক, অনেক ক্রিকেট-হকি-খেলা হাতের ভিতরের হাড়গুলো পর্য্যন্ত যেন মড়মড় করিয়া উঠিল।

অপূর্ব হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, চলুন, বুঝেচি। এই বলিয়া সে নিজেও একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কাকাবাবু সেদিন আপনার কথাতেই রহস্ত করে আমাকে বলেছিলেন, মাঝে কি বাবাজি মহাপুরুষের সঙ্গদর্শনায় এত লোকজনের আয়োজন করতে হয়? আমাদের গুহ্য কেতাবে লেখা আছে, কৃপা করলে তিনি পাঁচ-সাত-দশজন পুলিশের ভবলীলা শুধু চড় মেরেই সাদ্দ করে দিতে পারেন! কাকাবাবুর মুখের ভঙ্গীতে সেদিন আমরা খুব হেসেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অত হাস্য ঠিক সঙ্গত হয়নি—আপনি পারলেও বা পারতে পারেন।

ডাক্তারের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল, কহিলেন, কাকাবাবুর ওটা অতিশয়োক্তি। কিন্তু আমরা কে কে?

অপূর্ব কহিল, আমি এবং তাঁরই ছ'চারজন কর্মচারী।

ও—এঁরা! এই বলিয়া তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অপূর্ব ইহার অর্থ বুঝিল; এবং কিছুক্ষণ অবধি কোন কথা যেন তাহার মুখে আসিল না। সেশজা পথটা আজ সোজাই ছিল, কারণ, যে জগুই হেঁক, পথিকের টাকারুড়ি কাড়িয়া লইবার আজ কেহ তথায় উপস্থিত ছিল না। নির্জন গলিটা নিঃশব্দে পার হইয়া তাহারা বড় রাস্তার কাছাকাছি!

পৌছিলে অপূর্ব সহসা বলিয়া উঠিল, এবার বোধ হয় আমি নির্ভয়ে যেতে পারবো। ধন্যবাদ।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার স্বল্পালোকিত সম্মুখের প্রশস্ত রাজপথের বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, পারবেন বোধ হয়।

অপূর্ব নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া ভিতরের কৌতূহল কোন মতেই আর সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, সব্য—

না না, সব্য নয়, সব্য নয়,—ডাক্তারবাবু।

অপূর্ব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমাদের সৌভাগ্য যে পথে কেউ ছিল না, কিন্তু ধরুন তারা দলে বেশি থাকলেও কি সত্য সত্যই কোন ভয় ছিল না?

ডাক্তার কহিলেন, দলে তারা দু'দশজনের বেশি কোন দিনই থাকে না।

অপূর্ব বলিল, দু'দশ জন! অর্থাৎ, দু'জন থাকলেও ভয় ছিল না, দশজন থাকলেও না?

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, না।

বড় রাস্তার মোড়ের উপর আসিয়া অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বাস্তবিকই কি আপনার পিস্তলের লক্ষ্য কিছুতেই ভুল হয় না?

ডাক্তার তেমনি সহাগ্রে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, না। কিন্তু কেন বলুন ন? আমার সঙ্গে ত পিস্তল নেই।

অপূর্ব বলিল, ওটা না নিয়েই বেরিয়েছিলেন,—আশ্চর্য্য! অন্ধক র গভীর রাত্রি কাঁ কাঁ করিতেছে, সে জনহীন দীর্ঘ পথের প্রতি হুয়া কহিল, পথে না আছে লোক, না আছে একটা পুলিশ, আদৌ ত না থাকার মধ্যেই—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমার বাসাটা প্রায় ক্রোশখানেক হবে না?

ডাক্তার বলিলেন, তা হবে বই কি।

অপূর্ব কহিল, আচ্ছা, নমস্কার, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। এই বলিয়া সে চলিতে উদ্যত হইয়া কহিল, আচ্ছা, এমন ত হতে পারে, সে ব্যাটারা আজ আর কোন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে?

ডাক্তার সায় দিয়া কহিলেন, বিচিত্র নয়।

অপূর্ব কহিল, নয়ই ত! আছেই!—আচ্ছা, নমস্কার! কিন্তু মজা দেখেছেন, যেখানে আসল দরকার সেখানে পুলিশের ছায়াটি পর্যন্ত দেখবার যো নেই। এই হ'ল তাঁদের কর্তব্য জ্ঞান! আর এর জন্তই আমরা ট্যাক্স জুগিয়ে মরি! সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কি বলেন?

তাতে আর সন্দেহ কি! বলিয়া ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, চলুন, কথা কইতে কইতে আর খানিকটে আপনার সঙ্গে এগিয়ে যাই।

অপূর্ব লজ্জায় একেবারে শ্রান হইয়া গেল। এক মুহূর্ত মাটির দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি বড় ভীতু লোক ডাক্তারবাবু, আমার কিচ্ছু সাহস নেই। আর কেউ হলে অনায়াসে যেতে পারতো, এত রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিত না।

তাহার এই বিনয় নম্র, নিরভিমান সত্য কথায় ডাক্তার নিজের হাসির জন্ত নিজেও যেন লজ্জা পাইলেন, সম্মুখে তাহার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, সঙ্গে যাবার জন্তেই আমি এসেছি অপূর্ববাবু, নইলে প্রেসিডেন্ট আমাকে এ জিনিসটা হাতে গুঁজে দিতেন না। এই বলিয়া তিনি বাঁ হাতের মোটা কালো লাঠিটা দেখাইলেন।

অপূর্ব চকিত হইয়া কহিল, স্তমিত্রা? তিনি কি আপনাকেও আদেশ করিতে পারেন।

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, পারেন বই কি।

অপূর্ব বলিল, কিন্তু তিনি ত অল্প লোকও সঙ্গে দিতে পারতেন?

ডাক্তার কহিলেন, তার মানে সবাইকে দল বেঁধে পাঠানো। তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই সোজা হয়েছে অপূর্ববাবু।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। ডাক্তার কহিলেন, সুমিত্রা আমাদের দলের কর্মী, তাঁকে সকল দিক চেয়ে দেখে কাজ করতে হয়। যেখানে ছুরি-ছোরা খুন-জখম-লেগেই আছে সেখানে যাকে তাকে ত পাঠানো যায় না। আমি উপস্থিত না থাকলে আজ আপনাকে থাকতে হোতো,—তিনি কোনমতেই আসতে দিতেন না।

এই অন্ধকার জনহীন পথে ছুরি-ছোরার কথায় অপূর্বর সর্কাজে কাঁটা দিয়া গেল। আস্তে আস্তে কহিল, কিন্তু এই পথেই যে আপনাকে একাকী ফিরতে হবে!

ডাক্তার বলিলেন, তা' হবে।

অপূর্ব আর প্রশ্ন করিল না। তাহাদের নিভৃত আলাপের গুঞ্জন শব্দ পাছে অবজ্ঞিত কাহাকেও আকৃষ্ট করিয়া আনে এ খেয়াল তাহার মনের মধ্যে বিচ্যমান ছিল। সে তাহার চক্ষু কর্ণ ও মনকে একই কালে রাস্তার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে একান্ত নিবিষ্ট করিয়া নিশ্চয় ক্রতপদে পথ চলিতে লাগিল। মিনিট পোনের এই ভাবে চলিয়া সহরের প্রথম পুলিশ স্টেশনটা ভানহাতে রাপিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব আবার কথা কহিল, বলিল, ডাক্তারবাবু, আমার বাসা ত বেশি দূরে নয়, আজ রাত্রিটা ওখানে থাকলে ক্ষতি কি?

ডাক্তার তাহার মনের কথা অনুমান করিয়া সহাস্তে কহিলেন, ক্ষতি ত অনেক জিনিসেই হয় না অপূর্ববাবু, কিন্তু বিনা প্রয়োজনেও কোন কাজ করা আমাদের বারণ। শুধু কেবল প্রয়োজন নেই বলেই থাকে ফিবে যেতে হবে।

আপনারা কি অপ্রয়োজনে জগতে কিছুই করেন না?

করা বারণ আমি তা'হলে বিদায় হই অপূর্ববাবু?

অপূর্ব কটাক্ষে পশ্চাতের সমস্ত অন্ধকার পথটার প্রতি চাহিয়া এই লোকটিকে একাকী ফিরিয়া বাইতে কল্পনা করিয়া আর একবার কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কহিল, ডাক্তারবাবু, মানুষের মর্যাদা রক্ষা করাও কি আপনাদের বারণ?

ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, হঠাৎ একথা কেন?

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ অভিমানের স্বরে বলিল, তা ছাড়া আর কি বলুন? আমি ভীত লোক, দলবদ্ধ গুণ্ডাদের মধ্যে দিয়ে একলা যেতে পারিনে;— আমাকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে সেই বিপদের ভেতর দিয়ে আপনি যদি আজ একাকী ফিরে যান, আর কি আমি মুখ দেখাতে পারবো?

ডাক্তার চক্ষের নিমিষে তাহার দুই হাত সন্মুখে ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, আচ্ছা চলুন তবে আজ রাত্রির মত আপনার বাসাতে গিয়েই অতিথি হইগে। কিন্তু এ সব হাদ্যামা কি সহজে নিতে আছে ভাই?

কথাটা অপূর্ব ঠিক বুঝিল না, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই হাতের মধ্যে কেননতর এক প্রকার টান অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিয়াই কহিল, আপনার জুতোয় বোম করি লাগছে ডাক্তারবাবু, আপনি থোড়াচ্ছেন।

ডাক্তার মুহু হাসিয়া বলিলেন, ও কিছ না। লোকালয়ে আমার পা দুটো কেনন আপনিই খুঁড়িয়ে চলে। গিরীশ মহাপাত্রের চলন মনে পড়ে?

অপূর্ব থমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনাকে যেতে হবে না, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার তেমনি মুহু হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনার মর্যাদা?

অপূর্ব বলিল, আপনার কাছে আবার মর্যাদা কি? পায়ের ধুলোর যোগ্যও ত নই। আপনি ছাড়া পৃথিবীতে কি আর কারও এতবড় দাহস আছে! !

এই ডাক্তার ব্যক্তিটির জীবন-ইতিহাসের সহিত অপূর্বর প্রত্যক্ষ পরিচয় কিছুই ছিল না। থাকিলে সে এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া এতখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লজ্জায় মরিয়া যাইত। সমুদ্রের কাছে গোম্পদের ন্যায় এই পথটুকুতে একাকী হাঁটা এই লোকটির কাছে কি! পুলিশের লোকে যাহাকে সব্যসাচী বলিয়া জানে, দশ-বারোজন দুর্কৃত্তে মিলিয়া তাহার পথরোধ করিবে কি করিয়া?

ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়া শেষে ভাল মানুষটির মত কহিলেন, আচ্ছা, তার চেয়ে চলুন না কেন দুজনই আবার একসঙ্গে ফিরে যাই? আমাকে একলা যদি বা কেউ আক্রমণ করতে সাহস করে আপনি কাছে থাকলে ত সে সম্ভাবনা থাকবে না!

অপূর্ব অনিশ্চিতকণ্ঠে বলিল, আবার ফিরে যাবো?

ডাক্তার বলিলেন, দোষ কি? আমার একলা যাবার বিপদের শঙ্কাও থাকবে না।

থাকবো কোথায়?

আমার কাছে।

আফিস হইতে ফিরিয়া আজ অপূর্বর খাওয়া হয় নাই, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল, একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, দেখুন, আমার কিন্তু এখনো খাওয়া হয়নি,—আচ্ছা, তা না হয় আজ—

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, চলুন না, ভাগ্য পরীক্ষা কোরে আজ দেখাই যাক। কিন্তু একটা কথা, তেওয়ারী বেচারী বড় চিত্তিত হয়ে থাকবে।

তেওয়ারীর উল্লেখে অপূর্বর মনের মধ্যে হঠাৎ একটা হিংস্র শোষণের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল, রাগ করিয়া বলিল, মরুকণে ব্যাটা ভেবে,—চলুন যাই। এই বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই তাহাকে বাধা দিয়া সেই আলো-আঁদারের জনশূন্য পথে উভয়ে হাটিতে হাটিতে

আবার ফিরিয়া চলিল। এবার কিন্তু ভয়ের কথা তাহার মনেই হইল না। পুলিশ থানা পার হইয়া সহসা একসময়ে সে প্রস্থ করিয়া বসিল, 'আচ্ছা ডাক্তার বাবু, আপনি কি এ্যোনাকিষ্ট ?

ডাক্তার অন্ধকারে তাহার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কাকাবাবু কি বলেন ?

অপূর্ব কহিল, তিনি বলেন সব্যসাচী একজন ভয়ানক এ্যোনাকিষ্ট।

আমি যে সব্যসাচী এ সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ নেই ?

না।

এ্যোনাকিষ্ট বলতে আপনি কি বুঝেন ?

অপূর্ব এ প্রশ্নের হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। একটু ভাবিয়া কহিল, অর্থাৎ কি না রাজদ্রোহী—যিনি রাজার শত্রু।

ডাক্তার বলিলেন, আমাদের রাজা এদেশে থাকেন না, থাকেন বিলাতে। লোকে বলে অতিশয় ভদ্রলোক। আমি তাঁকে কখনো চোখে দেখিনি, তিনিও আমার কখনো লেশমাত্র ক্ষতি করেননি। তাঁর প্রতি বৈরীভাব আসবে আমার কোথা থেকে অপূর্ববাবু ?

অপূর্ব কহিল, যাদের আসে, তাদেরই বা কি কোরে আসে বলুন ? তাদেরও ত তিনি কোন অনিষ্ট করেননি !

ডাক্তার সবগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তাই, আপনি বা বলছেন এদেশে তা নেই, একেবারে মিছে কথা !

তাঁহার কণ্ঠস্বরের প্রবলতায় ও অস্বীকার করিবার তীব্রতায় অপূর্ব চমকিয়া গেল। অবিশ্বাস করিবার সাহস তাহার হইল না। অথচ, দেশে কিছু একটা আছেই, ছেলেবেলা তাহারও গায়ে যে ইহার আঁচ লাগিয়া গেছে, এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা না থাকিলে কোলাকারে জল যে কোথায় গিয়া গড়াইতে পারিত ইহা সে বড় বয়সে পদে পদে অনুভব করিয়াছে। একটু ভাবিয়া কহিল, রাজা না হোন রাজ!

কর্মচারীর বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র ছিল এ কথা তো মিথ্যা নয় ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না, তারপরে দীর্ঘে দীর্ঘে বলিলেন, কর্মচারীরা রাজার ভৃত্য, মাইনে পায় জুকুম পালন করে। একজন যায় আর একজন আসে। এটা সহজ এবং মোটা কথা। কিন্তু এই সহজকে জটিল এবং মোটাকে নিরর্থক সূক্ষ্ম করে মাহুষে যখন দেখতে চায়, তখনই তার সবচেয়ে বড় ভুল হয়। সেইজন্য তাদের আঘাত করাকেই রাজশক্তির মূলে আঘাত করা বলে আত্মবঞ্চনা করে। এতবড় মারাত্মক ব্যর্থতা আর নেই।

অপূর্ব একটু চুপ করিয়া কহিল, কিন্তু এই ব্যর্থ কাজ করবার লোক কি ভারতবর্ষে নেই ?

ডাক্তার শান্তভাবে কহিলেন, হয়ত থাকতেও পারে।

কিন্তু অপূর্ব সহসা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এঁরা সব আজকাল কোথায় থাকেন এবং কি করেন ?

তাহার ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতায় ডাক্তার শুধু মুচকিয়া হাসিলেন।

অপূর্ব কহিল, হাসলেন যে ?

ডাক্তার তেমনি হাসিমুখে বলিলেন, আপনার সেই কাকাবাবুটি উপস্থিত থাকলে কিন্তু বুঝতেন। আপনার বিশ্বাস আমি একজন এ্যানাকিষ্টদের পাণ্ডা। তার মুখ থেকে কি এর জবাব আশা করতে আছে অপূর্ববাবু ?

নিজের বুদ্ধিহীনতার এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে অপূর্ব অপ্রতিভ হইল, মনে মনে একটু রাগও করিল, কহিল, আশা করা সম্পূর্ণই গুচিত হোতো আজ যদি না আমাকে দলভুক্ত করে নিতেন। নেতৃবৃন্দের এটুকু জানবার অধিকার আছে, এ বোধ করি আপনি অস্বীকার করেন না। এ তো ছেলেখেলা নয়, ভীষণ দায়িত্ব আছে যে।

আছেই ত। বলিয়া ডাক্তারবাবু হাসিলেন। এই স্মৃষ্টি হাসিও নিরাতঙ্ক সহজ উক্তি ঠিক ব্যঙ্গোক্তি মতই অপূর্বর কানে বাজিল। বিদ্রোহী দলের বাধানো খাতায় যাহার নাম লেখা হইল তাহার প্রশ্নের এই উত্তর? এর বেশি জানিবার তাহার প্রয়োজন নাই! মনে মনে ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এই লোকটিকে আজ্ঞা সে ভুল বুঝিল, কিন্তু এই ভুল সংশোধন করিয়া পরবর্তী কালে বহুবারই তাহাকে দেখিতে হইয়াছে কোন অবস্থায় কোন কারণেই ইহার মুখের হাসি উদ্বেগে এবং গলার স্বর উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠে না।

নিশঙ্ক গাভীর্থে ডাক্তারের এই সামান্য সংক্ষিপ্ত জবাবটাকে সে প্রতিঘাত করিতে চাহিয়া নিরন্তরে পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না, ওই ছোট্ট কথাটুকুর নিদারুণ তীক্ষ্ণতা তীরের ফলাটুকুর মতই যেন তাহার বুকে বিঁধিতে লাগিল। তিত্তকণ্ঠে কহিল, দলের খাতায় তাড়াতাড়ি নাম লিখে নিলেই ত হয় না, তার ফলাফল বুঝিয়েও দিতে হয়।

কিন্তু সে কি তাঁরা দেন নি?

অপূর্ব কহিল, কিছুই না। পথের দাবী না পথের দাবী! দাবীর বহর যে এত, তা' কে জানতো? আর আপনিও ত ছিলেন, নাম লেখবার পূর্বে আপনারও ত জানা উচিত ছিল আমার যথার্থ মতামত কি!

ডাক্তার একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, মেয়েরা একটা ব্যাপার করেছেন, তাঁরাই জানেন কাকে মেঘর করবেন এবং কীকে করবেন না। আমি হঠাৎ জুটে গেছি মাত্র। বাস্তবিকই আমি এঁদের সভার বিশেষ কিছু জানি নে অপূর্ববাবু!

অপূর্ব বুঝিল ইহাও পরিহাস। উৎকণ্ঠায় ও আশঙ্কায় সমস্ত জিনিসটাই তাহার অত্যন্ত বিস্তীর্ণ লাগিতেছিল, আপনাকে সে আর সমরণ করিতে পারিল না, জলিয়া উঠিয়া কহিল, কোন্ ছলনা করছেন

ডাক্তারবাবু, স্মিত্রাকেই প্রেসিডেন্ট করুন, আর যাকেই যা করুন, দল আপনার এবং আপনিই এর সব, তাতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারবেন কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।

তাহার কথা শুনিয়া এইবার এই শীর্ণদেহ রহস্যপ্রিয় লোকটি অকৃত্রিম বিশ্বয়ে দুই চক্ষু বিস্তারিত করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আমার দল মানে এ্যানাকিষ্টের দল ত? আপনি মিথ্যে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন অপূর্ববাবু, আপনার আগাগোড়া ভুল হয়েছে। তাদের হ'ল জীবন-মৃত্যুর খেলা, তারা আপনার মত ভীতু লোককে দলে নেবে কেন? তারা কি পাগল?

অপূর্ব লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল, কিন্তু তাহার বৃকের উপর হইতে গুরুভার পাষণ নামিয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, পথের-দাবী নাম দিয়ে স্মিত্রা এই ছোট্ট দলটির প্রতিষ্ঠা করেচেন। জীবন-যাত্রায় মানুষের পথ চলবার অধিকার যে কত বড় এবং কত পবিত্র এই মস্ত সত্যটাই মানুষে ঘেন ভুলে গেছে। আপনারা, অর্থাৎ দলের সভ্য যারা, তাঁরা নিজেদের সমস্ত জীবন দিয়ে এই কথাটাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান। স্মিত্রা অনুরোধ করলেন আমি যে কয়দিন এখানে আছি তাঁর দলটিকে বেন গড়ে দিবে যাই। আমি রাজী হয়েছি,—এ ছাড়া আপনাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আপনারা হলেন সমাজ-সংস্কারক, কিন্তু আমার সমাজ সংস্কার করে বেড়াবার সময়ও নেই, ধৈর্যও নেই। হয়ত, কিছুদিন আছি, হয়ত, কালই চলে যেতে পারি; সারাজীবনে যার কখনো দেখাও না হতে পারে। বেঁচে আছি কি নেই, এটা এবরও হয়ত আপনাদের কানে পৌছবে না।

কথাগুলি শান্ত, ধীর,—উচ্ছ্বাস বা আবেগের বাষ্পও নাই। এই ব্যক্তি যেই হোক, কিন্তু সব্যসাচীর যে বিবরণ অপূর্ব কাণ্ডবাবুর মুখে

শুনিয়াছে, সেই সব দপ্ করিয়া মনে পড়িয়া তাহার বুকের কোথায় যেন খোঁচার মত বিধিল। কিন্তু তখনি মনে হইল, সে ত পাষণ,—তাহার জন্ত আবার বেদনাবোধ কি? ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার-বাবু, 'স্বমিত্রা'কে? আপনি তাঁকে জানলেন কি করে?

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন। উত্তর না পাইয়া অপূর্ব নিজেই বুঝিল এরূপ কৌতূহল সঙ্গত হয় নাই। এই অল্প কালের মধ্যেই সে এই রহস্যময় বিচিত্র সমাজের আচরণের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিতেছিল, তাই সে ভারতীর সম্বন্ধেও তাহার প্রবল কৌতূহলও সম্বরণ করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

মিনিট পাচ ছয় এইভাবে নিঃশব্দে কাটিলে ডাক্তার প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আপনার কল্যাণেই বোধ হয় রাস্তা আজ একেবারে নিরাপদ। এমন প্রায় ঘটে না, কিন্তু কি ভাব্‌চেন বলুন ত?

অপূর্ব বলিল, ভাব্‌চি ত অনেক কিছু, কিন্তু সে যাক! আচ্ছা, আপনি বল্লেন মাতৃমের নির্ঝিল্পে পথ চলবার অধিকার। এই যেমন আমরা নির্ঝিল্পে পথ চল্‌চি,—এমনি?

ডাক্তার সহাস্ত্রে কহিলেন, এমনিই কিছু একটা হবে বোধ হয়।

অপূর্ব কহিল, ওই যে মেয়েটি স্বামী পরিত্যাগ করে পথের-দাবীর সভ্য হতে এসেছেন, ওটাও ঠিক বুঝলাম না।

ডাক্তার কহিলেন, আমিও যে ঠিক বুঝেছি তা' বলতে পারিনে। ওদব ব্যাপার স্বমিত্রাই বোঝেন ভাল।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, তাঁর বোধ হয় স্বামী নেই?

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্বকে লজ্জা ও ক্ষোভের সহিত পুনরায় স্মরণ করিতে হইল তাহার অহেতুক ঔৎসুক্যের তিনি জবাব দিবেন না। এবং এই কথা অলক্ষ্যে যাচাই করিতে সে সঙ্গীর মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া কিন্তু একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার

মনে হইল, এই আশ্চর্য্য যাত্রাটির অপরিজ্ঞাত জীবনের একটা নিভৃত দিক্ যেন সে হঠাৎ দেখিতে পাইল। সে ঠিক কি তাহা বলা কঠিন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যাহা কিছু সে জানিয়াছে তাহার অতীত। যেন কোন বহুদূরাক্শে তাহার চিন্তা সরিয়া গেছে, কাছাকাছি কোথাও আর নাই। অনতিদূরবর্তী ল্যাম্পপোষ্ট হইতে কিছুক্ষণ হইতেই একটা ক্ষীণ আলোক হাঁহার মুখের উপরে পড়িয়াছিল, পাশ দিয়া বাইবার সময় অপূর্ব্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল এই ভয়ঙ্কর সতর্ক লোকটির চোখের উপরে একটা ঝাপসা জাল ভাসিয়া বেড়াইতেছে—এই মুহূর্ত্তের জন্য যেন তিনি সমস্ত ভুলিয়া মনে মনে কি একটা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

অপূর্ব্ব দ্বিতীয় প্রশ্ন কবে নাই, নীরবে পথ চলিতেছিল, কিন্তু মিনিট দু'য়ের বেশি হইবেনা, অকস্মাৎ, অকারণেই হাসিয়া উঠিয়া ডাক্তার বলিলেন, দেখুন অপূর্ব্ববাবু, আপনাকে আমি সত্যই বল্চি, মেয়েদের এই সব প্রণয়-ঘটিত মান অভিমানের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝিনে। বোঝবার চেষ্টা কর্ত্তে গেলেও নিরর্থক ভারি সময় নষ্ট হয়। কোথায় পাই এত সময়?

অপূর্ব্ব প্রশ্নের ইহা উত্তর নয়, সে চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, ভারি মুস্তলি, এঁদের বাদ দিয়ে কাজও চলে না, নিলেও গুণগোল বাধে।

এ মন্তব্যও অসম্বন্ধ। অপূর্ব্ব নীরবতরেই রহিল।

কি হোল? কথা ক'ন না যে বড়?

অপূর্ব্ব কহিল, কি বলব বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, যা ইচ্ছে। দেখুন অপূর্ব্ববাবু, এই ভাটাবড় ভাল মেয়ে। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি কর্ম্মঠ এবং তেমনি ভদ্র।

ইহাও বাজে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে এ প্রশ্ন সে ইচ্ছা করিয়াই করিল না যে, আপনি তাহাকে কতদিন হইতে জানিলেন এবং কি করিয়া

গানিলেন। শুধু বলিল, হাঁ। কিন্তু শ্রোতার যদি এদিকে কিছুমাত্র খদ্যল থাকিত ত অপরূপের মুখ হইতে এই এক অক্ষরের জবাবে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যে বিস্মিত হইয়াই আলাপ পরিতেছিলেন, অপরূপকে তাহা আর নূতন করিয়া বুঝিতে হইল না। বক্তা বোধ করি তাঁহার শেষ কথাই সূত্র ধরিয়া কহিলেন, আপনাদের প্রসঙ্গেই কথা কইতে তিনি আপনার সহক্ষে বলছিলেন, আপনি নাকি ভদ্রানক হিন্দু,—একেবারে গোড়া। ভারতী বলছিলেন, এত বড় ভয়ঙ্কর হিন্দু বামুনেরও তিনি জাত মেরে দিচ্ছেন।

অপরূপ বলিল, তা' হবে। এই একান্ত অগ্ন্যম্নস্ক লোকটির সহিত তর্ক করিতে তাহার ইচ্ছাই হইল না। বড় রাস্তা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গলির মোড়ে সাম্না-সাম্নি আলো দুইটা সম্মুখেই দেখা দিল, আর মিনিট দশেকের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌছানো যাইবে, এমনি সময়ে ডাক্তার তাঁহার ঘুমন্ত মনটাকে যেন অকস্মাৎ ঝাড়া দিয়া একেবারে সজাগ করিয়া দিলেন, কহিলেন, অপরূপবাবু!

অপরূপ তাঁহার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় নিজেও সচেতন হইয়া উঠিল, কহিল, বলুন।

ডাক্তার বলিলেন, এদেশে আমি থাকা পর্য্যন্ত কাজ নেই, কিন্তু চলে গেলে আপনি নিঃসঙ্কোচে সুমিত্রাকে সাহায্য করবেন। এমন মান্নব আপনি পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও কখনো পাবেন না। এঁর পথের-দাবী যেন অনাদরে অবহেলায় না মারা পড়ে। এতবড় একটা আইডিয়া কি কেবল এই ক'টি মেয়েমান্নুয়েই সার্থক করে তুলতে পারবে! আপনার একুনিষ্ঠ সেবার একান্ত প্রয়োজন।

এই ব্যক্তির ধারণায় সে যে সত্যই এতবড় লোক অপরূপ তাহা প্রত্যয় করিল না। কহিল, এতবড় একটা আইডিয়াকে তবে আপনিই বা ফেলে যেতে চাচ্ছেন কেন?

ডাক্তার কহিলেন, অপূর্ববাবু, যেখানে ফেলে যাওয়াই যঙ্গল, সেখানে আঁকড়ে থাকতেই অকল্যাণ। আমার সাহায্যে আপনাদের কাজ নেই,—আপনারা নিজেরাই এটা গড়ে তুলুন, হয়ত বা এর ভেতর দিয়েই দেশের সব চেয়ে বড় কাজ হবে।

অপূর্ব কহিল, নবতারার ব্যাপারটা ত আমি বিশ্বাস করিতে পারিনে ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার বলিলেন, কিন্তু সুমিত্রাকে বিশ্বাস করবেন। বিশ্বাসের এতবড় উঁচু জায়গা আর কোথাও পাবেন না, অপূর্ববাবু। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আপনাকে ত আমি পূর্বেই বলেছি, মেয়েদের ব্যাপার আমি বুঝতে পারিনে; কিন্তু সুমিত্রা যখন বলেন, জীবন-যাত্রায় মানবের পথ চলবার বাধাবন্ধহীন স্বাধীন অধিকার, তখন এ দাবীকে ত কোন যুক্তি দিয়েই ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে। শুধু ত মনোহরের নয়, বহুলোকের নিদ্রিষ্ট পথে চলায় নবতারার জীবনটা নিব্বিল হতো, এ আমি বুঝি, এবং যে পথটা সে নিজে বেছে নিলে সে পথটাও নিরাপদ নয়, কিন্তু নিজে বিপদের মাঝখানে ডুবে থেকে আমিই বা তাকে বিচার করবো কি দিবে বলুন? সুমিত্রা বলেন, এ জীবনটা নিব্বিলে কাটাতে পারাটাই কি মানুষের চরম কল্যাণ? মানুষের চিন্তা এবং প্রবৃত্তিই তার কণ্ঠকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু পরের নির্দারিত চিন্তা ও প্রবৃত্তিকে দিয়ে সে যখন তার নিজের স্বাধীন চিন্তার মুখ চেপে ধরে তখন তার চেয়ে বড় আত্মহত্যা মানুষের ত আশ্রয় হতেই পারে না। এ কথা ত কোন জবাব আমি খুঁজে পাইনে অপূর্ববাবু।

অপূর্ব বলিল, কিন্তু সবাই যদি নিজের চিন্তার মত—

ডাক্তার বাধা দিয়া কহিলেন, অর্থাৎ সবাই যদি নিজের খেয়াল মত কাজ করতে চায়?—বলিয়াই একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, তাহলে কি কাণ্ড হয় আপনি সুমিত্রাকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন।

অপূর্ব তাহার প্রশ্নের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া সলজ্জে সংশোধন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় হইল না। ডাক্তার পুনশ্চ বাধা দিয়া কহিলেন, কিন্তু তর্ক আর চলবেনা অপূর্ববাবু, আমরা এসে পড়েছি। আর একদিন না হয় এ আলোচনার শেষ করা যাবে।

অপূর্ব স্তম্ভে চাহিয়া দেখিল, সেই লাল রঙের বিছালয় গৃহ, এবং তাহার দ্বিতলে ভারতীর ঘর হইতে তখনও আলো দেখা যাইতেছে।

ডাক্তার ডাকিলেন, ভারতী!

ভারতী জানালায় মুখ বাহির করিয়া ব্যগ্রভাবে কহিল, বিজয়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে ডাক্তারবাবু? আপনাকে সে ডাক্তারে গিয়েছে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের প্রেসিডেন্টের আদেশ ত? কিন্তু কোন লক্ষ্যই এত রাতে ও-পথে কাউকে পাঠাতে পারবেনা। কিন্তু কাকে ফিরিয়ে এনেছি দেখেচ?

ভারতী ঠাণ্ড করিয়া দেখিয়া অন্ধকারেও চিনিতে পারিল। কহিল, ভাল করেন নি। আপনি কিন্তু শীঘ্র যান, নরহরি মদ খেয়ে তার হৈমর মাথায় কুড়ুল মেরেচে,—বাঁচে কি না সন্দেহ। স্ত্রীমিত্রাদিদি দেখানেই গেছেন।

ডাক্তার কহিলেন, ভালই ত করেছে। মরে ত সে মরুক না। কিন্তু আমার অতিথি?

ভারতী বলিল, মেয়েদের প্রতি আপনার অসীম অহুগ্রহ। এটা কিন্তু হৈম না হয়ে নরহরি হলে আপনি এতক্ষণ উদ্ধৃতিতে দৌড়তেন।

ডাক্তার কহিলেন, না হয় উদ্ধৃতিতেই দৌড়ছি। কিন্তু অতিথি?

আমি যাচ্ছি, বলিয়া ভারতী আলো হাতে পরক্ষণেই নীচে আসিয়া ঘর খুলিয়া দাঁড়াইল, কহিল, বাস্তবিক আর দেরী করবেন না ডাক্তার বাবু যান। কিন্তু, খিষ্টানের আতিথ্য কি উনি স্বীকার করবেন?

ডাক্তার মনে মনে একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া কহিলেন, এঁকে ফেলে আমি ঘাই কি করে ভারতী? হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করনি কেন?

ভারতী রাগ করিয়া কহিল, যা করতে হয় করুন গে ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি আর দেবী করবেন না। আমার অনেক অভ্যাস আছে, ওঁকে আমি সামুলাতে পারবো—আপনি দয়া করে একটু শীঘ্র যান।

অপূর্ব এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। কিন্তু, তাহার জ্ঞান একটা লোক মারা পড়িবে ইহা ত কোন মতেই হইতে পারে না। সে কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই ডাক্তার দ্রুতবেগে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

(১৩)

নীচেকার ঘরের দরজা জানালা ভারতী বন্ধ করিতে ব্যাপৃত রহিল, অপূর্ব সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল, এবং ভাল দেখিয়া একটা আরাম কেদারা বাছিয়া লইয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ! সে যে কতখানি শ্রান্ত হইয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিল।

মিনিট কয়েক পরে ভারতী উপরে আসিয়া হাতের আলোটা যখন তে-পায়ার উপরে রাখিতেছে অপূর্ব তখন টের পাইল, কিন্তু মহনা তাহার এমন লজ্জা করিয়া উঠিল যে, এই ক্ষণকালের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ার স্থায় একটা অত্যন্ত অসম্ভব ভান করার অপেক্ষা আর বেশ দ্রুত ছিলনাই তাহার মনে আসিল না। অথচ, ইহা নূতন নহে। ইতিপূর্বেও তাহার একঘরে বারিলাপন করিয়াছে, কিন্তু সরমের বাস্পও তাহার অন্তরে উদয় হয় নাই। মনে মনে ইহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার তেওয়ারীকে মনে পড়িল। ইস, তখন মরণাপন্ন,

তাহার জ্ঞান ছিল না, সে যে না থাকার মধ্যেই, তথাপি সেই উপলক্ষটুকুকেই হেতু নির্দেশ করিতে পাইয়া অপূৰ্ণ স্বস্তি বোধ করিল। ভারতী ঘরে ঢুকিয়া তাহার প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া যে সকল হাতের কাজ তখন পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল করিতে লাগিল, তাহার কপট নিদ্রা ভাঙাইবার চেষ্টা করিল না, কিন্তু এই পুরাতন বাটীর সুপ্রাচীন দরজা জানালা বন্ধ করার কাজে যে পরিমাণ শব্দ-সাড়া উথিত হইতে লাগিল তাহা সত্যাকার নিদ্রার পক্ষে যে একান্ত বিঘ্নকর তাহা নিজেই উপলব্ধি করিয়া অপূৰ্ণ উষ্টিয়া বলিল। চোখ রগড়াইয়া হাই তুলিয়া কহিল, উঃ—এই রাত্রে আবার ফিরে আসতে হোলো!

ভারতী টানাটানি করিয়া একটা জানালা রুদ্ধ করিতেছিল, বলিল, যাবার সময় এ কথা বলে গেলেন না কেন? সরকার মশায়কে দিয়ে আপনার খাবারটা একেবারে আনিয়ে রেখে দিতাম।

কথা শুনিয়া অপূৰ্ণর ঘুম-ভাঙা গলার শব্দ একেবারে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তার মানে? ফিরে আসবার কথা আমি জানতাম না কি?

ভারতী লোহার ছিটকিনিটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সহজকণ্ঠে জবাব দিল, আমারই ভুল হয়েছে। খাবার কথাটা তখনি তাঁকে বলে পাঠানো উচিত ছিল। এত রাত্তিরে আর হাদ্ধা মা পোয়াতে হোতেনা। এতক্ষণ কোথায় দুজনে বসে কাটালেন?

অপূৰ্ণ কহিল, তাঁকেই জিজ্ঞেসা করবেন। ক্রোশ তিনেক পথ হাঁটার নাম বসে কাটানো কি না, আমি ঠিক জানিনে।

ভারতীর জানালা বন্ধ করার কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, ছিটের পদ্দাটা টানিয়া দিতেছিল, সেই কাজেই নিযুক্ত থাকিয়া বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বলিল, ইস, গোলকবাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন বলুন! হাঁটাই মার হল! এই বলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিল, সুক্কা-আহিক করা বালাই এখনো আছে না গেছে? থাকে ত কাগড়

দিকি ওগুলো সব ছেড়ে ফেলুন। এই বলিয়া সে অঞ্চলস্থ দাবী চাবির গোছা হাতে লইয়া একটা আলমারি খুলিতে খুলিতে কহিল, তেওয়ারী বেচারী ভেবে সারা হয়ে যাবে। আজ ত দেখিচি আফিস থেকে একবার বাসায় যাবারও সময় পাননি।

অপূর্ব রাগ চাপিয়া বলিল, অবশ্য আপনি এমন অনেক জিনিস দেখতে পান যা' আমি পাইনে তা' স্বীকার করছি, কিন্তু কাপড় বার করার দরকার নেই। সন্ধ্যা-আফিকের বালাই আমার যাযনি, এ-জন্মে যাবেও তা মনে হয়না, কিন্তু আপনার দেওয়া কাপড়েও তার সুবিধে হবে না। থাক, কষ্ট করবেন না।

ভারতী কহিল, দেখুন আগে কি দিই—

অপূর্ব বলিল, আমি জানি তবু কিয়া করদ। কিন্তু আমার প্রয়োজন নেই,—আপনি বার করবেন না।

সন্ধ্যা করবেন না?

না।

শোবেন কি পরে? আফিসের ওই কোট পেট্রোলিন স্থদ না কি?

হাঁ।

থাকেন না?

না।

সত্যি?

অপূর্বের কণ্ঠস্বরে বহুক্ষণ হইতেই তাহার সহজ স্বর ছিল না, এবার সে স্পষ্টই রাগ করিয়া কহিল, আপনি কি তামাসা করছেন না কি?

ভারতী মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, বলিল, তামাসা ত আপনিই করছেন। আপনার সাদ্য আছে না খেয়ে উপোস করে থাকেন?

এই বলিয়া সে আলমারির মধ্য হইতে একখানি স্থন্দর গরদের

শাড়ী বাহির করিয়া কহিল, একেবারে নিভাঁজ পবিত্র। আমিও কোন দিন পরিনি। ওই ছোট ঘরটায় গিয়ে কাপড় ছেড়ে আস্তান, নীচে কল আছে, আমি আলো দেখাচ্ছি, হাত-মুখ ধুয়ে ওইখানেই মনে মনে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নিন্। নিরুপায়ে এ ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে,—ভয়ঙ্কর অপরাধ কিছু হবে না।

হঠাৎ তাহার গলার শব্দ ও কথা বলার ভঙ্গী এমন বদলাইয়া গেল যে অপূর্ব্ খতমত খাইয়া গেল। তাহার দপ্ করিয়া মনে পড়িলু সেদিন ভোরবেলাতেও ঠিক যেন এমনি করিয়াই কথা কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। অপূর্ব্ হাত বাড়াইয়া আশ্বে আশ্বে বলিল, দিন্ না কাপড় আমি নিজেই আলো নিয়ে নৌচে যাচ্ছি। আমি কিন্তু যার-তার হাতে ভাত খেতে পারব না তা' বলে দিচ্ছি।

ভারতী নরম হইয়া কহিল, সরকার মশায় যে ভাল বামুন। গরিব লোক, হোটেল করেছেন, কিন্তু অনাচারী ন'ন। নিজে বাঁধেন, সবাই তাঁর হাতে গার,—কেউ আপত্তি করেনা—আমাদের ডাক্তারবাবুর খাবার পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকেই আসে।

তথাপি অপূরুর কুণ্ডা ঘুঁচিল না, বিরসমুখে কহিল, যা'-তা খেতে
আমার বড় ঘণা বোধ হয়।

ভারতী হাঙ্গল, কহিল, বা'-তা খেতে কি আমিই আপনাকে দিতে পারি? আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে দিয়ে ~~দেখতে~~ শুঁচিয়ে আনবো,—তাহ'লে ত আর আপত্তি হবেনা?—এই বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

অপূর্ব আর প্রতিবাদ করিল না, আলো এবং কাপড় লইয়া নীচে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া ভারতীর বুকিতে বাকি রহিল না যে সে হোটেলের অন্ন আহাৰ করিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ ও বিগ্ন অনুভব করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে অপূর্ণ যখন গরদের শাড়ী পরিয়া নীচের একটা কাঠের বেঞ্চে বসিয়া আঁহিকে নিযুক্ত, ভারতী দ্বার খুলিয়া একাকী অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল, বলিয়া গেল, সরকার মশায়কে লইয়া ফিরিয়া আসিতে তাহার বিলম্ব হইবে না, ততক্ষণ সে যেন নীচেই থাকে। বস্ত্তঃ ফিরিতে তাহার দেৱী হইল না। সেই মাত্র অপূর্ণের আঁহিক শেষ হইয়াছে, ভারতী আলো হাতে করিয়া অত্যন্ত সন্তপণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে তাহার সরকার মশায়, হাতে তাহার খাবারের থালা একটা বড় পিতলের গাম্ভা দিয়া ঢাকা, তাহার পিছনে আর একজন লোক জলের গ্লাস এবং আসন আনিয়াছে, সে ঘরের একটা কোণ ভারতীর নির্দেশমত জল ছিটাইয়া মুছিয়া লইয়া টাই করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ অন্ন-পাত্র রক্ষা করিলেন। সকলে প্রস্থান করিলে ভারতী কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া গলায় অঙ্কল দিয়া যুক্তকরে সবিনয়ে নিবেদন করিল, এ স্নেহের অন্ন নয়, সমস্ত খরচ ডাক্তারবাবুর! আপনি অসদ্বোধে আতিথ্য স্বীকার করুন।

কিন্তু তাহার এই সকৌতুক পরিহাসটুকু অপূর্ণ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে জাতি মানে, যে-সে লোকের ছোঁয়া খায় না, হোটেলের প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণে কিছুতেই তাহার রুচি হয় না,—কিন্তু তাই বলিয়া দামের পয়সাটা আজ স্নেহ দিল কি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ দিলেন এত গোঁড়ামিও তাহার ছিল না। বড় ভাইয়েরা তাহার শুদ্ধাচারিণী মাতাকে অনেক ছুঃখ দিয়াছে, ভাল হোক মন্দ হোক সেই মা'র আদেশ ও অন্তরের ইচ্ছাকে তাহার লঙ্ঘন করিতে অত্যন্ত রুঃ বাধ হয়। একথা ভারতী যে একেবারে জানেনা তাহাও নয়, অথচ, যখন-তখন তাহার এই আচার-নিষ্ঠাকেই লক্ষ করিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রুপ সৃষ্টি করার চেষ্টায় মন তাহার উত্তাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন জবাব না দিয়া সে আসনে আঁনিয়া বসিল, এবং আচ্ছাদন খুলিয়া আহায়ে প্রবৃত্ত হইল।

ভারতী সাবধানে সর্বপ্রকার স্পর্শ বাঁচাইয়া দূরে ভূমিতলে বসিয়া ইহাই তদারক করিতে গিয়া মনে মনে কুণ্ঠিত ও অতিশয় উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ক্রীশ্চান বলিয়া হোটেলের রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, এই গভীর রাত্রে, সকলের আহারান্তে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাই যে কোনমতে সংগ্রহ করিয়া সরকার মশায় হাজির করিয়াছিলেন ভারতী তাহা ভাবিয়া দেখে নাই। ঘরে যথেষ্ট আলোক ছিলনা, তথাপি আবরণ উন্মোচন করায় অন্ন-বাগানের যে মূর্তি প্রকাশিত হইল তাহাতে মুখে আর তাহার কথা রহিল না। অনেকদিন সে তাহাদের উপরের ঘর হইতে মেঝের ডিগ্রপথে এই লোকটির খাওয়ার ব্যাপার লুকাইয়া লক্ষ্য করিয়াছে, তেওয়ারীর ছোট-খাটো সামান্য কুঠীতে এই খুঁতখুঁতে মাল্‌বটির খাওয়া নষ্ট হইতে কতদিন ভারতী নিজের চোখে দেখিয়াছে, সে-ই যখন আজ নিঃশব্দে রানমুখে এই কদম ভোজনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কিছুতেই সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, থাক, থাক, ও আর খেয়ে কাজ নেই,—এ আপনি খেতে পারবেন না।

অপূর্ব বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, খেতে পারবনা ? কেন ?

ভারতী কেবলমাত্র মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, পারবেন না।

অপূর্ব প্রতিবাদ করিয়া তেমনি মাথা নাড়িয়া কহিল, না, বেশ পারবো, এহ বলিয়া সে ভাত ভাঙিবার উদ্যোগ করিতেই ভারতী উঠিয়া একেবারে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আপনি পারলেও আমি পারব না। জোর করে খেয়ে অস্থখ হলে এ বিদেশে আমাকেই ভুগে মরতে হবে। উঠুন।

অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কি খাবো তা'হলে ? আত্ম আবার তলওয়ারকর পর্য্যন্ত আকিসে আসেন নি,—

যা' পারি এই ছুটি না হয় খেয়ে নি ? কি বলেন ? এই বলিয়া সে এমন করিয়া ভারতীর মুখের প্রতি চাহিল যে তাহার অপরিদ্রা সম্মুখের কথা অপরের বুঝিতে আর লেশমাত্র বাকি রহিল না ।

ভারতী স্নানমুখে হাসিল ; কিন্তু মাথা নাড়িয়া বলিল, এ ছাই-পাঁশ আমি ঘরে গেলেও ত আপনাকে খেতে দিতে পারব না অপূর্ববাবু,— হাত ধুয়ে উপরে চলুন, আমি বসন্ত আর কোন ব্যবস্থা করছি ।

অরোপ অথবা আদেশ মত অপূর্ব শান্ত বাগানের মত হাত ধুইয়া উপরে উঠিয়া আসিল । মিনিট দশেকের মধ্যেই পুনরায় সেই সরকার মশায় এবং তাহার হোটেলের সহযোগীটি আসিয়া দেখা দিলেন । এবার ভাতের বদলে একজনের হাতে মুড়ির পাত্র এবং দুধের বাটি, অপরের হাতে সামান্য কিছু ফল ও জলের ঘটি, আয়োজন দেখিয়া অপূর্ব মনে মনে খুশি হইল । এইটুকু সময়ে এতখানি স্বেচ্ছা সে কল্পনাও করে নাই । তাহার চলিয়া গেলে অপূর্ব হৃষ্টচিত্তে আহারে মন দিল । দ্বারের বাহিরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ভারতী দেখিতেছিল, অপূর্ব কহিল, আপনি ঘরে এসে বসুন । কাঠের মেঝেতে দোম ধরতে গেলে আর বস্ত্রায় বাস করা চলে না !

ভারতী সেইখান হইতেই সহাগ্রে কহিল, বলেন কি ? আপনার মত যে একেবারে উদার হয়ে উঠল !

অপূর্ব কহিল, না, এতে সত্যি দোষ নেই । ভাক্তারবাবু বল্লেন চলুন, ফিরে যাই—আমিও ফিরে এলাম । এখানে যে মাতালের বন্ধ খুনোখুনি ব্যাপার হয়ে আছে সে কে জানতো ?

জানলে কি করতেন ?

জানলে ? অর্থাৎ,—আমার জগ্রে আপনাকে এত কষ্ট পেতে হবে জানলে আমি কখনো ফিরে আসতে রাজী হোতাম না ।

ভারতী কহিল, খুব সম্ভব বটে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনি নিজেই ইচ্ছে করে ফিরে এসেছেন।

অপূর্বর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কথখনো না! নিশ্চয় না! কাল বরঞ্চ আপনি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

ভারতী শান্তভাবে কহিল, এত জিজ্ঞাসা-পড়ারই বা দরকার কি? আপনার কথাই কি আর বিশ্বাস করা যায় না!

তাহার কণ্ঠস্বরের কোমলতা সত্ত্বেও অপূর্বর গা জলিয়া গেল। সে ফিরিয়া আসিতেই ভারতী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল তাহা স্বরণ করিয়া উত্তাপের সহিত বলিল, আমার মিথ্যে কথা বলা অভ্যাস নয়,— আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন।

ভারতী কহিল, আমিই বা বিশ্বাস না কোরব কেন?

অপূর্ব বলিল, তা জানিনে। যার যেমন স্বভাব। এই বলিয়া সে মুখ নীচু করিয়া আহারে মন দিল।

ভারতী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বলিল, আপনি মিথ্যে রাগ করছেন। ডাক্তারের কথায় না এসে নিজের ইচ্ছেয় ফিরে এলেই বা দোষ কি, তাই শুধু আপনাকে আমি বলছিলাম। এই যে তখন আপনি নিজে খুঁজে খুঁজে আমার এখানে এলেন তাতেই কি কোন দোষ হয়েছে?

অপূর্ব খাবার হইতে মুখ তুলিল না, বলিল, বিকালবেলা সন্ধ্যা নিতে আসা এবং ছপুঁররাত্রে বিনা কারণে ফিরে আসা ঠিক এক নয়।

ভারতী তৎক্ষণাৎ কহিল, নয়ই ত। তাহঁত আপনাকে জিজ্ঞেসা করছিলাম, একটু জর্নিয়ে গেলে ত এতখানি খাবার কষ্ট হতো না। সমস্তই ত ঠিক করে রাখা যেতে পারতো।

অপূর্ব নীরবে থাইতে লাগিল, উত্তর দিল না। খাওয়া যখন প্রায়

শেষ হইয়া আসিল, তখন হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, ভারতী সিন্ধু সকৌতুক দৃষ্টে তাহার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া আছে। কহিল, দেখুন ত খাবার কত কষ্টই হল!

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, আজ আপনার যে কি হয়েছে জানিনে, খুব সোজা কথাও কিছুতে বুঝতে পারচেন না।

ভারতী বলিল, আর এমনও ত হতে পারে খুব সোজা নয় বলেই বুঝতে পারচেন? বলিয়াই কিছু করিয়া হানিয়া ফেলিল।

এই হাসি দেখিয়া সে নিজেও হাসিল, তাহার সন্দেহ হইল, হয়ত ভারতী এতক্ষণ তাহাকে শুধু মিথ্যা আলাতন করিতেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে পড়িল, এমনিধারা সব ছোট-খাটো ব্যাপার লইয়া এই গুঠান মেয়েটি তাহাকে প্রথম হইতেই কেবল খোঁচা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, অথচ, ইহা বিদ্রোহ নয়, কারণ, যে-কোন বিপদের মধ্যে এতবড় নিঃসংশয় নির্ভরের স্থলও যে এই বনদেশে তাহার অত্র কোথাও নাই,—এ সত্যও ঠিক স্বতঃসিদ্ধের মতই হৃদয় তাহার চিরদিনের জগৎ একেবারে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

জলের গ্লাসটায় জল ফুরাইয়াছিল, শূন্য পাত্রটা অপূর্ব হাতে করিয়া তুলিতেই ভারতী বাস্ত হইয়া উঠিল, ঐ যাঃ—

আর জল নেই নাকি?

আছে বই কি! এটি বলিয়া ভারতী রাগ করিয়া কহিল, অত বেশী করলে কি আর মানুষের কিছু মনে থাকে? খাবার জলের ঘটটা শিবু নীচের টুলটার ওপর ভুলে রেখে এসেছে,—আমারও পোড়া কপাট এসে দেবিনী। এখন আর ত উপায় নেই, একেবারে আঁচিয়ে উঠেই যাবেন, কি বলেন? কিন্তু রাগ করতে পারবেন না বলে রাখছি।

অপূর্ব হানিয়া কহিল, এতে আর রাগ করবার কি আছে?

ভারতী আন্তরিক অন্ততাপের সহিত বলিল, হয় বৈ কি। খাবার

সময় তেষ্ঠার জল না পেলে ভারি একটা অতৃপ্তি বোধ হয়। মনে হয় যেন পেট ভরলো না। তাই বলে কিন্তু ফেলে রেখেও কিছু উঠলে চলবে না। আচ্ছা, যাবো চট করে শিবুকে ডেকে আনবো ?

অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া কহিল, এর জন্তে এই অন্ধকারে যাবেন ডেকে আনতে ? আমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই মনে করেন ?

তাহার খাওয়া শেষ হইয়াছিল, তথাপি সে জোর করিয়া আরও দুই চারি গ্রাম মুখে পুরিয়া অবশেষে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার নিজেরই কেমন যেন ভারি লজ্জা করিতে লাগিল। কহিল, বাস্তবিক বল্চি আপনাকে, আমার কিছুমাত্র অস্থবিধে হয়নি। আমি আঁচিয়ে উঠেই জল খাবো—আপনি গিথ্যে দুঃখ করবেন না।

ভারতী হাসিয়া জবাব দিল, দুঃখ করতে যাবো ? কথখনো না। আমি জানি দুঃখ করবার আমার কিছু নেই। এই বলিয়া সে আলোটা তুলিয়া ধরিয়া আর এক দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, আমি আলো দেখাচ্ছি, যান আপনি নীচে থেকে মুখ ধুয়ে আসুন। জলের বটীটা স্নমুখেই আছে,—যেন ভুলে আসবেন না।

অপূর্ব নীচে চলিয়া গেল। খানিক পরে মুখ হাত ধুইয়া উপরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ভুক্তাবশেষ পরাইয়া উচ্ছিষ্ট স্থানটা ভারতী ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করিয়াছে; দুই একটা চৌকি প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিয়া তাহার খাবার জায়গা করা হইয়াছিল, সেগুলো যথাস্থানে আনা হইয়াছে, এবং যে ইজি-চেয়ারটার সে ইতিপূর্বে বসিয়াছিল তাহারই এক পাশে ছোট টিপায়ার উপরে রেকাবিতে করিয়া স্থপারি এলাচ প্রভৃতি মশলা রাখা হইয়াছে। ভারতীর হাত হইতে তোয়ালে লইয়া মুখ হাত মুছিয়া মশলা মুখে দিয়া সে আরাম কদারায় বসিয়া পড়িল, এবং হেলান দিয়া তৃপ্তির গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া

কহিল, আঃ—এতক্ষণে দেহে যেন প্রাণ এল। কি ভয়ঙ্কর ক্ষিদেই না পেয়েছিল!

তাহার চোখের স্তম্ভ হইতে আলোটা সরাইয়া ভারতী একপাশে রাখিতেছিল, সেই আলোতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অপূর্ব ইঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, আপনার খুব সন্ধি হয়েছে দেখছি যে!

ভারতী বাতিটা তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল, কই, না।

না কেন! গলা ভারি, চোখ ফুলো-ফুলো, দিবা ঠাণ্ডা লেগেচে! এতক্ষণ খেয়ালই করিনি।

ভারতী জবাব দিল না। অপূর্ব কহিল, ঠাণ্ডা লাগার অপরাধ কি! এই রাস্তিরে যা ছুটোছুটি করতে হল!

ভারতী ইহারও উত্তর দিল না। অপূর্ব ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, ফিরে এসে নিরর্থক আপনাকে কষ্ট দিলাম। কিন্তু কে জানতো বলুন, ডাক্তারবাবু ডেকে এনে শেষে আপনাকে বোঝা টানতে দিয়ে নিজে সরে পড়বেন! ভুগতে হল আপনাকে।

ভারতী জানালার কাছে পিছন ফিরিয়া কি একটা করিতেছিল, কহিল, তাতো হোলই। কিন্তু ভগবান বোঝা টানতে দিলে আর নালিশ করতে যাবো কার বিরুদ্ধে বলুন?

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, তার মানে?

ভারতী তেমনি কাজ করিতে করিতেই বলিল, মানে কি ছাট আমিই জানি? কিন্তু দেখ্‌চি ত, বর্ম্মায় আপনি পা দেওয়া বোঝা টেনে বেড়াচ্ছি শুধু আমিই। বাবার সঙ্গে করলেন ঝগড়া, দণ্ড দিলাম আমি। ঘর পাহারা দিতে রেখে গেলেন তেওয়ারীকে, তার সেবা করে মলুম আমি। ডেকে আনলেন ডাক্তারবাবু, হাস্কামা পোহাতে হচ্ছে আমাকে। ভয় হয়, সারা জীবনটা না শেষে আমাকেই

আপনার বোঝা বয়ে কাটাতে হয়। কিন্তু রাত ত আর নেই, শোবেন কোথায় বলুন ত ?

অপূর্ব বিস্মিত হইয়া বলিল, বাঃ, আমি তার জানি কি ?

ভারতী কহিল, হোটেলের ডাক্তারবান্ধুর ঘরে আপনার বিছানা করতে বলে এসেছি, ব্যবস্থা বোধ হয় হয়েছে।

কে নিয়ে যাবে ? আমি ত চিনি নে।

আমিই নিয়ে যাবি, চলুন, ডাকাডাকি করে তাদের তুলিগে।

চলুন, বলিয়া অপূর্ব তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু সংকোচের সহিত কহিল, কিন্তু আপনার বালিশ এবং বিছানার চাদরটা আমি নিয়ে যাবো। অন্ততঃ, এ ছোটো আমার চাই-ই, পরের বিছানায় আমি মরে গেলেও শুতে পারবো না। এই বলিয়া সে শয্যা হইতে তুলিতে বাইতেছিল, ভারতী বাধা দিল। এতক্ষণে তাহার মলিন গভীর মুখ স্নিগ্ধ কোমল হাস্তে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সে তাহা গোপন করিতে মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে বলিল, এও তো পরের বিছানা অপূর্ববাবু, ঘুণা বোধ না হওয়াই ত ভারি আশংকা। কিন্তু তাই যদি হয়, আপনার হোটেলের শুতে যাবার প্রয়োজন কি, আপনি এই খাটেতেই শোন। এ কথাটা সে ইচ্ছা করিয়াই বলিল না যে মাত্র ঘণ্টাকয়েক পূর্বেই তাহার দেওয়া অন্তি বস্ত্রে ভগবানের উপাসনা করিতেও ঘুণা বোধ হইয়াছিল।

অপূর্ব অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, বলিল, কিন্তু আপনি কোথায় শোবেন ? আপনার ত কষ্ট হবে !

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, একটুও না। আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওই ছোট ঘরটায় যাহোক একটা কিছু পেতে নিয়ে আমি স্বচ্ছন্দে শুতে পারবো। শুধু কাঠের মেঝের উপরে হাতে মাথা রেখে তেওয়ারীর পাশে কত রাত্রি কাটাতে হয়েছে সে তো আপনি দেখতে পান নি ?

অপূর্ব একমাস পূর্বের কথা স্মরণ করিয়া বলিল, একটা রাত্রি আমিও দেখতে পেয়েছি, একেবারে পাইনি তা নয়।

ভারতী হাসিমুখে বলিল, সে কথা আপনার মনে আছে? বেশ, তেমনি ধারাই না হয় আর একটা রাত্রি দেখতে পাবেন।

অপূর্ব ক্ষণকাল অধোমুখে নীরবে থাকিয়া বলিল, তেওয়ারীর তখন ভয়ানক অস্থখ,—কিন্তু এখন লোকে কি মনে করবে?

ভারতী জবাব দিল, কিছুই মনে করবে না। কারণ পরের কথা নিয়ে নিরর্থক মনে করবার মত ছোট মন এখানে কারও নেই।

অপূর্ব কহিল, নীচের বেঞ্চে বিছানা করেও ত আমি অনায়াসে শুতে পারি?

ভারতী বলিল, আপনি পারলেও আমি তা দেব না। কারণ, তার দরকার নেই। আমি আপনার অস্পৃশ্য, আপনার দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হতে পারে এ ভয় আমার নেই।

অপূর্ব আবেগের সহিত কহিল, আমার দ্বারা কখনো আপনার নেশমাত্র অনিষ্ট হতে পারে এ ভয় আমারও নেই। কিন্তু আপনাকে অস্পৃশ্য বললে আমার সব চেয়ে বেশি দুখে হয়। অস্পৃশ্য কথার মধ্যে ঘৃণার ভাব আছে, কিন্তু আপনাকে ত আমি ঘৃণা করিনে। আমাদের জাত আলাদা, আপনার ছোঁয়া আমি পেতে পারি নে, কিন্তু তার হেতু কি ঘৃণা? এত বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। বরঞ্চ এর জগে আপনিই আমাকে মনে মনে ঘৃণা করেন। সেদিন ভোরবেলার এখন আমাদের অকূল সমুদ্রে ফেলে রেখে চলে আসেন, তখনকার মুখের চেহারা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, সে আমি জীবনে ভুলব না!

ভারতী বলিল, আমার আর বাই কেননা ভুলব সে অপরাধ ভুলবেন না!

কখনও না।

সে মুখে আমার কি ছিল ? ঘৃণা ?

নিশ্চয় !

ভারতী তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, অর্থাৎ, মানুষের মন বোঝবার বুদ্ধি আপনার ভয়ানক খুস্ম,— আছে কি নেই ! কিন্তু আর কাজ নেই আপনি শোন । আমার রাত জাগার অভ্যাস আছে, কিন্তু আপনি আর বেশি জেগে থাকলে আমারই হয়ত বিপদের অবধি থাকবে না । এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের আর অবকাশ না দিয়া র্যাকের উপর হইতে গোটা দুই কঞ্চল পাড়িয়া লইয়া পাশের ছোট ঘরের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল ।

অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া মশারি ফেলিয়া চারিদিক ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া ভারতী চলিয়া গেল, কিন্তু অপূর্বর নিম্নলিখিত চোখের কোণে ঘূমের ছায়াপাতটুকুও হইল না । ঘরের এক কোণে আড়াল-করা আলোটা মিট মিট করিয়া জলিতেছে, বাহিরে গভীর অন্ধকার, রাত্রি তন্দ্র হইয়া আছে,—হয়ত, সে ছাড়া কোথাও কেহ জাগিয়া নাই, কখন যে ঘুম আসিবে তাহার কোন হিবতা নাই, তবুও এই জাগরণের মধ্যে নিদ্রাবিহীনতার বিন্দুমাত্র অস্থিতিও সে অনুভব করিল না । তাহার সকল দেহ মন যেন বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতে লাগিল এই ঘরে, এই শয্যায়, এই নীরব নিশীথে ঠিক এমনি চুপ করিয়া শুইয়া থাকার মত সুন্দর বস্তু আর দ্বিত্বনে নাই । এমন একান্ত ভাবনা-হীন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের আনন্দ সে যেন আর কখনও পায় নাই,— তাহার এমনি মনে হইতে লাগিল ।

সকালবেলায় তাহার ঘুম ভাঙিল ভারতীর ডাকে । গেথ মেলিয়াই দেখিল সন্মুখে তাহার পায়ে কাছে দাঁড়াইয়া এই মেয়েটি, পূর্বের জানালা দিয়া প্রভাত সূর্য্যের রাজ্য আলো তাহার সজ্জাত ভিজা চুলের উপরে, তাহার পরনের শাদা গরদের রাজা পাড়টুকুর উপরে,

তাহার সুন্দর মুখখানির স্নিগ্ধ শ্রাম রঙের উপরে পড়িয়া একেবারে যেন অপক্লপ হইয়া অপূর্বর চোখে ঠেকিল।

ভারতী কহিল, উঠুন, আবার আফিসে যেতে হবে ত!

তাঁতো হবেই, বলিয়া অপূর্ব শয্যা ত্যাগ করিল। আপনার ত দেখ্‌চি স্নান পর্য্যন্ত সারা হয়ে গেছে।

ভারতী কহিল, আপনাকেও সমস্ত তাড়াতাড়ি সেয়ে নিতে হবে। কাল অতিথি সংকারে যথেষ্ট ক্রটি হয়েছে, আজ আমাদের প্রেসিডেন্টের আদেশ, আপনাকে ভাল করে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়া হবে না।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, কালকের সেই মেয়েটি বেঁচেছে?

তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে,—বাঁচবে বলেই আশা।

মেয়েটিকে অপূর্ব চোখেও দেখে নাই, তথাপি তাহারই সুখবরে মন যেন তাহার পরম লাভ বলিয়া গণ্য করিল। আজ কাহারও কোন অকল্যাণ সে যেন সহিতেই পারিবে না তাহার এমনি জ্ঞান হইল।

সে স্নান আফ্রিক দারিয়া কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া যখন উপরে আসিল তখন বেলা প্রায় নয়টা। ইতিমধ্যে ঠাই করিয়া সরকার মশায় খাবার রাখিয়া গেছেন, অপূর্ব আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কই, আপনাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ত দেখা হল না। তাঁর অতিথি-সংকারের বৃষ্টি এই রীতি?

ভারতী বলিল, আপনার যাবার আগে দেখা হবে বই কি। তাঁর আপনার সঙ্গে বোধ করি একটু কাজও আছে।

অপূর্ব কহিল, আর ভাঙারবার? বিনি আমাকে ডেকে এনে? এখনো বোধ হয় তিনি বিছানাতেই পড়ে? এই বলিয়া হাসিল।

ভারতী এ হাসিতে যোগ দিল না, কহিল, বিছানায় পড়বার তাঁর সময়ই হয়নি। এই ত হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। শোওয়া না শোওয়া কোনটার কোন মূল্যই তাঁর কাছে নেই।

অপূর্ব আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এতে তাঁর অস্থখ করেনা ?

ভারতী বলিল, কখনো দেখিনে ত। স্থখ অস্থখ দুই-ই বোধ হয় তাঁর কাছে হার মেনে পালিয়েছে। মাল্লবের সঙ্গেই তাঁর তুলনা হয় না।

অপূর্বর কাল রাত্রের অনেক কথাই শ্রবণ হইল, মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, আপনারা সকলেই বোধ হয় তাঁকে অতিশয় ভক্তি করেন ?

ভক্তি করি ? ভক্তি ত অনেকেই অনেককে করে। বলিতে বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ গাঢ় হইয়া উঠিল, কহিল, তিনি চলে গেলে মনে হয় পথের ধুলোয় পড়ে থাকি, তিনি বৃকের ওপর দিয়ে হেঁটে যান। মনে হয়, তবুও আশ মেটে না অপূর্ববাবু। বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া চট্ করিয়া চোখের কোণ দুটা মুছিয়া ফেলিল।

অপূর্ব আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, নতমুখে নিঃশব্দে আহাৰ করিতে লাগিল। তাহার এই কথাটাই বার বার মনে হইতে লাগিল স্মিত্রা ও ভারতীর মত এতবড় শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী নারী-হৃদয়ে যে-মাল্লব এতখানি উচ্চ সিংহাসন গড়িয়াছে জানিনা ভগবান তাহাকে কোন্ ধাতু দিয়া তৈরি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন! কোন্ অসাধারণ কার্য্য তাহাকে দিয়া তিনি সম্পন্ন করাইয়া লইবেন।

দূরে দরজার কাছে ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অপূর্ব নিজেও বিশেষ কোন কথা কহিল না, অতঃপর খাওয়াটা তাহার এক প্রকার নিঃশব্দেই সমাধা হইল। অপ্রীতিকর কোন কিছুই ঘটে নাই, তথাপি যে প্রভাতটা আজ তাহার বড় মিষ্ট হইয়া শুরু হইয়াছিল, অকারণে কোথা হইতে যেন তাহার উপরে একটা ছায়া আসিয়া পড়িল।

আফিসের কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে কহিল, চলুন, ডাক্তার বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

চলুন, তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সরকার মহাশয়ের জরা-জীর্ণ হোটেল বাড়ীর একটা অত্যন্ত ভিতরের দিকের ঘরে ডাক্তারবাবুর বাসা। আলো নাই, বাতাস নাই, আশে-পাশে নোংরা জল জমিয়া একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছে, অতিশয় পুরাতন তক্তার মেঝে, পা দিতে ভয় হয় পাছে সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়ে, এমনি একটা কদম্ব্য বিগ্রী ঘরে ভারতী যখন তাকে পথ দেখাইয়া আনিল, তখন বিশ্বাসের আর অবশিষ্ট রহিল না। ঘরে ঢুকিয়া অপূর্ব ক্ষণকাল ত ভাল দেখিতেই পাইল না।

ডাক্তারবাবু অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আসুন অপূর্ববাবু।

উঃ—কি ভীষণ ঘরই আপনি আবিস্কার করেছেন ডাক্তারবাবু।

কিন্তু কি রকম সস্তা বলুন ত! মাসে দশ আনা ভাড়া।

অপূর্ব কহিল, বেশি, বেশি, ঢের বেশি। দশ পয়সা হওয়া উচিত।

ডাক্তার কহিলেন, আমরা দুঃখী লোকেরা সব কি রকম থাকি আপনাদের চোখে দেখা উচিত। অনেকের কাছে এই আবার রাজপ্রসাদ।

অপূর্ব কহিল, তা'হলে প্রাসাদ থেকে ভগবান যেন আমাকে চিরদিন বঞ্চিত রাখেন! বাপ্‌রে বাপ্‌!

ডাক্তার বলিলেন, শুনলাম কাল রাতে আপনার বড় কষ্ট হয়েছে অপূর্ববাবু, আমাকে ক্ষমা করতে হবে।

অপূর্ব কহিল, ক্ষমা কোরব শুধু আপনি এ ঘর ছাড়লে। তার আগে নয়।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটু হাসিলেন, বলিলেন, আ, তাই হবে।

এতক্ষণ অপূর্ব নজর করে নাই, হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া দেখিতে পাইল, দেওয়ালের কাছে একটা মোড়ার উপরে বসিয়া সুমিত্রা। আপনি এখানে? আমাকে মাপ করবেন, আমি একেবারে দেখতে পাইনি।

সুমিত্রা কহিলেন, সে অপরাধ আপনার নয় অপূর্ববাবু, অন্ধকারের।

অপূর্ববাবু বিষয়ের সীমা রহিল না, তাঁহার গলা শুনিয়া। সে কণ্ঠস্বর যেমন কক্ষণ, তেমনি বিষণ্ণ। কি একটা ঘটিয়াছে বলিয়া যেন তাহার ভয় করিতে লাগিল। ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া আস্তে আস্তে কহিল, ডাক্তারবাবু, এ আপনার আজ কি রকম পোষাক? কোথাও কি বার হচ্ছেন?

ডাক্তারের মাথায় পাগড়ী, গায়ে লম্বা কোট, পরণে ঢিলা পায়জামা, পায়ে রাঙলপিণ্ডির নাগুরা, একটা চামুড়ার ব্যাগে কি কতকগুলো বাণ্ডিল বাঁধা। কহিলেন, আমি ত এখন চল্টি অপূর্ববাবু, এঁরা সব রইলেন, আপনাকে দেখতে হবে। আপনাকে এর বেশি বলার আমি আবশ্যক মনে করিনে।

অপূর্ববাবু হইয়া কহিল, হঠাৎ চল্টি কি রকম? কোথায় চল্টি?

এই ডাক্তার লোকটির কণ্ঠস্বরে ত কোন পরিবর্তন হয় না, তেমনি সহজ, শান্ত, স্বাভাবিক গলায় বলিলেন, আমাদের অভিধানে কি ‘হঠাৎ’ শব্দ থাকে অপূর্ববাবু? চল্টি সম্প্রতি ভানোর পথে আরও কিছু উত্তরে। কিছু সাক্ষা জরির মাল আছে, সিপাইদের কাছে বেশ দামে বিক্রী হয়। এই বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

সুমিত্রা এতক্ষণ কথা কহে নাই, সহসা বলিয়া উঠিল, তাদের পেশোয়ার থেকে একেবারে ভানোয় সরিয়ে এনেচে, তুমি জানো তাদের ওপর এখন কি রকম কড়া নজর। তোমাকেও অনেকে চেনে, কখনো ভেবোনা সকলের চোখেই তুমি ধুলো দিতে পারবে। এখন কিছুদিন কি না গেলেই নয়? শেষের দিকে তাহার গলাটা ক্রমে অদ্ভুত শুনাইল।

ডাক্তার মুহূর্ত হাসিয়া কহিলেন, তুমি ত জানো না গেলেই নয়।

স্বমিত্রা আর কথা कहিলেন না, কিন্তু অপূর্ব ব্যাপারটা একেবারে চক্ষের পলকে বুঝিতে পারিল। তাহার চোখ ও দুই কান গরম হইয়া সর্বদা দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, ধরুন যদি তারা কেউ চিন্তেই পারে? যদি ধরে ফেলে?

ডাক্তার कहিলেন, পরে ফেললে বোঝ হয় ফাঁসিই দেবে। কিন্তু দশটার ট্রেনের আর ত সময় নেই অপূর্ববাবু, আমি চোললাম। এই বলিয়া তিনি ট্রাপে বাধা মন্ত বোঝাটা অবলীলাক্রমে পিঠে ফেলিয়া চামড়ার ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইলেন।

ভারতী একটি কথাও কহে নাই, একটি কথাও कहিল না, শুধু পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। স্বমিত্রাও প্রণাম করিল, কিন্তু সে পায়ের কাছে নয়, একেবারে পায়ের উপরে। হঠাৎ মনে হইল সে বুঝি আর উঠিবে না, এমনি করিয়া পড়িয়াই থাকিবে—বোঝ হয় মিনিট খানেক হইবে,—যখন সে নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন স্বল্ললোকিত সেই ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে তাহার আনত মুখের চেহারা দেখিতে পাওয়া গেল না।

ডাক্তার ঘরের বাহিরে আসিয়া অপূর্বের হাতখানি গত রাত্রির মতো মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া कहিলেন, চললাম অপূর্ববাবু,—আমি সব্যসাচী।

অপূর্বের মুখের ভিতরটা শুকাইয়া মক্কাভূমি হইয়া গিয়াছিল, তাহা গলা দিয়া স্বর ফুটিল না, কিন্তু সে চক্ষের পলকে হাঁটু পাতিয়া তাহার পায়ের কাছে মেয়েদের মতই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ডাক্তার মঞ্চায় তাহার হাত দিলেন, আর একটা হাত ভারতীর মাথায় দিয়া অক্ষুণ্ণে কি বলিলেন শোনা গেল না, তাহার পরে একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেলেন।

অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, ভারতীর পাশে সে একাকী দাঁড়াইয়া আছে, পিছনে সেই ভাঙা ঘরের রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে কর্তব্যকঠিন, অশেষ বুদ্ধিশালিনী, পথের-দাবীর ভয়-লেশ-হীনা তেজস্বিনী সভানেত্রী কি যে কষ্টে লাগিলেন তাহার কিছুই জানা গেল না।

(১৪) .

ভারতী ও অপূর্ব দুজনেই পিছনের বন্ধ দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কেহই কোন কথা কহিল না। অপূর্ব কিছুই না বুঝিয়াও এটুকু বুঝিল যে, এমন করিয়া যে লোক নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করিয়া রাখিল তাহার সম্বন্ধে কোতূহলী হইতে নাই। উভয়ে নীরবে হোটেলের বাহিরে আসিতে ভারতী কহিল, চলুন অপূর্ববাবু, আমরা ঘরে যাই—

কিন্তু, আমার যে আবার আফিসের বেলা—

রবিবারেও আফিস?

রবিবার? তাই ত বটে! অপূর্ব থুসি হইয়া বলিল, একথা সকালে মনে হলে নাওয়া-খাওয়ার জন্তে আর ব্যস্ত হতে হোতো না। আপনার এত জিনিষ মনে থাকে, কিন্তু এটুকু ভুলে গিয়েছিলেন।

ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, তা' হবে। কিন্তু কাল রাতে আপনার না-খাওয়ার কথাটা ভুলি নি।

অপূর্ব হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমার দেবী করবার যো নেই, তেওয়ারী বেচারী হয়ত ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে।

ভারতী বলিল, যাচ্ছে না তার কারণ, আপনি জাগবার পূর্বেই সে খবর পেয়েছে আপনি কুশলে আছেন।

সে জানে আমি আপনার কাছে আছি?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানে। ভোরবেলাতেই আমি লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।

এই সম্বাদ শুনিয়া অপূর্ব শুধু নিশ্চিন্ত নয়, তাহার মনের উপর

হইতে একটা সত্যকার বোঝা নামিয়া গেল। কাল রাত্রে ফিরিবার পথে, ফিরিয়া আসিয়া, খাওয়া শোয়া, সকল কাজে সকল কথার মধ্যে এই ভাবনাই বহুবার তাহাকে ধাক্কা মারিয়া গেছে, কি জানি, কাল সকালে তেওয়ারী বাটা তাহার কথা বিশ্বাস করিবে কি না। এই বর্ষাদেশের কতপ্রকার জনশ্রুতিই না প্রচলিত আছে,—হয়ত, বাড়ীতে মায়ের কাছে কি একটা লিখিয়া দিবে, না হয়ত, ফিরিয়া গিয়া গল্প করিবে,—পাকা কালীর মত, কালী গেলেও যাহার দাগ মুছিবে না— এই তুচ্ছ বস্তুটাই ছোট্ট কাঁটার মত তাহার পায়ে ক্ষতি পদক্ষেপেই খচ্খচ্ করিতেছিল। এতক্ষণ পরে সে যেন নির্ভয়ে পা ফেলিয়া বাঁচিল। তেওয়ারী আর বাহাই ককক ভারতীর মুখের কথা সে মরিয়া গেলেও অবিশ্বাস করিবে না। যে ছাড়-পত্র ভারতী লিখিয়া দিয়াছে তাহার চেয়ে নিশ্চলস্ততার বড় দলিল তেওয়ারীর কাছে যে আর নাই, অপূর্ব তাহা ভাল করিয়াই জানিত। পুলকিতচিত্তে কহিল, আপনাতঃ সকল দিকে চোখ আছে। বাড়ীতে বৌদিদিদেরও দেখেছি, অল্প সব মেয়েদেরও দেখেছি, আমার মাকেও দেখেছি, কিন্তু এমন সর্ব দিকে দৃষ্টি আমি কাউকে দেখি নি। বাস্তবিক বল্চি, আপনি যে বাড়ীর গৃহিণী হবেন সে বাড়ীর লোকেরা চোখ বুজে দিন কাটয়ে দেবে, কখনো কাউকে দুঃখ পেতে হবে না।

ভারতীর মুখের উপর দিয়া যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। অপূর্ব ইহার কিছুই দেখিল না, সে পিছনে আসিতেছিল, পিছনে ইতেই পুনরায় কহিল, এই বিদেশে আপনি না থাকলে আমার কি হত বলুন। সমস্ত চুরি যেত, তেওয়ারী হয়ত ঘরেই মরে থাকতো,—বামনের ছেলেকে মেথর মুদ্রফরাসে টানা হেঁচড়া কোরত,—এই ভয়ানক সম্ভাবনায় তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া গেল। একটু থামিয়া কহিল,—আমিই কি আর থাকতে পারতাম? চাকরি ছেড়ে দিয়ে হয়ত চলে

যেতে হোতো, তারপরে আবার যা'-কে তাই। সেই বউদিদিদের গজনা আর মায়ের চোখের জল। আপনিই ত সব। সমস্ত বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

ভারতী বলিল, অথচ, এসেই আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন।

অপূর্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সমস্ত ওই তেওয়ারী ব্যাটার দোষ। কিন্তু, মা এসব জ্বলে আপনাকে যে কত অশীর্বাদ করবেন তা আপনি জানেন না।

ভারতী কহিল, কেমন করে জানবো? মা এলেই ত তবে তাঁর মুখ থেকে শুন্তে পাবো!

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া বলিল, মা আসবেন বর্ষায়? আপনি বলেন কি?

ভারতী জোর দিয়া কহিল, কেন আসবেন না,—কত লোকেরই ত মা নিত্য আসছেন। এখানে এলেই কি কারও জাত যেতে পারে নাকি?

অপূর্ব ঘরে ঢুকিয়া সেই আরাম চৌকিটাতেই পুনরায় আসিয়া বসিল। পাশের জানালা দিয়া তাহার মুখে রোদ লাগিতেই ভারতী হাত বাড়াইয়া বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, বৌদিদিরা মাকে তেমন বহু করেন না, এবং আপনাকে চিরকাল যদি বিদেশে চাকরি করেই কাটাতে হয়, এ বয়সে তাঁর সেবা কে করবে বলুন ত?

অপূর্ব কহিল, মা বলেন ছোট বৌ এসে তাঁর সেবা করবে।

ভারতী বলিল, আর সে যদি সেবা না করে? আপনি থাকবেন বিদেশে, বড় জায়েদের দেখে সে যদি তাঁদের মতই হয়ে দাঁড়ায়, মাকে বহু না করে কষ্ট দিতেই শুরু করে, কি করবেন বলুন ত?

অপূর্ব ভীত হইয়া কহিল, সে রকম কথখনো হবে না। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশ থেকে এসে কিছুতেই মাকে দুঃখ দিতে পারবে না, আপনাকে আমি নিশ্চয় বল্চি।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশ? এই বলিয়া ভারতী মুচকিয়া শুধু একটু হাসিয়া কহিল, এখন থাক্, যদি প্রয়োজন হয় ত সে গল্প আপনার কাছে অল্প একদিন বোরব। ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কেবল মাত্র মায়ের সেবা করবার জগাই থাকে বিবাহ করে' আপনি ফেলে আসবেন, তাতে কি তার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে না?

অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্বীকার করিয়া বলিল, তা' হবে।

ভারতী কহিল, এবং সেই অবিচারের বদলে তার কাছ থেকে নিজে স্তুবিচার দাবী করবেন?

অপূর্ব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে আশ্তে আশ্তে বলিল, কিন্তু এ ছাড়া আর আমার উপায় কি ভারতী?

ভারতী কহিল, উপায় না থাকতে পারে, কিন্তু এ অসম্ভব আপনি অতি বড় নিষ্ঠাবানের ঘর থেকেও প্রত্যাশা করবেন না। এর ফল কখনো ভাল হবে না। আপনার নিষ্ঠুরতার বদলে যতই সে নিজের কর্তব্য পালন করবে, ততই তার কাছে আপনি ছোট হয়ে যাবেন! স্ত্রীর কাছে অশ্রদ্ধেয়, হীন হওয়ার চেয়ে বড় দুর্ভোগ সংসারে আর নেই অপূর্ববাবু!

কথাটা এতবড় সত্য যে অপূর্ব নিরস্তর হইয়া রহিল। শাস্ত্রমতে স্ত্রীর কর্তব্য কি, পতিব্রতা কাহাকে বলে, নিষেধার্থ শাস্ত্রী-সেবার কতখানি মাহাত্ম্য, স্বামীর ইচ্ছামাত্র পালন করায় কিরূপ পুণ্য ইত্যাদি নানাবিধ উপাখ্যান বন্ধুসহলে আধুনিকতার বিকক্ষে লড়াই করিয়া কালে সে শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে নিজের স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া তাহাদে এক করিয়া দিয়াছে, কিন্তু এই স্থানে মেয়েটির সম্মুখে তাহার আভাবমাত্রও উচ্চারণ করিতে তাহার মুখ ফুটিল না। থানিক পরে সে কতকটা যেন আপনাকে আপনি বলিল, বাস্তবিক, আজকালকার দিনে এ রকম মেয়ে বোধ হয় কেউ নেই।

ভারতী হাসিল, কহিল, একেবারে কেউ নেই তা' কেমন করে বলবেন? নিষ্ঠাবানের ঘরে না থাকলেও হয়ত, আর কোথাও কেউ থাকতে পারে যে আপনার জন্তে নিজেকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে পারে, কিন্তু তাকে আপনারা খুঁজে পাবেন কোথায়?

অপূর্ণ নিজের চিন্তাতেই ছিল, ভারতীর কথায় মন দেয় নাই, কহিল, সে তো বাটাই।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে বাড়ী যাবেন?

অপূর্ণ অগমনঙ্কের মতই জবাব দিল, কি জানি, মা কবে চিঠি লিখে পাঠাবেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিতে লাগিল, বাবার সঙ্গে মতের অমিল নিয়ে মা আমার কোনদিন জীবনে স্তব্ধ ভোগ করেন নি। সেই মাকে একলা ফেলে রেখে আস্তে আমার কিছুতে মন সরে না। কি জানি, এবার গেলে আর ফিরে আসতে পারবো কি না। ইহাং ভারতীর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল, দেখুন, বাইরে থেকে দেখতে আমাদের সামান্যিক অবস্থা বতই সচ্ছল হোক ভিতরে কিন্তু বড় অনটন! সহরে অধিকাংশ গৃহস্থেরই এমনি দশা! বৌদিদিরা যে-কোন দিন আমাদের পৃথক করে দিতে পারেন। আমি ফিরে যদি না আসতে পারি ত আমাদের কষ্টের হয়ত সীমা থাকবে না।

ভারতী বলিল, আপনাকে আস্তেই হবে।

মায়ের কাছ থেকে চিরদিন আলাদা হয়ে থাকবো?

তাকে রাজী করে সঙ্গে নিয়ে আসুন। আমি নিশ্চয় জানি, তিনি আসবেন।

অপূর্ণ হাসিয়া কহিল, কথ'খনো না। মাকে আপনি জানেন না। আচ্ছা, ধরুন যদি তিনি আসেন, তাকে দেখবে কে এখানে?

ভারতীও হাসিয়া কহিল, আমি দেখবো।

আপনি? আপনি ঘরে ঢুকলেই ত মা হাঁড়ি ফেলে দেবেন

ভারতী জবাব দিল, কতবার দেবেন? আমি রোজ রোজ ঘরে ঢুকবো। দুজনেই হাসিয়া উঠিল। ভারতী সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, আপনি নিজেও ত ওই হাঁড়ি-ফেলার দলে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে দিলেই যদি সব ল্যাঠা চুকে যেতো, পৃথিবীর সমস্তা তাহলে খুব সোজা হয়ে উঠতো। বিশ্বাস না হয় তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

অপূর্ব স্বীকার করিয়া কহিল, তা' সত্য। সে বেচারী হাঁড়ি ফেলবে বাটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে তার জলও পড়বে। আপনাকে সে এত ভক্তি করে যে, একটু জপালে হয়ত সে ক্রীষ্টান হতেও রাজী হয়ে পড়ে, বলা যায় না।

ভারতী কহিল, সংসারে কিছুই বলা যায় না। চাকরের কথাও না, মনিবের কথাও না। এই বলিয়া সে হাসি গোপন করিতে যখন মূখ নীচ করিল, তখন অপূর্বর নিজের মুখখানা একেবারে আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, সংসারে এটুকু কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে চাকর ও মনিবের বুদ্ধির তারতম্য থাকতে পারে।

ভারতী মুখ তুলিয়া কহিল, আছেই ত। সেই জন্ত তার রাজী হতে দেবী হতে পারে, কিন্তু আপনার হবে না। তাহার চোখের দৃষ্টি চাপা-হাসির বেগে একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, অপূর্ব পরিহাস ভুর্বাতে পারিয়া খুসি হইয়া কহিল, আচ্ছা তামানা নয়, বাস্তবিক বল্চি, আমি ধর্ম ত্যাগ করতে পারি এ আপনি ভাবতে পারেন?

ভারতী কহিল, পারি।

সত্যি পারেন?

সত্যিই পারি।

অপূর্ব কহিল, অথচ, সত্যিই আমি প্রাণ গেলেও পারিনে।

ভারতী বলিল, প্রাণ যাক্কা যে কি জিনিস সে তো আপনি জানেন না। তেওয়ারী জানে। কিন্তু, এ নিয়ে তর্ক করে আর কি হবে,

আপনার মত অন্ধকারের মানুষকে আলোতে আনার চেয়ে ঢের বেশি জরুরি কাজ আমার এখনো বাকি। আপনি বরঞ্চ একটু ঘুমোন।

অপূর্ব বলিল, দিনের বেলায় আমি ঘুমুই নে। কিন্তু জরুরি কাজটা আবার আপনার কি?

ভারতী কহিল, আপনার বেগার খেটে বেড়ানোই আমার একমাত্র জরুরি কাজ নাকি? আমাকেও দুটি রোঁধে খেতে হয়। ঘুমুতে না পারেন আমার সঙ্গে নৌচে চলুন। আমি কি কি রাঁধি কেমন করে রাঁধি দেখেবন। হাতে যখন একদিন খেতেই হবে তখন একেবারে অনভিজ্ঞ থাকা ভাল নয়। এই বলিয়া সে সহসা থিল্ থিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অপূর্ব কহিল, আমি মরে গেলেও আপনার হাতে থাকো না।

ভারতী বলিল, আমি বেঁচে থেকে থাকার কথাই বল্চি। এই বলিয়া সে হাসিমুখে নীচে নামিয়া গেল।

অপূর্ব ডাকিয়া কহিল, আমি তা'হলে এখন বাসায় যাই,—তেওয়ারী বেচারী ভেবে সারা হয়ে বাসে। এই বলিয়া সে কিয়ৎকাল জবাবের জন্য উৎকর্ষ হইয়া থাকিয়া অবশেষে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িল। হয়ত, সে শুনিতো পায় নাই, হয়ত, শুনিয়াও উত্তর দেয় নাই, কিন্তু ইহাই বড় সমস্যা নয়; বড় সমস্যা এই যে, তাহার অবিলম্বে বাসায় যাওয়া উচিত। কোন অজুহাতেই আর দেরী করা সাজেনা। জ্বাখ, ভিতর হইতে যাওয়ার তাগিদ যতই অনুভব করিতে লাগিল, ততই কিন্তু দেহ যেন তাহার অলস শিথিল হইয়া আশিতে লাগিল। শেষকালে সেই বড় চেয়ারের উপরেই মুখের উপর হাত চাপা দিয়া অপূর্ব ঘুমাইয়া পড়িল।

(১৫)

বেলা যে যায়! উঠুন!

অপূর্ব চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। দেয়ালের ঘড়ির প্রতি চাহিয়া কহিল, ইস্! তিন-চার ঘণ্টার কম নয়! আমাকে তুলে দেননি

কেন ? বাঃ—মাথায় একটা বালিশ পর্য্যন্ত কখন দিয়ে দিয়েছেন। এতে কি আর কারও ঘুম ভাঙে !

ভারতী কহিল, ঘুম ভাঙবার হলে তখনি ভাঙতো। এটা না দিলে মাঝে থেকে ঘাড়ে শুধু একটা ব্যথা হতো। যান, মুখ-হাত ধুয়ে আছেন, সরকার মশায় জলখাবারের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন,— তাঁর ঢের কাজ, একটু চটপট করে তাঁকে ছুটি দিন।

ঘাবের বাহিরে যে লোকটি দাঁড়াইয়াছিল, মুখ বাড়াইয়া সে তাহার অরা নিবেদন করিল।

নীচে হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া অপূর্ব খাবার খাইয়া সুপাশি, এলাচ প্রভৃতি মুখে দিয়া কুঠিচিন্তে কহিল, এবার আমাকে ছুটি দিন, আমি বাসায় যাই।

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, সেটি হবে না। তেওয়ারীকে খবর দিয়েচি যে আফিসের ফেরত কাল বিকালে আপনি বাসায় যাবেন, এবং খবর নিয়েচি যে সে সুস্থ দেহে, বহাল তব্বিতে ঘর আগ্লাঞ্চে,—কোন চিন্তা নাই।

কিন্তু কেন ?

ভারতী বলিল, কারণ সম্প্রতি আপনি আমাদের অভিভাবক। আজ সুমিহাদিদি অসুস্থ, নবতারা গেছেন অতুলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ওপারে, আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। আপনার প্রতি প্রেসিডেন্টের এই আদেশ। শুই ধুতি এনে রেখেচি, পরে নিয়ে চলুন।

কোথায় যেতে হবে ?

মজুরদের লাইনের ঘরে। অর্থাৎ, বড় বড় কারখানার ক্লাব পতি মালিকেরা ওয়ার্কমেনদের জগ্গে লাইনবন্দী যে সব নরকবৃত্ত ভৈরী করে দিয়েছে সেইখানে। আজ রবিবারে ছুটির দিনেই সেখানে কাজ।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সেখানে কেন ?

ভারতী উত্তর দিল, নইলে, পথের-দাবীর সত্যিকারের কাজ কি এই ঘরে হতে পারে? একটু হাসিয়া কহিল, আপনি এ সভার মাতঙ্গর সভা, সরজমিনে না গেলে ত কাজের ধারা বুঝতে পারবেন না, অপূর্ববাবু।

চলুন, বলিয়া অপূর্ব আফিসের পোষাক ছাড়িয়া মিনিট পাঁচেকের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া লইল।

ভারতী আলমারি খুলিয়া কি একটা বস্ত্র লুকাইয়া তাহার জামার পকেটে রাখিতে অপূর্ব দেখিতে পাইয়া কহিল, ওটা আপনি কি নিলেন?

গাদা পিস্তল।

পিস্তল? পিস্তল কেন?

আত্মরক্ষার জন্তে।

ওর পাশ আছে?

না।

অপূর্ব বলিল, পুলিশে যদি ধরে ত আত্মরক্ষা ছুজনেরই হবে। ক'বছর দেয়?

দেবেনা,—চলুন!

অপূর্ব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুর্গা—শ্রীহরি। চলুন।

বড় রাস্তা ধরিয়া উত্তরে বর্ষা ও চীনা পল্লী পার হইয়া বাজারের পাশ দিয়া ছুজনে প্রায় মাইলখানেক পথ হাঁটিয়া একটা প্রকাণ্ড কারখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বন্ধ ফটকের কাটা দরজার ফাঁক দিয়া গলির ভিতরে প্রবেশ করিল। ডানদিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ও-দারে কারিগর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাড়া কাঠ ও ভাড়া টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি। স্মৃষ্ট দিকে সারি সারি কয়েকটা জলের কল, এবং পিছন দিকে এমনি সারি-সারি টিনের পাখানা। গোড়াতে হয়ত দরজা ছিল, এখন থলে

ও চট-ছেঁড়া ঝুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলী-বাইন। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্মা, বাঙ্গালী, উড়ে, হিন্দু, মুসলমান স্ত্রী ও পুরুষে প্রায় হাজার খানেক জীব এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবন-বাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে।

ভারতী কহিল, আজ ঋজের দিন নয়, নইলে এই জলের কলেই দু'একটা রক্ত-রক্তি কাণ্ড দেখতে পেতেন।

অপূর্ণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ছুটির দিনের ভিড় দেখেই তা' অল্পভব করতে পারচি।

এই জনতার সম্মুখেই একজন মাদ্রাজী স্ত্রীলোক পদা তৈলিয়া পাথরখানায় ঢুকিতেছিল, পদার অবস্থা দেখিয়া অপূর্ণ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া বলিল, পথের-দাবী করতে হয় ত আর কোথাও শীঘ্র চলুন, এখানে আমি দাঁড়াতে পারব না।

ভারতী নিজেও তাহা লক্ষ করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু একটু খানি হাসিল। অর্থাৎ মাহুকের দাপ হইতে নামাইয়া বাহাদের পশু করিয়া তোলা হইয়াছে তাহাদের আবার এসকল বালাই কেন?

কয়েকখানা ঘর পরে উভয়ে আসিয়া একজন বাঙালী মিস্ত্রির ঘরে প্রবেশ করিল। লোকটার বয়স হইয়াছে, কারখানায় দিতল ঢালাইয়ের কাজ করে, মদ খাইয়া কাঠের মেঝের উপর পড়িয়া অত্যন্ত মূগু খারাপ করিয়া কাহাকে গালি পাড়িতেছিল, ভারতী ডাকিয়া কহিল, মানিক, কার ওপরে রাগ কোরচ? সুশীলা কই? সে আজ ছুদিন পড়ান যায় না কেন?

মানিক কোন মতে হাতে-পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল, চোখ চাইয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, দিদিমণি! এস. বোঁহোঁ। সুশী কি করে তোমার ইস্কুলে যাবে বল? রাঁধা বাড়া বাসন মাজা মাঘ ছেলেটাকে সামলানো পধ্যন্ত—বুক ফেটে যাচ্ছে দিদিমণি, যোদো শালাকে আমি

খুন না করি ত আমি কৈবর্ত থেকে খারিজ! বড় সাহেবকে এমনি দরখাস্ত দেব যে শালাব চাকুরি খেয়ে দেব।

‘ভারতী মহাশয়ে কহিল, তা’ দিয়ো। আর বল ত না হয়, স্মিত্রা দিদিকে দিয়ে আমিই তোমার দরখাস্ত লিখে দেব। কিন্তু কাল আমাদের ফ্যার মাঠে মিটিং, তা’ মনে আছে ত ?

এমন সময় বছর দশ-এগারোর একটি মেয়ে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে অঞ্চলের ভিতর হইতে এক বোতল মদ বাহির করিয়া সাদরানে মেঝের উপর রাখিয়া কহিল, বাবা, ঘোড়া মার্কী মদ আর নেই, তাই টুপি মার্কী মদ নিয়ে এলাম। চারটে পয়সা বাকি রইল। দেখ বাবা, রান আইয়া মাতাল হয়ে আনাকে কি বলছিল জানো ?

প্রত্যুত্তরে তাহার পিতা রামিয়ার উদ্দেশে একটা কদম্বা ভাষা উচ্চারণ করিল। ভারতী কহিল, শু সব জায়গায় তুমি আর বেয়োনা। তোমার মা কোথায় স্ত্রীলা ?

মা ? মা তো পরশু রাতিরে ধলুকাকার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে লাইনের বাইরে ঘর ভাড়া করেছে। মেয়েটা আরও কি বলিতেছিল, কিন্তু বাপ গজ্জন করিয়া উঠিল,—করাচ্ছি! এ বাবা বিয়ে-করা পরিবার, বেউশো নয়! এই বলিয়া সে অনিশ্চিত কম্পিত হস্তে দ্রুত অভাবে ভাঙা খুস্তির ডগা দিয়া নতুন বোতলের নীপি খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

ভারতী হঠাৎ তাহার অঞ্চল প্রান্তে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, অপূর্ণের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। কখনো সে ভারতীকে স্পর্শ করে নাই, কিন্তু এখন সে জানই তাহার ছিল না। কহিল, চলুন এখান থেকে।

একটু দাঁড়ান।

না, এক মিনিট না। এই বলিয়া সে একপ্রকার জোর করিয়া

তাহাকে বাহিরে আনিল। ঘরের ভিতরে মানিক ছিপি বোতল ও খুস্তির বাঁট লইয়া বীরদর্পে গর্জাইতে লাগিল যে, যেন করিয়া ফাঁসি বাইতে হয় সে ভি আচ্ছা। সে দেশো গুণ্ডার ছেলে, সে জেল বা ফাঁসি কোনটাকেই ভয় করে না।

বাহিরে আসিয়া অপূর্ব যেন অগ্নিকাণ্ডের তায় জ্বলিয়া উঠিল,— হারামজাদা, নচ্ছার, পাজি মাতাল! যেন পিশাচের নরককুণ্ড বানিয়ে রেখেচোঁ। এখানে পা দিতে আপনার ঘৃণা বোধ হল না?

ভারতী তাহার মুখের পানে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, না। তাঁর কারাগ, এ নরককুণ্ড ত এরা বানায়নি। এরা শুধু তার প্রায়শ্চিত্ত করচে।

অপূর্ব কহিল, না এরা বানায়নি আমি বানিয়েছি। মেয়েটার কথা শুনলেন! ওর মা যেন কোন্ তীর্থযাত্রা করেছে! নিলজ্জ বেহায়া শয়তান! আর কথখনো যদি এখানে আসবেন ত টের পাবেন বলে দিচ্ছি।

ভারতী একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমি স্নেহ, ক্রীশ্চান, আমার এখানে আসতে দোষ কি?

অপূর্ব রাগ করিয়া বলিল, দোষ নেই? ক্রীশ্চানের জন্তে কি সং-অসং বস্তু নেই, নিজেদের সমাজের কাছে তাদের জবাব-দিহি করতে হয় না?

ভারতী উত্তর দিল, কে আছে আমার যে জবাব-দিহি কোরবে? কার মাথা-বাথা পড়েচে আমার জন্তে, আপনিই বলুন?

অপূর্ব সহসা কোন প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিল, এ সব আপনার চালাকি। আপনি ঘরে ফিরে চলুন।

আমাকে আরও পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। আপনার ভাল না লাগে আপনি ফিরে যান।

ফিরে বান্ধে বললেই কি আপনাকে এখানে রেখে আমি যেতে পারি ?

তা'হলে সঙ্গে থাকুন। মানুষের প্রতি মানুষে কত অত্যাচার করচে চোখ মেলে দেখতে শিখুন। কেবল ছোঁয়া-ছুঁয়ি বাঁচিয়ে, নিজে সাধু হয়ে থেকে ভেবেচেন পুণ্য সঞ্চয় করে একদিন স্বর্গে যাবেন ? মনেও করবেন না। বলিতে বলিতে ভারতীর মুখের চেহারা কঠোর এবং গলার স্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, এই মূর্তি ও কণ্ঠ অপূর্বের অত্যন্ত পরিচিত। ভারতী কহিল, ওই মেয়েটার মা এবং যত্ন যে অপরাধ করেছে সে শুধু ওদের দু'দিয়েই শেষ হবে ? আপনি তার কেউ নয় ? কখনো না ! ডাক্তারবাবুকে না জানা পযন্ত আমিও ঠিক এমনি করেই ভেবে এসেছি ! কিন্তু আজ আমি নিশ্চয় জানি, এই নরককুণ্ডে যত পাপ জমা হবে তার ভার আপনাকে পর্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এনে এই নরক-কুণ্ডে ডোবাবে। সাব্য কি আপনার এই দুষ্কৃতির ক্ষণশেষ না করে পরিদ্রাণ পান ! আমরা নিজের গরজেই আসি অপূর্ববাবু, এই উপলক্ষিই আমাদের পথের-দাবীর সব চেয়ে বড় সাধনা ! চলুন।

অপূর্ব নিরীহ ও নিষ্পৃহের গায় কহিল, চলুন। ভারতীর কথা কিন্তু সে বুঝিতেও পারিল না, বিশ্বাসও করিল না।

কিছু দূরে একটা সেগুন গাছ ছিল, ভারতী আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওই সামনে ক'ঘর বাড়ালী থাকে,—চলুন।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ালী ভিন্ন অপর জাতের মধ্যে আপনারা কাজ করেন না ?

ভারতী বলিল, করি। সকলকেই আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ছাড়া। আর ত কেউ সকলের ভাষা জানেনা, তিনি স্তব্ধ থাকলে এ কাজ তাঁরই, আমার নয়।

তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষা জানেন ?

জানেন।

আর ডাক্তারবাবু?

ভারতী হাসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে আপনার ভারি কৌতূহল। একথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না কেন যে, পৃথিবীতে ষা'কিছু জানা যায় তিনি জানেন, ষা'কিছু পারা যায় তিনি পারেন। কে তাঁর সবাসাচী নাম রেখেছিল আমরা কেউ জানিনে, কিন্তু তাঁর অসাধ্য, তাঁর অজ্ঞাত সংসারে কিছু নেই। এই বলিয়া সে নিজের মনে চলিতেই লাগিল, কিন্তু তাহারই পিছনে সহসা থককিয়া দাঁড়াইয়া অপূর্বর মুখ দিয়া গভীর নিঃশ্বাস পড়িল। অকস্মাৎ এই কথাটা তাহার বৃকের মধ্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, এই ভূভাগ্য পরাবীন দেশে এতবড় একটা প্রাণের কোন মূল্য নাই, যে-কোন লোকের হাতে যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহা কুকুর শিয়ালের মতই বিনষ্ট হইতে পারে! সমস্ত জগৎ-বিধানে এতবড় নিষ্ঠুর অবিচার আর কি আছে? ভগবান মঙ্গলময় এই যদি সত্য, এ তবে কাহার ও কোন পাপের দণ্ড?

উভয়ে একটা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। ভারতী ডাকিল, পাঁচকড়ি কেমন আছ আজ?

অন্ধকার কোণ হইতে সাড়া আসিল, আজ একটু ভাল। এই বলিয়া একজন বুড়া গোছের লোক ডান হাতটা উঁচু করিয়া অমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আগাগোড়া কি কতকগুলো প্রলেপ দেওয়া, কহিল, মা, মেয়েটা রক্ত আমাশায় বোধ হয় বাঁচবেনা, ছেলেটার আবার কাল থেকে বেহুঁশ জর, এমন একটা পরমা নেই যে এক ফোঁটা জল পান করিবে, কি এক বাটি সাপ্ত বালি রেখে থাওয়াই। তাহা হইলে চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল।

অপূর্বর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, পরমা নেই কেন?

এই অপরিচিত বাবুটিকে লোকটা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে নিরীক্ষণ

করিয়া বলিল, পুলিশের শেকল পড়ে ডানহাতটাই জখম হয়ে গেছে, মাংসখানেক ধরে কাজে বার হতে পারিনি, পয়সা থাকবে কি করে বাবু মশায় ?

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, কারখানার ম্যানেজার এর ব্যবস্থা করেন না ?

পাঁচকড়ি কপালে একবার বাম হাতটা স্পর্শ করিয়া কহিল, হায় ! হায় ! দিন-মজুরদের আবার ব্যবস্থা ! এতেই বল্চে কাজ করতে না পারো ত ঘর ছেড়ে দাও, আবার যখন ভাল হবে তখন এসো,—কাজ দেবো। এ অবস্থায় কোথায় যাই বলুন ত মশায় ? ছোট গাঁহেবের হাতে পায়ে ধরে বড় জোর আর হুগ্ধাখানেক থাকতে পাবো। বিশ বছর কাজ করছি মশায়, এরা এমনি নেমকহারাম !

কথা শুনিয়া অপূর্ব রাগে জলিতে লাগিল। তাহার এমনি ইচ্ছা করিতে লাগিল ম্যানেজার লোকটাকে পায় ত কান ধরিয়া টানিয়া আনিয়া দেখায় হুদিনে বাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া দিয়াছে আজ দুদিনে তাহারা কি দুঃখই ভোগ করিতেছে ! অপূর্বদের বাটীর কাছে গরুর গাড়ীর আড্ডা, তাহার মনে পড়িল, এক জোড়া গরু সমস্ত জীবন ধরিয়া বোঝা টানিয়া অবশেষে বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িলে লোকটা তাহাদের কসাইখানায় বিক্রী করিয়া দিয়াছিল। এই হৃদয়-হীনতা নিবারণ করিবার উপায় নাই, লোকে করেনা, কেহ করিতে চাহিলে সবাই তাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেয়। সেই পথ দিয়া যখনই সে গিয়াছে, তখনই, এই কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিয়াছে। গরুর জগ্ন নয়, কিন্তু অর্থের পিপাসায় এই বর্ষের নিষ্ঠুরতায় মানুষে আপনাকে আপনি কত ছোটই না প্রতিদিন করিয়া আনিতেছে ! সহসা ভারতীর কথাটা স্মরণ করিয়া সে মনে মনে কহিল, ঠিক কথাই ত ! কে কোথায় করিতেছে আমি ত করিনা, অথবা, এমনিই ত হয়, এই ত চিরদিন হইয়া আসিতেছে—এই বলিয়াই ত এত বড় ক্রটির

জবাব-দিহি হয় না! গরু-ঘোড়া শুধু উঠবে না এই হাত-ভাড়া পাঁচকড়িটাও তাই। আপনাকে যে বাচাইতে পারেনা তাহার হত্যায়, যে দুর্বল তাহার পীড়নে, যে নিকপায় তাহার লজ্জা হীন বকনায় এই যে মানুষে আপনার হৃদয়-বৃত্তির জীবন হরণ করিতেছে সবলের এই যে আত্মহত্যার অহোরাত্রব্যাপী উৎসব চলিয়াছে, ইহার বাতিল ভাবে কবে? এই সর্বনাশা উন্নততার পরিসমাপ্তি ঘটবে কোন্ পথ দিয়া? মরণের আগে কি আর তাহার চেতনা ফিরিবেনা!

ঘরের একধারে মলিন, শতচ্ছিন্ন শয্যায় ছেলে-মেয়ে দুটা মৃতকল্পের তায় পড়িয়াছিল, ভারতী কাছে গিয়া তাহাদের গায়ে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। অপূর্ব ভয়ে সেখানে যাইতে পারিল না, কিন্তু দরিদ্র, পীড়িত শিশু দুটির নিঃশব্দ বেদনা তাহার বুকের মধ্যে যেন মুগুরের ঘা মারিতে লাগিল। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে আপনাকে আশ্রয় বলিতে লাগিল, লোকে বলে, এই ত ছুনিয়া! এমনি ভাবেই ত সংসারের সকল কাজ চিরদিন হইয়া আসিয়াছে! কিন্তু এই কি যুক্তি! পৃথিবী কি শুধু অতীতেরই জগৎ! মানুষ কি কেবল তাহার পুরাতন সংস্কার লইয়া অচল হইয়া থাকিবে! নূতন কিছু কি সে কল্পনা করিবে না! উন্নতি করা কি তাহার শেষ হইয়া গেছে! যাহা বিগত যাহা মৃত কেবল তাহারই ইচ্ছা, তাহারই বিধান! মানুষের সকল ভবিষ্যৎ, সকল জীবন, সকল বড় হওয়ার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চিরকাল ধরিয়া প্রভু করিতে থাকিবে!

চলুন।

অপূর্ব চমকিয়া দেখিল, ভারতী। পাঁচকড়ি নীরবে, নানমুখে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভারতী স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, ভয় নেই তোমার, এরা সেয়ে উঠবে। কাল সকালেই আমি ডাক্তার, শুধু পথ সব পাঠিয়ে দেব—

তাহার কথা শেষ না হইতেই অপূর্ব পকেটে হাত দিয়া টাকা বাহির করিতেছিল, সেই হাত ভারতী হাত বাড়াইয়া চাপিয়া ধরিয়া নিবারণ করিল। পাঁচকড়ির দৃষ্টি অন্ত্র ছিল, সে ইহা দেখিতে পাইল না, কিন্তু অপূর্বও ইহার হেতু বুঝিল না। ভারতী তখন নিজের জামার পকেট হইতে চার আনার পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, ছেলেদের চার পয়সার মিছরি, চার পয়সার সাণ্ড, আর বাকি দু' আনার চাল ডাল এনে তুমি এ বেলার মত খাও পাঁচকড়ি, কাল তোমার ব্যবস্থা করে দেব। আজ আমরা চললাম। এই বলিয়া অপূর্বকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

পথে আসিয়া অপূর্ব ক্ষুধা হইয়া বলিল, আপনি ভারি রূপণ। আমাকেও দিতে দিলেন না, নিজেও দিলেন না।

ভারতী কহিল, দিয়েই ত এলাম।

একে দিয়ে আসা বলে? তার এই ছঃসময়ে পাই-পয়সার হিসেব করে চার আনা মাত্র হাতে দেওয়া ত শুধু অপমান।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কত দিতে যাচ্ছিলেন?

অপূর্ব ঠিক কিছুই করে নাই, খুব সম্ভব হাতে বাহা উঠিত, তাই দিত। কিন্তু এখন ভাবিয়া বলিল, অন্ততঃ গোটা পাঁচেক টাকা।

ভারতী জিভ কাটিয়া কহিল, ওরে বাপু! সর্বনাশ করেছিলেন আর কি। বাপ ত মদ খেয়ে সারারাত বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকতো, কিন্তু ছেলে-মেয়ে দুটো মরে যেতো।

মদ খেতো!

খেতেনা! হাতে টাকা পেলে মদ খায়না এমন অসাধারণ ব্যক্তি সংসারে কে আছে?

অপূর্ব ক্ষণকাল অভিভূতের গায় স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, আপনার

সব কথায় তামাসা। কল্প সন্তানের চিকিৎসার টাকায় বাপ মদ কিনে খাবে, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে ?

ভারতী কহিল, সত্যি না হয় ত আপনি যে ঠাকুরের দিব্যি করতে বলবেন,—মা মনসা, ওলা বিবি—হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়াই কিন্তু আপনাকে তৎক্ষণাৎ সংযত করিয়া লইয়া বলিল, নইলে, দাতার হাত চেপে ধরে দুঃখীকে পেতে দেবনা, সত্যি বলুন ত আমি কি এতই ছোট ?

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এদের মা নেই ?

না।

কোথায় কোন আত্মীয়ও নেই বোপ করি ?

ভারতী বলিল, থাকলেও কাজে লাগবে না। বছর দশ বারো পূর্বে পাঁচকড়ি একবার দেশে যায়, কোন এক প্রতিবেশীর বিদবা মৈত্রেয়কে ভুলিয়ে সাগর পার করে নিয়ে আসে। ছেলে মেয়ে দুটি তারই; বছর দুই হল, গলায় দড়ি দিয়ে সে ভবয়ঙ্গণা এড়িয়েছে,—এই ত পাঁচকড়িদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অপূর্ব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নরককুণ্ডই বটে !

ভারতী নিতান্ত সহজকণ্ঠে মাথা নাড়িয়া বলিল, তাতে আর লেশমাত্র মতভেদ নেই। কিন্তু মুশ্কেল হয়েছে এই যে, এরা সব ভাই-বোন। রক্তের সম্বন্ধ অস্বীকার করেই রেহাই মিলবেনা অপূর্ববাবু, উপরে বসে যে ব্যক্তিটি সমস্ত দেখেচেন, তিনি কড়ায় গণ্ডায় এর কৈফিয়ৎ নিয়ে তবে ছেড়ে দেবেন !

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, এখন মনে হচ্ছে যেন একেবারে অসম্ভব, নয়। ক্ষণকাল পূর্বে এই পাঁচকড়ির ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়াই যে সকল চিন্তা তাহার মনে হইয়াছিল, বিদ্বাৎসেগে সেই সমস্তই আর একবার তাহার মনের মধ্যে বহিয়া গেল। বলিল, আমিও যখন মানুষ তখন দায়িত্ব আছে বৈ কি।

ভারতী মার দিল। বলিল, আগে আগে আমিও দেখতে পেতাম না, রাগ করে ঝগড়া করতাম। এই সব অজ্ঞান, দুঃখী, দুর্বল-চিত্ত ভাই-বোনের ঘাড়ে অসহ্য পাপের বোঝা কে অহরহ চাপাচ্ছে এখন স্পষ্ট দেখতে পাই অপূর্ববাবু।

পাশের ঘরে একজন উড়িয়া মিস্ত্রি থাকে, তাহার পাশের ঘর হইতে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ হাসি ও উচ্চ কোলাহল আসিতেছিল, পাঁচকড়ির ঘরের ভিতর হইতেও অপূর্ব তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। সেই ঘরে আসিয়া দুজনে উপস্থিত হইল। ভারতী ইহাদের পরিচিত, সকলে সমুদরে তাহার অভ্যর্থনা করিল। একজন ছুটিয়া গিয়া একটা টুল ও একটা বেতের মোড়া আনিয়া উভয়কে বসিতে দিল। অনাবৃত কাঠের মেঝেতে বসিয়া ছয় সাত জন পুরুষ ও আট দশ জন স্ত্রীলোকে মিলিয়া বস খাইতেছিল। একটা ভাদ্রা হারমোনিয়াম ও একটা বাঁয়া মাঝখানে, নানা রঙের ও নানা আকারের খালি বোতল চতুর্দিকে গড়াইতেছে, একজন বুড়া গোছের স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে,— তাহাকে বিবস্ত্রা বলিলেই হয়। ঘাট হইতে পঁচিশ ছাব্বিশ পর্য্যন্ত সকল বয়সের স্ত্রী পুরুষই বসিয়া গিয়াছে,—আজ রবিবার, পুরুষদের ছুটির দিন। পিঁয়াজ-রসুনের তরকারির সঙ্গে মিশিয়া সস্তা জারমান মদের অবর্ণনীয় গন্ধ অপূর্বর নাকে লাগিতে তাহার গা বমি-ভ্রমি করিয়া আসিল। একজন অল্প-বয়সী স্ত্রীলোকের হাতে মদের গেল্লাস ছিল, সে বোদ হয় তখনও পাকা হইয়া উঠে নাই, হয়ত অন্তদিন পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে বা হাতে সজোরে নিজের নাক টিপিয়া ধরিয়া গেল্লাসটা মুখে ঢালিয়া দিয়া তক্তায় ফাঁক দিয়া অপৰ্য্যাপ্ত থুথু ফেলিতে লাগিল। একজন পুরুষ তাড়াতাড়ি তাহার মুখে খানিকটা তরকারি গুঁজিয়া দিল। বাঙালী মেয়েমাহুষকে চোখের স্রুমে মদ খাইতে দেখিয়া অপূর্ব যেন একেবারে শীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল,

এতবড় ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যও ভারতীর মুখের উপরে বিকৃতির চিহ্ন মাত্র নাই। এ সব তাহার সহিয়া গেছে। কিন্তু ক্ষণেক পরে গৃহস্বামীর ফরমাসে টুনি যখন গান ধরিল, এই যমুনা সেই যমুনা—এবং পাশের লোকটা হারমোনিয়াম টানিয়া লইয়া থামোকা একটা চাবি টিপিয়া ধরিয়া প্রাণপণে বেলো করিতে শুরু করিল, তখন, এত ভার ভারতীর বোধ হয় মহিল না। সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, মিস্ত্রি মশায়, কাল আমাদের মিটিং—এ কথা বোধ হয় ভোলনি? যাওয়া কিন্তু চাই-ই।

চাই বই কি দিদিমনি! এই বলিয়া কালাচাঁদ একপাত্র মদ গলায় ঢালিয়া দিল।

ভারতী কহিল, ছেনেবেলায় পড়েচ ত খড় পাকিয়ে দড়ি করলে হাতী বাঁধা যায়। এক না হলে তোমরা কখনো কিছু করতে পারবেনা! কেবল তোমাদের ভালর জগ্নেই স্মিত্রাদিদি কি পরিশ্রম করছেন বলত!

এ কথায় সকলে একবাক্যে সায় দিল। ভারতী বলিতে লাগিল, তোমরা ছাড়া কি এতবড় কারখানা একদিন চলে? তোমরাই ত এর সত্যিকারের মালিক, এতো সোজা কথা কালাচাঁদ, এ তোমরা না বুঝতে চাইলে হবে কেন?

সবাই বলিল, এ ঠিক কথা। তাহারা না চালাইলে সমস্ত অন্ধকার।

ভারতী কহিল, অথচ, তোমাদের কত কষ্ট একবার ভেবে দেখ দিকি। যখন-তখন বিনা দোষে সাহেবরা তোমাদের লাখি জুতো পরে বার করে দেয়। এই পাশের ঘরেই দেখ কাজ করতে গিয়ে পড়ির হাত ভেঙেচে বলে আজ সে খেতে পায়না, তার ছেনে-মেয়ে তুটো শুধু পিথির অভাবে মায়া যাচ্ছে। ঘর থেকে পর্যন্ত বড় সাহেব তাকে দূর করে দিতে চায়! এই যে ক্রোর ক্রোর টাকা এরা লাভ করচে সে কাদের দৌলতে? আর তোমরা পাও কতটুকু? এই যে সেদিন

গ্রামলালকে ছোট সাহেব ঠেলে ফেলে দিলে, আজও সে হাসপাতালে, এ তোমরা সহ্য করবে কেন? একবার সবাই এক হয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে বলত, এ নির্যাতন আমরা আর সহ্য না, কেমন তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে দেখি! কেবল একটবার তোমাদের সত্যিকার জোরটুকু তোমরা চেয়ে দেখতে শেখো,—আর আমরা তোমাদের কাঁচেনিচুই চাইনে কালাচাঁদ!

একজন মাতাল এতক্ষণ হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, সে কহিল, বাবা! পারিনে কি? এমন একটি বস্তু চিল করে রেখে দিতে পারি, যে—কড়, কড়, কড়াং! বাস! অর্ধেক কারখানাই ফরসা!

ভারতী সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না, ছুলাল, ওসব কাজ কখনো কোরোনা! ওতে তোমাদেরই সর্বনাশ। হয়ত, লোক মারা যাবে, হয়ত—না না, এ সব কথা স্বপ্নেও ভাবতে যেয়োনা ছুলাল। ওর চেয়ে ভয়ানক পাপ আর নেই!

লোকটা মাতালের হাসি হাসিয়া বলিল, নাঃ—তাকি আর জানিনে! ও শুধু কথার কথা বল্চি আমরা পারিনে কি।

ভারতী বলিতে লাগিল, তোমাদের সংপথে, সত্যিকার পথে দাঁড়ানো চাই—তাতেই তোমরা সমস্ত পাশে। ওদের কাছে তোমাদের হুঁ বহু টাকা পাওনা—তাই কেবল কড়ায় গুণ্ডায় আদায় করে নিতে হবে।

মেয়ে পুঙ্খবে এই লইয়া গুণ্ডাগোল করিতে লাগিল। ভারতী কহিল, বুঝা হয়, এখনো আর এক জায়গায় যেতে হবে। আমরা তবে এখন আসি, কিন্তু কালকের কথা যেন কিছুতেই না ভুল হয়। এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই কালাচাঁদের আড্ডার সমস্ত ব্যাপারই অপূর্বর অন্তর্ভুক্ত বিশ্রী গাণিয়াছিল, কিন্তু শেষের দিকে যে সব আলোচনা হইল তাহাতে

তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না। বাহিরে আসিয়াই ভয়ানক রাগ করিয়া কহিল, তুমি এ সব কথা এদের বলতে গেলে কেন ?

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কি সব কথা ?

অপূর্ব বলিল, ওই ব্যাটা হারামজাদা মাতাল ! ছুলাল না কি নাম, —কি বললে শুনলে ত ? পর এ কথা যদি সাহেবদের কানে যায় ?

কানে যাবে কি করে ?

আরে, এরাই বলে দেবে। এরা কি যুদিষ্টির নাকি ? মদের কোঁকে কখন কি কাও করে বসবে, তখন, তোমার নামেই দোষ হবে। হয়ত বলবে তুমিই শিখিয়ে দিয়েছ।

কিন্তু সে তো মিছে কথা !

অপূর্ব অধীর হইয়া বলিল, মিছে কথা ! আরে, ইংরেজ রাজত্বে মিছে কথায় কখনো কারো জেল হয়নি নাকি ? রাজহুটাই ত মিছের ওপর দাঁড়িয়ে।

ভারতী বলিল, আমারও না হয় জেল হবে।

অপূর্ব কহিল, তুমি ত বলে ফেললে, না হয় জেল হবে ! না না, এ সব হবে না। এখানে আসা তোমার আর কথখনো—কথখনো চলবে না !

কিছুদূরে একজনের কাছে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ঘরে তাহার তালা দেওয়া দেখিয়া উভয়েই সেই পথেই ফিরিল। কালাটাদের ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, সেই যমুনা প্রবাহিনী'র গান তখন থামিয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্তে মদ-মত্ত তর্ক একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। একজন প্রীলোক মাতাল হইয়া তাহার স্বামীর শোবে কান্না শুরু করিয়াছে, আর একজন তাহাকে এই বলিয়া সাহস দিতেছে যে দেশের কথা বলিয়া আর লাভ নাই—এইখানেই আবার তোরা সব হবে, তুই বরঞ্চ মানং করিয়া পুণিমা পুণিমা সত্যনারায়ণের কথা দে। অনেকে

এই বলিয়া ঝগড়া করিতেছে যে, এই ক্রীষ্টান মেয়েগুলো কারখানায় ধর্মঘট বাধাইয়া দিতে চায়। তাহা হইলে তাহাদের কষ্টের আর সীমা থাকিবে না, উহাদের লাইনের ঘরে আর আসিতে দেওয়া উচিত নয়। কালার্টনদ মিশ্রি বুঝাইয়া বলিতেছে যে সে বোকা ছেলে নয়। ইহাদের দৌড়টাই কেবল সে দেখিতেছে। একজন অতিসাবধানী মেয়েমানুষ পরামর্শ দিল যে, থোকা সাহেবকে এই বেলা সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল।

সেখান হইতে ভারতীকে জোর করিয়া দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া অপূর্ব তিত্তকণ্ঠে কহিল, আর করবে এদের ভাল? নেমকহারাম! হারামজাদা! পাজি! নচ্ছার! উঃ—পাশের ঘরে দুটো অনাথ ছেলে-মেয়ে মরে, একজন কেউ চেয়ে দেখে না! নরক আর আছে কোথায়?

ভারতী মুখপানে চাহিয়া বলিল, হঠাৎ হল কি আপনার?

অপূর্ব কহিল, আমার কিছুই হয়নি, আমি জানতাম। কিন্তু তুমি শুন্লে কি না, তাই বল!

ভারতী বলিল, নূতন কিছুই নয়, এ রকম ত আমরা রোজ শুনি।

অপূর্ব গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, এমনি শয়তানি? এমনি কৃতঘ্নতা? এদের চাপ্ত তুমি দলে আনতে—দলবদ্ধ করতে? এদের চাপ্ত তুমি ভাল?

ভারতীর কণ্ঠস্বরে কোন উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। বরঞ্চ, সে একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, এরা কারা অপূর্ববাবু? এরা ত আমরাই। এই ছোট কথাটুকু যখন ভুল্‌চেন, তখনি আপনার গোল বাধ্‌চে। আর ভাল? ভাল-করা বলে যদি সংসারে কোন কথা থাকে, তার যদি কোন অর্থ থাকে সে তো এইখানে। ভাল ত ডাক্তারবাবুর করা যায় না অপূর্ববাবু।

অপূর্ব এ কথার কোন জবাব দিল না।

দুজনে নিঃশব্দে ফটক পার হইয়া আবার সেই বর্ষাপাড়ার ভিতর

দিয়া বাজারের পথ ঘুরিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, গৃহস্থের ঘরে আলো জলিয়াছে, পথের দুধারে ছোট ছোট রাত-দোকান বসিয়া বেচা-কেনা আরম্ভ হইয়াছে,—ইহারই মধ্যে দিয়া ভারতী মাথার কাপড় কপালের নীচে পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া নিঃশব্দে দ্রুতবেগে পথ হাঁটিয়া চলিল। অবশেষে লোকালয় শেষ হইয়া যেখানে জলা ও মাঠ স্রু হইল, সেইখানে তে-মাথায় আসিয়া সে পিছনে চাহিয়া কহিল, আপনি বাসায় যান ত সহরে যাবার এই ডান দিকের পথ।

অপূর্ব অগ্নমনস্ক হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বলেন ?

ভারতী বলিল, এতক্ষণে আপনার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে। যথাযোগ্য সম্বোধনের ভাষা মনে পড়েছে।

তার মানে ?

তার মানে রাগের মাথায় এতক্ষণ আপনি-তুমির ভেদাভেদ ছিল না। এখন ফিরে এল।

অপূর্ব অতিশয় নজ্জিত হইয়া স্বীকার করিয়া কহিল, আপনি রাগ করেন নি ?

ভারতী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, একটু করলেই বা। চলুন।

আবার যাবো ?

যাবেন না ত কি অন্ধকার পথে আমি একলা যাবো ?

অপূর্ব আর দ্বিধাক্তি করিল না। আজ মনের মধ্যে তাহার অনেক বিষ, অনেক জ্বালা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। মাতালগুনার কথা সে কোনমতে ভুলিতে পারিতেছিল না। চলিতে চলিতে হঠাৎ কটুকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, এ সব হল সুমিত্রার কাছ, আপনার ওখানে মোড়লি করতে যাবার দরকার কি ? কে কোথায় কি করে বসবে, আর আপনাকে নিয়ে টানাটানি পড়বে।

ভারতী বলিল, পড়লই বা।

অপূর্ব বলিল, বা রে পড়লই বা! আসল কথা হচ্ছে সন্দারি করাই আপনার স্বভাব। কিন্তু আরো ত ঢের জায়গা আছে।

একটা দেখিয়ে দিন না!

আমার বয়ে গেছে।

খানিকটা খুঁড়িয়া রাস্তার এই স্থানটা মেবামত হইতেছিল। যাইবার সময় দিনের বেলা কষ্ট হয় নাই, কিন্তু দুপাশের কৃষ্ণচূড়ার গাছের নীচে ভাঙা পথটা অন্ধকারে একেবারে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতী হাত বাড়াইয়া অপূর্বর বাঁ হাতটা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, স্বভাব ত আমার যাবে না, অপূর্ববাবু, কিছু একটা করাই চাই। কিন্তু আপনার মত আনাড়ির ওপরে মোড়লি করতে পাই ত আমি আর সমস্ত ছেড়ে দিতে পারি।

আপনার সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই। এই বলিয়া সে সাবধানে ঠাহর করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

(১৬)

পরদিন অপরাহ্ন বেলায় স্মিত্রার নেতৃত্বে ফ্যার-মাঠে যে সভা আহূত হইল তাহাতে লোকজন বেশি জমিল না, এবং বক্তৃতা দিতে যাহারা প্রতিক্ষিত হইয়াছিলেন তাহাদের অনেকেই আসিয়া জুটিতে পারিলেন না। নানা কারণে সভার কার্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব ঘটিল এবং আলোর বন্দোবস্ত না থাকায় সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই তাহা ভাঙিয়া দিতে হইল। স্মিত্রার নিজের বক্তৃতা ভিন্ন বোধ করি এই সভায় উল্লেখযোগ্য কিছুই হইতে পাইল না, কিন্তু তাই বলিয়া পথের-দাবীর এই প্রথম উত্তমটিকে ব্যর্থ বলিয়াও অভিহিত করা যায় না। কারণ, মুখে-মুখে চারিদিকের মজুরদের মধ্যেও যেমন ব্যাপারটা প্রচলিত হইয়া পড়িতে বাকি রহিল না, তেমনি কারখানার কর্তৃপক্ষদের কানেও কথাটা পৌছিতে বিলম্ব হইল না। যেমন করিয়া হোক, ইহাই সর্বত্র

রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে কে-একজন বাঙালী স্ত্রীলোক সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া অবশেষে বর্ম্মায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার যেমন রূপ তেমন শক্তি। তাঁহাকে বাধা দেয় কার সাধ্য! কেমন করিয়া তিনি সাহেবদের কানে ধরিয়া মজুরদের সর্ব্বপ্রকার স্বখ-সুবিধা আদায় করিয়া লইবেন, এবং তাহাদের মজুরির হার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন নিজেদের মুখেই সে সকল কথা তিনি প্রকাণ্ডে বিবৃত করিয়াছেন। যাহারা খবর না পাওয়ার জন্য সেদিন উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজের মুখ হইতে সকল কথা শুনিতে পায় নাই তাহারা আগামী শনিবারে গিয়া যেন মাঠে উপস্থিত হয়।

বিশ পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে যতগুলো কল-কারখানা ছিল এই সম্বাদ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। সুমিত্রাকে কয়টা লোকেই বা চোখে দেখিয়াছে, কিন্তু তাঁহার রূপ ও শক্তির খ্যাতি অতিরঞ্জিত, এমন কি অমানুষিক হইয়াই যখন লোকের কানে গেল, তখন এই অশিক্ষিত মজুরদের মধ্যে সহসা যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। চিরদিন সংসারে অত্যাচারিত, পীড়িত, দুর্ব্বল বলিয়া মানুষের সহজ অধিকার হইতে যাহারা স্ববলের দ্বারা প্রবঞ্চিত, নিজের উপরে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ যাহারা ছুনিয়ায় খুঁজিয়া পায় না, দেবতা ও দৈবের প্রতি তাহাদেরই বিশ্বাস সব চেয়ে বেশি। সুমিত্রার সখস্বে জনশ্রুতি তাহাদের কাছে কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল না,—এটা প্রায় একপ্রকার হির হইয়া গেল যে, একটা রোজ কানাই করিয়া শনিবার দিন ফয়ার-মাঠে হাজির হইতেই হইবে। তাঁহার কথা ও উপদেশের মধ্যে এমন প্রশ-পাথর যদি বা কিছু থাকে যাহা দিয়া দিন-মজুরের দুঃখ-কপাল রাতারাতি একেবারে ভোজবাজির মত সৌভাগ্যের দীপ্তিতে রাঙা হইয়া উঠিবে তা হইলে যেমন করিয়া হোক সে দুর্ব্বল বস্ত্ত তাহাদের সংগ্রহ করিয়া আনিতেই হইবে।

সে দিন বৈকালের সভায় বক্তার অভাবে অপূর্ব্বর মত আনাড়িকেও

সনির্ভর উপরোধের তাড়নায় বাধ্য হইয়া দুই চারিটা কথা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে হইয়াছিল। বলার অভ্যাস তাহার কোনকালে ছিল না, বলিয়াও ছিল সে অতিশয় বিস্মী এবং এজ্ঞ মনে মনে সে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়াই ছিল, কিন্তু আজ হঠাৎ যখন খবর পাইল তাহাদের সেদিনকার বক্তৃতা বুঝা ত হয়ই নাই, বরঞ্চ ফল এতদূরে গড়াইয়াছে যে তাহাদের আগামী সভায় সমস্ত কল-কারখানার কাজ বন্ধ করিয়া কারিকরের দল উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তখন শ্রাঘ্যায় ও আত্ম-প্রসাদের আনন্দে বুকেই মধ্যোটা তাহার ফুলিয়া উঠিল। সেদিন নিজের বক্তব্যকে সে পরিস্ফুট করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভয় ভাঙিয়াছিল। বহুলোকের মাঝখানে উঠিয়া জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলার মধ্যে যে নেশা আছে, সেদিন সে তাহার স্বাদ পাইয়াছিল, আজ আকিসে আশিয়াই স্বমিত্রার চিঠির মধ্যে বহুবিধ প্রশংসার সঙ্গে আগামী সভার জ্ঞাত পুনরায় বক্তার নিমন্ত্রণ পাইয়া সে উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আকিসের কাজে মন দিতে পারিল না, এবং কি করিয়া আরও বিশদ, আরও সতেজ ও আরও সুন্দর করিয়া বলা যায় তখন হইতে মনে মনে তাহার ইহারই মহলা চলিতে লাগিল। দুপুরবেলা চিফিন খাইতে বসিয়া আজ সে হঠাৎ রামদাসের কাছে এই কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। একদিন তাহারই জ্ঞাত সে ভারতীকে অপমান করিয়াছিল, সেই অবধি তাহার লেশমাত্র সংশ্রবের কথাও এই লোকটির কাছে বলিতে অপূর্বর অত্যন্ত লজ্জা করিত। আদালতে সেই জরিমানার দিন হইতে গণনার হিসাবে কত দিনই বা গত হইয়াছে! ইহার মধ্যে সেই দুদ্দান্ত বর্ষের সাথেবটা মরিয়াছে, তাহার বাঙালী স্ত্রী মরিয়াছে এবং তাহাদের সেই শয়তান ক্রীশ্চান মেয়েটাও ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে এইটুকুই শুধু রামদাস জানিত। কিন্তু এই অবসরটুকুর মধ্যেই যে সেই ঘর-ছাড়া মেয়েটির সহিত নিঃশব্দ গোপনে তাহার বন্ধুর জীবনে

কতবড় কাব্য ও কতবড় দুঃখের ইতিহাস দুঃসহ জন্তবেগে রচিত হইয়া উঠিতেছিল সে তাহার কোন খবরই পায় নাই। আজ পুলকের আতিশয্যে সকল কথাই যখন অপূর্ণ বাক্ত করিয়া কহিতে লাগিল, তখন রামদাস তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভারতী, সুমিত্রা, ডাক্তারবাবু, নবতারা, এমন কি সেই মাতালটার পর্যন্ত উল্লেখ করিয়া সে তাহাদের পথের-দাবীর কর্ম ও লক্ষ্যে বিবৃত করিয়া সেদিনকার লাইনের ঘরে অভিযানের বিবরণ যখন একটি একটি করিয়া দিতে লাগিল তখন পর্যন্তও রামদাস একটা প্রশ্ন করিল না। একদিন দেশের জন্ত এই লোকটি জেল খাটিয়াছে, বেত খাইয়াছে, হয়ত আরও কত-কি নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, কেবল একটি দিন ছাড়া যাহার কোন বিবরণ কোনদিন সে রামদাসের কাছে শুনিতে পায় নাই, তথাপি তাহাকেই কল্পনায় বাড়াইয়া লইয়া অপূর্ণ আফিসের মধ্যে বড় হইয়াও আপনাকে সর্বদাই ছোট না ভাবিয়া পারিত না। ক্ষুদ্রতা তাহার ছিল না, রামদাস তাহার বন্ধু—বন্ধুর প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু বড় ও ছোটর ভাবটাও সে মন হইতে তাড়াইতে পারিত না। এমনি করিয়াই এই ছুটি বন্ধুর ঘনিষ্ঠতার মাঝখানেও ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ সুমিত্রার পত্রখানি সে রামদাসের চোখের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া নিজেকে পথের-দাবীর একজন বিশিষ্ট সভ্য, এবং দেশের কাজে নিয়োজিত-প্রাণ বলিয়া আপনাকে বাক্ত করিয়া একদণ্ডেই যেন সে বন্ধুর সমকক্ষ হইয়া উঠিল।

চিঠিখানি ইংরাজিতে লেখা তলওয়ারকর আছোপান্ত বার তাহা নিঃশব্দে পাঠ করিয়া মুগ্ধ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুজি, এ সকল কথা আমাদের আপনি একদিনও বলেননি কেন?

অপূর্ণ কহিল, বললেও কি এখন আর আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতেন?

তলওয়ারকর বলিল, এ কথা কেন জিজ্ঞেসা করছেন ? আমাকে ত আপনি যোগ দিতে ডাকেন নি।

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অভিমানের স্বর অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াই অপরূপ কান্নে বাজিল, সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তার কারণ আছে রায়দাসবাবু। আপনি ত জানেন, এসব কাজের কত বড় দায়িত্ব, কত বড় শঙ্কা। আপনি বিবাহ করেছেন, আপনার মেয়ে আছে, স্ত্রী আছেন, আপনি গৃহস্থ,—তাই আপনাকে এই বাড়ির মধ্যে আর ডাকাতে চাইনি।

তলওয়ারকর বিস্মিত হইয়া বলিল, গৃহস্থের কি দেশের সেবার অধিকার নেই ? জন্মভূমি কি শুধু আপনাদের, আমাদের নয় ?

অপরূপ লজ্জা পাইয়া কহিল, সে ইঙ্গিত আমি করিনি তলওয়ারকর, আমি শুধু এই কথাই বলেছি যে আপনি বিবাহিত, আপনি গৃহস্থ। অতএব আপনার অনেক দায়িত্ব, তাই এ বিদেশে এতবড় বিপদের মধ্যে যাওয়া বোধ করি আপনার ঠিক নয়।

তলওয়ারকর কহিল, বোধ হয় ! তা হ'তে পারে। কিন্তু বিজিত, পরাদীন দেশের সেবা করার নামই ত বিপদ অপূর্ববাবু। তার যে আর কোন নাম নেই এ কথা আমি চিরদিন জানি। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিলাহটা ধর্ম, মাতৃভূমির সেবা তার চেয়ে বড় ধর্ম। এক ধর্ম আর এক ধর্ম। চরণে বাধা দেবে এ যদি আমি একটা দিনও মনে করতাম বাবুজি, আমি কখনো বিবাহ করতাম না।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অপরূপ আর প্রতিবাদ করিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু এই যুক্তিকে সে মনে মনে সমর্থন করিল না। একদিন স্বদেশের কাজে এই লোকটি বহু দুঃখ পাইয়াছে, আজও তাহার অন্তরের তেজ একেবারে নিবিয়া যায় নাই, সামান্য প্রসঙ্গেই সহসা তাহা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা মনে করিয়া অপরূপ শ্রদ্ধায় বিগলিত হইল,

কিন্তু তাহার অধিক আর কিছু সে সত্য-সত্যই প্রত্যাশা করিল না। আহ্বান করিলেই সে যে স্ত্রী পুত্রের মায়া কাটাইয়া, তাহাদের প্রতিপালনের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া পথের-দাবীর সভ্য হইতে ছুটিয়া যাইবে ইহা সে বিশ্বাসও করিল না, ইচ্ছাও করিল না। স্বদেশ সেবার অধিকারের স্পর্ধা এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উচু হইয়া গিয়াছিল। মহা এ প্রদঙ্গ সে বন্ধ করিয়া আগামী সভার হেতু ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বন্ধুর কাছে কিন্তু এখন মরলকণ্ঠেই ব্যক্ত করিল যে, সেই একটি দিন ভিন্ন জীবনে কখনো সে বক্তৃতা করে নাই; সমিতির নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিবে না, কিন্তু একের কথা বহুজনকে শুনাইবার মত ভাষা বা অভিজ্ঞতা কোনোটাই তাহার আয়ত্ত নয়।

তলওয়ারকর জিজ্ঞাসা করিল, কি করবেন তাহলে ?

অপূর্ব বলিল, বক্তৃতা করার মত কেবল একটি দিনই জীবনে আমার কারখানা দেখবার সুযোগ ঘটেছে। তাদের কুলি-মজুরেরা যে অধিকাংশই পশুর জীবন যাপন করে এ আমি অদৃশ্যে অনুভব করে এসেছি, কিন্তু কেন, কিসের জন্ত তার ত কিছুই জানিনে।

রামদাস হাসিয়া কহিল, তবুও আপনাকে বলতে হবে ? নাই-ই বললেন।

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, এত বড় মর্যাদা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন।

রামদাস নিজেই তখন বলিল, আমি কিন্তু এদের কথা কিছু জানি।

কেমন করে জানলেন ?

বহুদিন এদের মধ্যে ছিলাম অপূর্ববাবু। আমার চাকরির মাটিকিকেটগুলো একবার চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন দেশে আমি কলকারখানা, কুলি-মজুর নিয়েই কাল কাটিয়েছি। যদি হুকুম করেন ত

অনেক ছুঃখের কাহিনীই আপনাকে শোনাতে পারি। বাস্তবিক, এদের না দেখলে যে দেশের সত্যকার বাথার জায়গাটাই বাদ পড়ে যায় বাবুজি।

অপূর্ণ কহিল, স্মিত্রাও ঠিক এই কথাই বলেন।

রামদাস কহিল, না বলে ত উপায় নেই। এবং জানেন বলেই ত পথের দাবীর কথা তিনি। বাবুজি, আবৃত্ত্যাগের উৎসই এখানে। দেশের সেবার বনেদ ওর পরে, ওর নাগাল না পেলে যে আপনার সকল উত্তম, সকল ইচ্ছা মরুভূমির মত ছুদিনে শুকিয়ে উঠবে!

কথাগুলো অপূর্ণ এই নূতন শুনিল না, কিন্তু রামদাসের বৃকের মধ্যে হইতে যেন তাহার সশব্দে উঠিয়া আজ তাহার বৃকের উপর তীক্ষ্ণ আঘাত করিল। রামদাস আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ পদা সরাইয়া সাহেব প্রবেশ করিতে ছুজনেই চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সাহেব অপূর্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি চললাম। তোমার টেবিলের উপরে একটা চিঠি রেখে এসেছি, কালই তার জবাব দেওয়া প্রয়োজন, এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। উভয়েই ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল বেলা চারিটা বাজিয়া গেছে।

(১৭)

সাহেব চলিয়া গেলে আজ একটুখানি সকাল-সকাল আফিসের ছুটি দিয়া উভয়ে কয়ার-মাঠের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। পাঁচটায় মিটিং শুরু হইবার কথা তাহার আর বিলম্ব নাই। এই দিকটায় গাড়ী মিলে না, সুতরাং একটু দ্রুত না গেলে সময়ে পৌছানো যাইবে কি না সন্দেহ। পথের মধ্যে অপূর্ণ কথাবার্তা প্রায় কিছুই বলিল না। তাহার জীবনের আজ একটা বিশেষ দিন। আশঙ্কা ও আনন্দের উত্তেজনায় তাহার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। কারিকর ও মূলি-মজুদের সম্বন্ধে

কতক একখানা পুস্তক হইতে, এবং কতক রামদাসের নিকট সে যোগাড় করিয়া লইয়াছিল, সেই সমস্ত মনে মনে সাজাইয়া গুছাইয়া অপূর্ণ নিঃশব্দে মহলা দিতে দিতে চলিতে লাগিল। ১৮৬৩ সালে বোম্বাইয়ের কোন্‌খানে সর্বপ্রথমে তুলার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তারপরে সেইগুলি বাড়িয়া বাড়িয়া আজ তাহাদের সংখ্যা কত দাঁড়াইয়াছে, তখন কুলি-মজুরদের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল, কিরূপ দিন-রাত্রি মেহমত করিতে হইত, এবং এই লইয়া কবে বিলাতের তুলার কলের মালিকদের সহিত ভারতবর্ষীয় মালিকদের প্রথম বিবাদের সূত্রপাত হয়, এবং কারখানা-আইন কোন্‌ সনের কোন্‌ তারিখে কি কি বাধা অতিক্রম করিয়া পাশ হইয়া এদেশে প্রথম প্রচলিত হয় এবং সর্ব তাহাতে কি ছিল, এবং এখনই বা সেই আইন পরিবর্তিত হইয়া কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তখনকার ও এখনকার বিলাতের ও ভারতবর্ষের মজুরির হারে পার্থক্য কতখানি, ইহাদের সজ্জ-বন্ধ করিবার কল্পনা কবে এবং কে উদ্ভাবন করিয়াছিল, তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, সে-দেশের ও এ-দেশের শ্রমিকগণের মধ্যে স্থনীতি ও দুর্নীতির তুলনা-মূলক আলোচনা করিলে কি দেখা যায় এবং সংসারে লাভ-ক্ষতির পরিমাণ তাহাতে কোথায় নিদ্রিষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি সংগ্রহমালার কোথাও না খেই হারাইয়া যায় এই ভয়ে সে আপনাকে আপনি বার বার সতর্ক করিল। তাহার স্বরণ-শক্তি তীক্ষ্ণ ছিল, বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ যে ভুলিয়া যাইবে না, অনেকগুলি একজামিন ভাল করিয়া পাশ করার ফলে এ ভর তাহার ছিল। স্মরণ্য মুখ দিয়া তাহার এই সকল নিরতি সারগর্ভ বাক্যধারা কখনো বা উচ্চ-সপ্তকে, কখনো বা গম্ভীর খাদে, কখনো বা হৃৎকার শব্দে গজিয়া গজিয়া এক সময়ে যখন সমাপ্ত হইবে তখন বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর করতালি ধ্বনি হয়ত বা সহজে থামিতেই চাহিবে না। স্থনীতির প্রসঙ্গ দৃষ্টি সে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। আর ভারতী! এইটুকু

সময়ে এতখানি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সে যে কি করিয়া আয়ত্ত করিল ইহারই আনন্দিত বিষয়ে মুখ তাহার সমুজ্জল ও চোখের দৃষ্টি সজল হইয়া একমাত্র তাহারই মুখের পরে নিপতিত হইয়াছে, কল্পনায় প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়া অপূর্বর শিরার রক্ত সবেগে বহিতে লাগিল। তাহার দ্রুত পদক্ষেপের সমান তালে পা ফেলিয়া চলা তলওয়ারকরের পক্ষে আজ যেন দুর্লভ হইয়া পড়িল। তাহারা মাঠে পৌঁছিয়া দেখিল তথায় তিল ধারণের স্থান নাই, লোক জমিয়াছে যে কত তাহার সংখ্যা হয় না। সেদিনকার বক্তা হিসাবে অপূর্বকে যাহারা চিনিতে পারিল তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল, যাহারা চিনিত না তাহারাও দেখা-দেখি সরিয়া দাঁড়াইল। বিপুল জনতার মাঝখানে মাচা বাধা। ডাক্তার আজিও ফিরেন নাই, তাই শুধু তিনি ছাড়া পথের-দাবীর সকল সভ্যই উপনীত। বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া কোনমতে ভিড় ঠেলিয়া অপূর্ব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মাচার উপরে একখানা বেক তখনও খালি ছিল, চোখের ইঙ্গিতে নির্দেশ করিয়া স্মিত্রা সেইখানে তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। মাচার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া পাঞ্জাবী একজন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বক্তৃতা দিতেছিল, বোধকরি সে জবাব-পাওয়া মিস্ত্রি কিম্বা এমনি কিছু একটা হইবে, অপূর্বদের অভ্যাগমে ক্ষণকাল মাত্র বাধা পাইয়া পুনশ্চ দ্বিগুণ তেজে চীৎকার করিতে লাগিল। ভাল বক্তার কাছে জনতা যুক্তিতর্ক চাহে না, যাহা মন্দ তাহা কেন মন্দ এ খবরে তাহাদের আবশ্যক হয় না, শুধু মন্দ যে কত মন্দ অসংখ্য বিশেষণ যোগে ইহাই শুনিয়া তাহারা চরিতার্থ হইয়া যায়। পাঞ্জাবী মিস্ত্রির প্রচণ্ড বলার মধ্যে বোধকরি এই গুণটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তারিত থাকায় শ্রোতার দল যে কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা যাইতেছিল। অকস্মাৎ কি যেন একটা ভয়ানক কিয় ঘটিল। মাঠের কোন্ এক প্রান্ত হইতে অগণিত চাপা কণ্ঠে সত্রাস কলরব উঠিল,

এবং পরক্ষণেই দেখা গেল বহু লোক ঠেলা-ঠেলি করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এবং তাহাকেই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পিষিয়া মাড়াইয়া প্রকাণ্ড বড়-বড় ঘোড়ায় চড়িয়া বিশ-পঁচিশ জন গোরা পুলিশ কাম্‌চারি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তাহাদের একহাতে লাগাম এবং অগ্র হাতে চাবুক,—কোমরবন্ধে পিস্তল ঝুলিতেছে। তাহাদের কাঁধের লোহার জাল ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এবং রাঙা মুখ জ্বোদে ও অন্তর্যমান সূর্য্যকিরণে একেবারে সিঁজুরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি বক্তৃতা দিতেছিল তাহার বজ্রকণ্ঠ হঠাৎ কখন নীরব হইল, এবং মঞ্চ হইতে নীচের ভিড়ের মধ্যে চক্ষের পলকে সে যে কি করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইল জানা গেল না।

সদ্যর গোরা মঞ্চের দ্বারে ঘেসিয়া আসিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল, মিটিং বন্ধ করিতে হইবে।

সুমিত্রা এখনও আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তাহার উপবাস-ক্লিষ্ট মুখের পরে পাণ্ডুর ছায়া পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

সে কহিল, হুকুম।

কার হুকুম ?

গবর্ণমেন্টের।

কিসের জগ ?

ট্রাইক করার জগ মজুরদের ক্ষাপাইয়া তোলা নিষেধ।

সুমিত্রা বলিল, বুঝা ক্ষেপিয়ে দিয়ে তামাসা দেখবার আম'র সময় নেই। ইউরোপ প্রভৃতি দেশের মত এদের দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়াই এই মিটিঙের উদ্দেশ্য।

সাহেব চমকিয়া কহিল, দলবদ্ধ করা ? কার্মের বিরুদ্ধে ? সে তো এদেশে ভয়ানক বে-আইনি। তাতে নিশ্চয় শাস্তিভঙ্গ হতে পারে।

সুমিত্রা কহিল, নিশ্চয়, পারে বই কি ! যে দেশে গভর্নমেন্ট মানেই ইংরাজ ব্যবসায়ী, এবং সমস্ত দেশের রক্ত শোষণের জন্তই যে দেশে এই বিরাট যন্ত্র খাড়া করা—

বক্তব্য তাহার শেষ হইতে পাইলনা, গোরার রক্ত চক্ষু আগুন হইয়া উঠিল। ধমক দিয়া বলিল, দ্বিতীয়বার এ কথা উচ্চারণ করলে আমি আরেষ্ট করতে বাধ্য হব।

সুমিত্রার আচরণে এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না, শুধু ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া মুচকিয়া একটু হাসিল। কহিল, সাহেব, আমি অসুস্থ এবং অতিশয় দুর্বল। না হলে শুধু দ্বিতীয়বার কেন, একথা একশ'বার চীৎকার করে এই লোকগুলিকে শুনিয়ে দিতাম। কিন্তু আজ আমার শক্তি নেই। এই বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

এই পীড়িত রমণীর সহজ শাস্ত্র হাসিটুকুর কাছে সাহেব মনে মনে বোধ হয় লজ্জা পাইল, অলরাইট ! আপনাকে সাবধান করে দিলাম। বাড়ি খুলিয়া কহিল, মিটিং বন্ধ করবার আমার লক্ষ্য আছে, কিন্তু ভেঙে দেবার নেই। দশমিনিট সময় দিলাম, দু'চার কথায় এদের শান্তভাবে যেতে বলে দিন। আর কখনো যেন এরূপ না হয়।

কিছুদিন হইতে প্রায় উপবাসেই সুমিত্রার দিন কাটিতেছিল। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও সে আজ সামান্য একটু জ্বর লইয়াই শ্রম উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন শ্রান্তি ও অবসাদ তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। চৌকির পিঠে মাথা হেলান দিয়া সে অসুখে ডাকিয়া কহিল, অপূর্ববাবু, দশমিনিট মাত্র সময় আছে,—হয়ত তাও নেই। চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিন সজ্জবদ্ধ না হলে এদের আর উপায় নেই। কারখানার মালিকেরা আজ আমাদের যে অপমান করলে ঋণ্য হলে এরা যেন তার শোধ নেয়। বলিতে বলিতে তাহার দুর্বল কণ্ঠ ভাঙিয়া

পড়িল, কিন্তু সভানেত্রীর এই আদেশ শুনিয়া অপূর্বর সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। বিহ্বলনেত্রে হুমিত্রার প্রতি চাহিয়া কহিল, উত্তেজিত করা কি বে-আইনি হবে না?

হুমিত্রা বিস্মিত মূহুর্তে বলিল, পিস্তলের জোরে সভা ভেঙে দেওয়াই কি আইন-সঙ্গত? বৃথা রক্তপাত আমি চাইনে, কিন্তু এই কথাটা সকল শক্তি দিয়ে আপনি শুনিয়ে দিন আজকের অপমান প্রমিকেরা যেন কিছুতে না ভোলে।

পথের-দাবীর অগ্ৰ চার পাঁচ জন পুরুষ সভা যাহারা মঞ্চের দূরে আসীন ছিল চেহারা দেখিয়াই মনে হয় তাহারা সামান্য এবং তুচ্ছ ব্যক্তি। হয়ত, কারিগর কিম্বা এম্মনি কিছু হইবে। অপূর্ব নূতন হইলেও সমিতির শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট সভ্য। এত বড় জনতাকে সপোধন করিবার ভার তাই তাহার প্রতি পড়িয়াছে। অপূর্ব শুককণ্ঠে কহিল, আমি ত হিন্দী ভাল জানিনে।

হুমিত্রা কথা কহিতে পারিতেছিল না, তথাপি কহিল, যা' জানেন তাতেই ছ'কথা বলে দিন অপূর্ববাবু, সময় নষ্ট করবেন না।

অপূর্ব সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। ভারতী মুখ ফিরাইয়া ছিল, তাহার অভিমত জানা গেল না, কিন্তু জানা গেল সন্দ্বীপ-গোরার মনের অবস্থা। তাহার সহিত অত্যন্ত কাছে, অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অত্যন্ত কঠিন চোখো-চোখি হইল। বলিবার জন্ত অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার ঠোঁট নড়িতে লাগিল, কিন্তু সেই দুটি কম্পিত ওষ্ঠাধর হঠাৎ বাঙলা ইংরাজি হিন্দী কোন ভাষাই ব্যক্ত হইল না। কেবল কাস্ত পাণ্ডুর মুখের পরে ব্যক্ত যাহা হইল, তাহা আর যাহারই হৌক পথের-দাবীর সভ্যদের জন্ত নহে।

তলওয়ারকর উঠিয়া দাঁড়াইল। হুমিত্রাকে লক্ষ করিয়া কহিল, আমি বারজির বন্ধু। আমি হিন্দী জানি। আদেশ পাই ত ওঁর বক্তব্য

রামি চেষ্টায়ে সকলকে শুনিয়ে দিই। ভারতী মুখ ফিরাইয়া চাহিল, হুমিত্রা বিস্মিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া স্থির হইয়া রহিল এবং এই দুটি নারীর ঈর্ষক চোখের সম্মুখে লজ্জিত, অভিভূত, বাক্যহীন অপূর্ণ শত্ৰু নতমুখে হৃদবস্তুর মর্ত্য বসিয়া পড়িল।

রামদাস ফিরিয়া দাঁড়াইল। এবং, তাহার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখের বক্ষুক, ভীত, চঞ্চল জনসমষ্টিকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, গাই সব! আমার অনেক কথা বলবার ছিল, কিন্তু এরা গায়ের জোরে মার্মাদের মুখ বন্ধ করেছে। এই বলিয়া সে আঙুল দিয়া সম্মুখের লিঙ্গ শওয়ারগণকে দেখাইয়া বলিল, এই ডালকুত্তাদের যারা আমাদের বন্ধকে, তোমাদের বন্ধকে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা। তারা কিছুতেই চায় না যে কেউ তোমাদের ঐক্য হৃদিশার কথা তোমাদের জানায়। তোমরা তাদের কল চালাবার, বাবা বইবার জানওয়ার! অথচ, তোমরাও যে তাদের মত মাল্লব, তম্নি পেট ভরে খাবার, তেম্নি প্রাণ খুলে আনন্দ করবার ভ্রমগত যদিও তোমরাও যে ভগবানের কাছ থেকে পেয়েচ এই সত্যটাই এরা কল শক্তি, সকল শঠতা দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে গিয়া। শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে তোমরাও মাল্লব, তোমরা শত জুখী, ত দরিদ্র, যত অশিক্ষিতই হও তবুও মাল্লব, তোমাদের মাল্লবের বাবী কোন ওজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তা হলে, এই গাটা কতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু? এই সত্য কে তোমরা বুঝবে না? এ যে কেবল ধর্মীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার পড়াই! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,—জৈন, শিখ কোন কিছুই নেই,—আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক! তোমাদের

করিতে লাগিল,—থামো, রামদাস থামো। এই নিঃসহায় নির্দীক্ষিত বিদেশে যে তোমার স্ত্রী আছে,—তোমার ছোট্ট এক ফোঁটা মেয়ে আছে!

রামদাস কর্ণপাতও করিল না। চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল—এরা অত্যাচারী! এরা ভীক! সত্যকে এরা কোনমতেই তোমাদের সন্তে দিতে চায় না! কিন্তু এরা জানে না সত্যকে গলা টিপে মারা যাবে না। সে চিরজীবী! সে অমর! গোরা ইহার অর্থ বুঝিল না। কিন্তু অকস্মাৎ সহস্র লোকের সর্বাঙ্গ হইতে ঠিকরিয়া আসিয়া যেন তীক্ষ্ণ উত্তাপের বায়ু তাহার মুখে লাগিল। সে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, এ চলবে না। এ রাজদ্রোহ!

চক্ষের পলকে পাঁচ ছয় জন ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া রামদাসের দুই হাত ধরিয়া তাহাকে সবলে টানিয়া নীচে নামাইল। তাহার দীর্ঘ দেহ ঘোড়া ও ঘোড়-সওয়ারের মাঝখানে এক মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল, কিন্তু তীক্ষ্ণ তীর কণ্ঠস্বর তাহার কিছুতেই চাপা পড়িল না, এই বিক্ষুব্ধ বিপুল জনতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল,—ভাই সকল, কখনো হয়ত আর আমাদের দেখবে না, কিন্তু মাহুষ হয়ে জন্মাবার মর্যাদা যদি না মনিবের পায়ে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে থাকে ত এত বড় উৎপীড়ন, এত বড় অপমান তোমরা সহ করো না!

কিন্তু কক্ষ তাহার শেষ না হইতেই যেন দক্ষ-যজ্ঞ বাড়িয়া গেল। ঘোড়া ছুটিল, চাবুক চলিল, এবং অবমানিত অভিভূত উদ্ভ্রান্ত শ্রমিকের দল উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে কে যে কাধের ঘাড়ে পড়িল এবং যে কাহার পদতলে গড়াইতে লাগিল তাহার ঠিকানা রহিল না।

জনকয়েক দলিত পিষ্ট আহত লোক ছাড়া সমস্ত মাঠ জনশূন্য হইতে বিলম্ব ঘটিল না। কোনমতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যাহারা তখনও চলিয়াছিল তাহাদেরই প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া স্মিত্রা স্তব্ধ

হইয়া রহিলেন, এবং তাহারই অনতিদূরে বসিয়া অপূর্ব ও আর একজন নির্ঝাঁক নতমুখে তেমন বিমূঢ়ের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

যে ব্যক্তি গাড়ী ডাকিতে গিয়াছিল মিনিট দশেক পরে গাড়ী লইয়া আসিলে স্ত্রীসত্তা নিঃশব্দে ভারতীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। নিজে হইতে কথা না কহিলে তাহার চিত্তার ব্যাঘাত করিতে কেহ তাঁহাকে ব্যর্থ প্রস্ত করিত না। বিশেষতঃ, আজ তিনি অস্থস্থ, শ্রান্ত ও উৎপীড়িত। ভারতী কিরিয়া আসিয়া কহিল, চলুন।

অপূর্ব মুখ তুলিয়া চাহিল, ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আমাকে যেতে বলেন ?

ভারতী কহিল, আমার বাড়ীতে।

অপূর্ব কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল। শেষে আস্তে আস্তে বলিল, আপনাতা ত জানেন সমিতির আমি অযোগ্য। ওখানে আর ত আমার ঠাই হতে পারে না।

ভারতী প্রশ্ন করিল, তা'হলে কোথায় এখন যাবেন ? বাসায় ?

বাসায় ? একবার যেতে হবে,—এই বলিয়াই অপূর্বর চক্ষু সজল হইয়া আসিল; তাহা কোনমতে সম্বরণ করিয়া বলিল, কিন্তু এই বিদেশে আর একটা জায়গায় যে কি করে যাব আমি ভেবে পাইনে ভারতী !

স্ত্রীসত্তা গাড়ীর মধ্যে হইতে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিয়া কহিলেন তোমরা এস।

ভারতী পুনশ্চ কহিল, চলুন।

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পথের-দাবীতে আর আমার স্থান নেই।

ভারতী হঠাৎ যেন তাহার হাত ধরিতে গেল, কিন্তু সামলাইয়া লইল এক মুহূর্ত তাহার মুখের পরে দুই চক্ষের সমগ্র দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া চুপি চুপি কহিল, পথের-দাবীতে স্থান নাও থাকতে পারে, কিন্তু আর একটা

দাবী থেকে আপনাকে স্থানচ্যুত করতে পারে সংসারে এমন ত কিছুই নেই, অপূর্ববাবু!

গাড়ী হইতে স্মিত্রা পুনশ্চ অসহিষ্ণুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমাদের আসতে কি দেরী হবে ভারতী?

ভারতী হাত নাড়িয়া গাড়োয়ানকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিয়া কহিল, আপনি যান, এটুকু আমরা হেঁটেই যাবো।

পথে চলিতে চলিতে অপূর্ব হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি আমার সঙ্গে চল ভারতী!

ভারতী কহিল, সঙ্গেইত যাচ্ছি।

অপূর্ব বলিল, সে নয়। তলওয়ারকরের জ্বর কাছে আমি কি করে যাবো, কি গিয়ে তাঁকে বোলব, কি তাঁর উপায় কোরব আমি ত কোন মতেই ভেবে পাইনে। রামদাসকে এখানে সঙ্গে করে আনবার ছবুদ্ধি আমার কেন হল?

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব কহিতে লাগিল, এই বিদেশে হঠাৎ কি সর্বনাশই হয়ে গেল! আমি ত কূল-কিনারা দেখতে পাইনে।

ভারতী কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না। উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিবার পরে অপূর্ব উপায়-হীন ছশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সহসা গজিয়া উঠিল, আমরা দোষ কি? বার বার সাবধান করে দিলেও কেউ যদি গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলে তাকে বাঁচাবো আমি কি কোরে? আমি কি বলেছিলাম যা' তা' বক্তৃতা দিতে। স্বী আছে, নেয়ে আছে, যা' সংসার আছে এ হুঁস্ যা' নেই—সে মরবে না তো মরবে কে? এতটুকু আবার ছবুদ্ধি জেল!

ভারতী বলিল, আপনি কি তাঁর জ্বর কাছে এখন যাবেন না?

অপূর্ব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, যেতে হবে বই কি।

কিন্তু, সাহেবকেই বা কাল কি জবাব দেব? তোমাকে কিন্তু বলে রাখছি ভারতী, সাহেব একটা কথা বললেই আমি চাকরি ছেড়ে দেবো।

দিয়ৈ কি করবেন?

বাড়ী চলে যাবো। এদেশে মাতুষ থাকে?

ভারতী বলিল, তাঁর উদ্ধারের চেষ্টাও করবেন না?

অপূর্ব থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল না একজন ভাল ব্যাটিকে। কাছে যাই ভারতী। আমার প্রায় একহাজার টাকা আছে,—এতে হবে না? আমার ঘড়িটিড়িগুলো বিক্রী করলে হয়ত, আরও পাঁচ ছ'শ টাকা হবে। চলনা যাই।

ভারতী বলিল, কিন্তু তাঁর জ্বর কাছে যাওয়া যে সর্বোপায় প্রয়োজন অপূর্ববাবু! আমার সঙ্গে আর যাবেন না, এইখান থেকেই একটা গাড়ী নিয়ে স্টেশনে চলে যান। তাঁর কি চাই, কি অভাব, অন্ততঃ একটা খবর দেওয়াও যে বড় দরকার।

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া মাথ দিল, কিন্তু তথাপি সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে লাগিল। ভারতী বলিল, এটুকু আমি একাই খেঁত পারবো, আপনি ফিরুন।

জবাব দিতে বোধ হয় অপূর্বর বাধিতেছিল, কিন্তু ফণেক মাত্র। তাহার পরেই কহিল, আমি একলা যেতে পারবনা।

ভারতী বলিল, বাসা থেকে তেওয়ারীকে না হয় সঙ্গে নেবেন।

না, তুমি সঙ্গে চল।

আমার যে জরুরি কাজ আছে!

তা' হোক, চল।

কিন্তু কেন আমাকে এত করে জড়াচ্ছেন অপূর্ববাবু?

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল।



ভারতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিল, কহিল, আচ্ছা, চলুন আমার সঙ্গে। নিজের কাজটুকু আগে সেরে নিই।

পথের মধ্যে ভারতী সহসা এক সময়ে কহিল, যে আপনাকে চাকরি করতে বিদেশে পাঠিয়েছে সে আপনাকে চেনেনা। তিনি মা হলেও, না। তেওয়ারী দেশে যাচ্ছে, আমি নিজে গিয়ে উদ্বোধন করে তার সঙ্গে আপনাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবো।

অপূর্ণ মৌন হইয়া রহিল। ভারতী বলিল, কই, উত্তর দিলেন না যে বড় ?

অপূর্ণ কহিল, উত্তর দেবার কিছুত নেই। মা বেঁচে না থাকলে আমি সন্ন্যাসী হতুম।

ভারতী আশ্চর্য হইয়া বলিল, সন্ন্যাসী ? কিন্তু মা তো বেঁচে আছেন ?

অপূর্ণ কহিল, হাঁ। দেশের পল্লীগ্রামে আমাদের একটা ছোট বাড়ী আছে, মাকে আমি সেইখানে নিয়ে যাবো।

তারপরে ?

আমার যে এক হাজার টাকা আছে তাই দিয়ে একটা ছোট্ট মন্দির দোকান খুলবো। আমাদের দুজনের চলে যাবে।

ভারতী কহিল, তা যেতে পারে ! কিন্তু হঠাৎ এর দরকার হল কিং ? ১

অপূর্ণ বলিল, আজ আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি। শুধু মা ছাড়া সংসারে আমার দায় নেই। ভগবান করুন এর বেশি যেন না আরি কারো কাছে কিছু চাই।

২ ভারতী পলকমাত্র তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা আপনাকে বুঝি বড় ভালবাসেন ?

অপূর্ণ কহিল, হাঁ। চিরকাল মা'র দুখে দুখেই কাটলো, কেবল

ভয় হয় তা আর যেন না বাড়ে। আমার সকল কাজে-কর্মে আমার আধখানা যেন মা হয়ে আমার আর আধখানাকে দিবারাত্র আঁকড়ে ধরে থাকে। এ থেকে আমি এক মুহূর্ত ছাড়া পাইনে, ভারতী, তাই আমি ভীতু, তাই আমি সকলের অশ্রদ্ধার পাত্র। এই বলিয়া তাহার মুখ দিয়া সহসা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।

ইহার জবাব ভারতী দিল না, কেবল হাতখানি তাহার ধীরে ধীরে অপূর্বের হাতের মধ্যে ধরা দিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, অপূর্ব উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, রামদাসের পরিবারের কি উপায় করবে ভারতী? শুধু দাসী ছাড়া এদেশে তাদের দেশের লোক বোধ করি কেউ নেই। থাকুলেই বা কেউ কি তাদের ভার নেবে?

ভারতী নিজেও কিছু ভাবিয়া পায় নাই, শুধু সাহস দিবার জন্মই কহিল, চলুন ত গিয়ে দেখি। উপায় একটা হবেই।

অপূর্ব বুকিল ইহা ফাঁকা কথা। তাহার মন কোন সাহসনাই মানিল না, কহিল, তোমাকে হয়ত সেখানে থাকতে হবে।

কিন্তু আমি ত ক্রীশ্চান, তাঁদের কি কাজেই বা লাগুবো?

তা বটে। কথাটা নূতন করিয়া অপূর্বের বিধিল।

উভয়ে বাসায় আসিয়া যখন পৌছিল তখন সন্ধ্যা বহুক্ষণ উদ্ভীর্ণ হইয়া গেছে। এই রাত্রে কেমন করিয়া যে কি হইবে চিন্তা করিয়া মনে মনে তাহাদের ভয় ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। নীচের ঘর খোলা ছিল, ভিতরে পা দিয়াই ভারতী দেখিতে পাইল গুদিকের খোলা জানালার ধারে ইজি চেয়ারে কে একজন শুইয়া আছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই ভারতী চিনিতে পারিয়া উল্লাসে কলরব করিয়া উঠিল, ভাস্করবাবু, কখন এলেন আপনি? সুমিত্রাদিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না!

অপূর্ণ কহিল, ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু, আমাদের একাউন্টেন্ট রামদাস তলওয়ারকরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

ভারতী বলিল, ইন্সপেক্টর তাঁর বাসা। সেখানে গুপ্তী আছে, মেয়ে আছে, তাঁরা এখনো কিছুই জানেন না।

অপূর্ণ বলিল, অত দূরে এই অন্ধকার রাতে—কি ভয়ানক বিপদই ঘটলো ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার হাই তুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া হাসিলেন, ভারতীকে কহিলেন, আমি বড় শ্রান্ত, আমাকে একটু চা তৈরী করে থাওয়াতে পারো ভাই?

ভারতী বলিল, পারি, কিন্তু আমাদের যে এখুনি বেরোতে হবে ডাক্তারবাবু।

কোথায়?

ইন্সপেক্টর। তলওয়ারকরবাবুর বাসায়।

কোন প্রয়োজন নেই।

অপূর্ণ সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, প্রয়োজন নেই কি রকম ডাক্তারবাবু? তাঁর বিপন্ন পরিবারের ব্যবস্থা করা, অন্ততঃ একটা খোঁজ খবর নেওয়া ত প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ভার আমার; আপনারা বড় জোর এই অন্ধকারে সাব্বারাজি ধরে ইন্সপেক্টর বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পারবেন,—শেষ পর্যন্ত হয়ত বাড়ীটাও চিনে বার করতে পারবেন না। এই বলিয়া তিনি পুনরায় হাস করিয়া কহিলেন, তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি বসুন, এবং ভারতী চা তৈরী করে আনুন। কিন্তু আপনার বুকি চলেনা? তা বেশ,—হোটেলের বামুন ঠাকুর পবিত্রভাবে কিছু খাবার তৈরী করে দিয়ে যাক, আহালাদ করে বিশ্রাম করুন।

ভারতী নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্লচিত্তে চা তৈরী করিতে উপরে যাইতেছিল, কিন্তু অপূর্ব কিছুই বিশ্বাস করিল না। ডাক্তারের সমস্ত কথা-বার্তাই তাহার কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকিয়া অতিশয় খারাপ বোধ হইল। ভারতীকে উদ্দেশ্য করিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, এই রাত্রে কষ্ট করা থেকে তুমি হয়ত বেঁচে গেলে, কিন্তু আমার দায়িত্ব ঢের বেশি। যত রাত্রিই হোক আমাকে ঠৈখানে যেতেই হবে।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া ভারতী থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনই ডাক্তারের চোখের দিকে চাহিয়া আবার যচ্ছন্দমনে কাজে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু একখণ্ড মোমবাতি জ্বালাইয়া পকেট হইতে কয়েকখানা চিঠি বাহির করিয়া জবাব লিখিতে বসিলেন। মিনিট দশেক নীরবে অপেক্ষা করিয়া অপূর্ব বিরক্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, চিঠিগুলো কি অত্যন্ত জরুরি ?

ডাক্তার মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, হাঁ।

অপূর্ব বলিল, শুদিকের একটা ব্যবস্থা হওয়াও ত কম জরুরি নয়। আপনি কি তাঁর বাসায় কাউকে পাঠাবেন না ?

ডাক্তার কহিলেন, এত রাত্রে ? কাল সকালের পূর্বে বোধ হয় আর লোক পাওয়া যাবে না।

অপূর্ব বলিল, তাহলে তার জন্ত আর আপনি চিন্তিত হবেন না, সকালে আমি নিজেই যেতে পারবো। ভারতীকে নিষেধ না করলে আমরা আজই যেতে পারতাম, এবং আমার মনে হয় সেইটেই সবচেয়ে ভাল হতো।

ডাক্তারের চিঠি লেখার বাধা পড়িল না, কারণ তিনি মুখ তুলিবারও অবকাশ পাইলেন না, শুধু বলিলেন, আবশ্যক ছিল না।

অপূর্ব অন্তরের উদ্ভাষা যথাসাধ্য চাপিয়া কহিল, আবশ্যকতার ধারণা এক্ষেত্রে আপনার এবং আমার এক নয়। আমার সে বন্ধু।

ভারতী চায়ের সরঞ্জাম লইয়া নীচে আসিল এবং পেয়ালা দুই চা তৈরী করিয়া দিয়া কাছে বসিল। ডাক্তারের চিঠি লেখা এবং চা খাওয়া দুই কাজই এক সঙ্গে চলিতে লাগিল। মিনিট দুই তিন নিঃশব্দে কাটিবার পরে সহসা ভারতী অভিমানের স্বরে বলিয়া উঠিল, 'আপনি সদাই ব্যস্ত। ছুদণ্ড যে আপনার কাছে বসে কথা শুনবো সে সময়টুকুও আমরা পাইনে।

ডাক্তারের অগ্রমনস্ক কানের মধ্যে গিয়া রমণীর এই অভিমানের স্বর বাজিল, তিনি চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ সরাইয়া হাসিমুখে কহিলেন, করি কি ভাই, এই ছোটোর ট্রেনেই আবার রওনা হতে হবে।

সংবাদ শুনিয়া ভারতী চকিত হইল, এবং অপূর্বর মনের সংশয় তাহার বন্ধুর সন্মুখে একেবারে ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, একটা রাতও কি আপনি বিশ্বামের অবকাশ পাবেন না ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া কহিলেন, আমার শুধু একটি দিনের অবসর আছে ভাই ভারতী, সে কিন্তু আজও আসেনি।

ভারতী বুকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কবে আসবে ?

ডাক্তার ইহার উত্তর দিলেন না।

অপূর্বর মনের মধ্যে কেবল একটা কথা তোলা-পাড়া করিতেছিল, সে তাহারই স্বপ্ন ধরিয়া বলিল, সমিতির সভ্য না হয়েও রামদাস যে শান্তি ভোগ করতে যাচ্ছে তা অসাদারণ।

ডাক্তার কহিলেন, শান্তি নাও হতে পারে।

অপূর্ব কহিল, না হয় ত সে তার ভাগ্য। কিন্তু যদি সমস্ত অপরাধ আমার। আমিই তাকে এনেছিলাম।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু মুচকিয়া হাসিয়া চুপ করিলেন।

অপূর্ব কহিতে লাগিল, দেশের জন্ত যে ব্যক্তি ছবছর জেল খেটেছে,

অসংখ্য বেতের দাগ যার পিঠ থেকে আজও মোছনি, এই বিদেশে স্ত্রী পুত্র যার শুধু তারই মুখ চেয়ে আছে তার এতবড় সাহস অসামান্য! এর আর তুলনা নেই।

তাহার বন্ধুর প্রতি উচ্ছ্বসিত এই অকৃত্রিম প্রশংসা-বাক্যের মধ্যেও একটা গোপন আঘাত ছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। ডাক্তার মুখ উজ্জল করিয়া কহিলেন, তাতে আর সন্দেহ কি অপূর্ববাবু! পরাদীনতার আগুনে বৃকের মধ্যে যার অহোরাত্র জলে যাচ্ছে এ ছাড়া তার তো উপায় নেই। সাহেবের দোকানের বড় চাকরি বা ইন্সিনের বাসায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কিছুই তাকে ঠেকাতে পারেনা,—এই তার একটি মাত্র পথ।

দুশ্চিন্তা ও তীব্র সংশয়ে অপূর্বের বুদ্ধি ও জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া না থাকিলে সে এত বড় ভুল করিতে পারিত না। ডাক্তারের উক্তিকে সে শ্লেষ কল্পনা করিয়া হঠাৎ যেন ফেপিয়া গেল। কহিল, আপনি তাঁর মহত্ত্ব অনুভব না করিতে পারেন, কিন্তু সাহেবের দোকানের চাকরি তলগদারকরের মত নাহুষকে ছোট করে দিতে পারে না। আমাকে আপনি যত ইচ্ছে ব্যঙ্গ করুন, কিন্তু রামদাস কোন অংশেই আপনার ছোট নয়! এ আপনি নিশ্চিত জানবেন।

ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, আমি নিশ্চিতই জানি, তাঁকে ত আমি ছোট বলিনি অপূর্ববাবু!

অপূর্ব কহিল, বলেছেন। তাঁকে এবং আমাকে আপনি পরিহাস করেছেন। কিন্তু আমি জানি জন্মভূমি তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। সে নিভীক! সে বীর! আপনার মত সে লুকিয়ে বেড়ায় না। আপনার মত পুলিশের ভয়ে ছদ্মবেশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে না! আপনি তু ভীক।

প্রচণ্ড বিষ্ময়ে ভারতী অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর সে

সহিতে পারিল না। দৃষ্টকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আপনি কাকে কি বলছেন অপূর্ববাবু? হঠাৎ পাগল হয়ে গেলেন কি?

অপূর্ব কহিল, না পাগল হইনি। উনি যেই হো'ন, রামদাস তলওয়ারকরের পদ্মলির যোগ্য ন'ন, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে যোলব। তার তেজ, তার বাগ্মিতা, তার নির্ভীকতাকে ইনি মনে মনে ঈর্ষা করেন। তাই তোমাকে যেতে দিলেন না, তাই আমাকে কৌশলে বাধা দিলেন।

ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইল। আপনাকে অপরিচীত বস্ত্রে সংযত করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, আপনাকে আমি অপমান করতে পারব না, কিন্তু এখান থেকে আপনি যান অপূর্ববাবু। আপনাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম। ভয়ে যার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না সে উম্মাদের এখানে ঠাই নেই। আপনার কথাই সত্য, পথের-দাবীতে আপনার স্থান হবে না। এর পরে আর কোন ছলে, কোন দিন আমার বাসায় ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।

অপূর্ব নিরন্তরে উঠিয়া দাঁড়াইতেই ডাক্তার তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, আর একটু বহুত অপূর্ববাবু, এই অন্ধকারে একলা যাবেন না। আমি ষ্টেশনে যাবার পথে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিখে যাবো।

অপূর্বের চেতনা ফিরিয়া আসিতেছিল, সে পুনরায় অদোমুখে বসিয়া পড়িল।

ভুক্তাবশিষ্ট বিস্কুটগুলি ডাক্তার পকেটে পুরিতেছিলেন দেখিয়া ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, শুকি হচ্ছে আপনার?

রসদ সংগ্রহ করে রাখছি ভাই।

সত্য, সত্যই আজ রাত্রে যাবেন না কি?

নইলে কি মিথ্যামিথ্যাই অপূর্ববাবুকে ধরে রাখলাম? সবাই

মিলে এমন অবিশ্বাস করলে আমি বাঁচি কি কোরে বল ত? এই বলিয়া তিনি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিতে ভারতী অভিমান করিয়া কহিল, না, আজ আপনার যাওয়া হবেনা, আপনি বড় ক্লান্ত। তা ছাড়া স্মিত্রাদিদি অসুস্থ, আপনি কেবলি কোথায় চলে যাবেন,—একটা কথা শুনতে পাইনে, একটা উপদেশ নিতে পাইনে, পথের-দাবী একলা আমি চালাই কি করে বলুন ত? আমিও তাহলে যেখানে খুসি চলে যাবো।

লেখা চিঠিগুলি ডাক্তার তাহার হাতে দিয়া হাসিয়া কহিলেন, একখানি তোমার, একখানি স্মিত্রার, অত্থানি তোমাদের পথের-দাবীর! আমার উপদেশ বল, আদেশ বল, সবই এর মধ্যে পাবে।

চিঠিগুলি মুঠার মধ্যে লইয়া ভারতী মুখ মলিন করিয়া বলিল, এবার কি আপনি বেশি দিনের জন্তে যাচ্ছেন?

দেবা ন জানন্তি,—বলিয়া ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন।

ভারতী কহিল, আমাদের মুশ্কিল হয়েছে, না মুখ দেখে, না কথা শুনে আপনার মনের কথা জানবার যো আছে। ঠিক করে বলে যান কবে ফিরবেন?

ঐ যে বোল্‌লাম, দেবা ন জানন্তি—

না তা হবেনা, সত্যি করে বলুন কবে ফিরবেন?

এত তাগাদা কেন বল ত?

ভারতী কহিল, কি জানি এবার কেমন যেন ভয় করচে। মনে হচ্ছে যেন সব ভেঙে-চুরে ছন্ন-ভন্ন হয়ে যাবে। বলিতে বলিতে সহসা তাহার চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া ডাক্তার রহস্যভরে কহিলেন, হবে, না গো, হবে না,—সব ঠিক হয়ে যাবে। বলিয়াই হঠাৎ ফিকু করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু এই মানুষটির সঙ্গে এমন মিছে-মিছি

বগড়া করলে কিন্তু সত্যিই কান্দতে হবে তা' বলে রাখছি। অপূর্ববাবু রাগ করেন বটে কিন্তু ভাল থাকে বাসেন তাকে ভালবাসতে জানেন। মাহুঘের মধ্যে যে হৃদয়বস্তুর আছে যে আমাদের সংসর্গে এখনো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় নি। ফুটন্ত পদ্মটির মত ঠিক তাজা আছে।

ভারতী কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল কিন্তু অপূর্ব হঠাৎ মুখ তুলিতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার দিগের মুখ বন্ধ হইয়া গেল।

এমনি সময়ে দ্বারের কাছে আসিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী থামিল, এবং অনতিকাল মধ্যেই দুই জন লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। একজনের পরিধানে আগাগোড়া সাহেবি পোষাক, ডাক্তার ভিন্ন বোধ করি সকলেরই অপরিচিত; আর একজন রামদাস তলওয়ারকর। অপূর্বর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কলরব করিয়া সে বন্ধুকে সন্ধান করিতে গেল না। রামদাস অগ্রসর হইয়া ডাক্তারের পদধূলি গ্রহণ করিল। অপূর্বর কাছে ইহা অদ্ভুত ঠেকিল। কিন্তু ডাক্তারের মুখের প্রতি সে শুধু নীরবে নেত্রপাত করিয়া নীরব হইয়াই রহিল।

ইংরাজি পোষাক পরা লোকটি ইংরাজিতেই কথা কহিলেন, বলিলেন, জামিনের জন্তই এত বিলম্ব ঘটিল। কেম্ বোধ হয় গবর্ণমেন্ট চালাবে না।

ডাক্তার মুহূ হাসিয়া বলিলেন, তার মানে গবর্ণমেন্টকে তুমি আজ্ঞা চেনোনি কৃষ্ণ আইয়ার।

এই কথায় রামদাস সহ্যে যোগ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত থেকে থানা পর্যন্ত আপনাকে সকল সময়েই সঙ্গে দেখেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কখন এত অন্তর্হিত হয়েছিলেন সেইটাই জানতে পারি নি!

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, অন্তর্ধানের গভীর কারণ ঘটেছিল রামদাদাবু। এমন কি রাতারাতি এখান থেকেও অন্তর্হিত হ'তে হ'ল।

রামদাস কহিল, সেদিন রেলওয়ে স্টেশনে আপনাকে চিন্তে পেরেছিলাম।

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, জানি। কিন্তু সোজা বাসায় না গিয়ে এত রাত্রে এখানে কেন?

রামদাস কহিল, আপনাকে প্রণাম করতে। পূনার সেন্টাল জেলে আমি যাবার পরেই আপনি চলে গেলেন। তখন স্বেযোগ পাইনি। নীলকান্ত যোগী কি হ'ল জানেন? সে তো আপনার সঙ্গেই ছিল।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ। ব্যারেকের পাঁচিল টপ্কাতে পারলে না বলে সিঙ্গাপুরে তার ফাঁসি হ'ল।

অপূর্বের কাছে এই সকল অচিন্ত্যমীয়া, অত্যন্ত দুঃস্থলের মত বোধ হইতে লাগিল। সে আর থাকিতে না পারিয়া অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, আপনারও কি তাহ'লে ফাঁসি হোতো?

ডাক্তার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া অপূর্বের মাথার চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল।

রামদাস উৎসুক হইয়া কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, একবার এই সিঙ্গাপুরেই আমাকে বছর তিনেক আটক থাকতে হয়েছিল, কর্তৃপক্ষরা আমাকে চেনেন। তাই সোজা-রাস্তাটা এড়িয়ে ব্যারেকের পথে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে টেভয়ে এসে পৌঁছুলাম। জোর কপাল! হঠাৎ বনের মধ্যে একটা হাতীর বাচ্চাও ভগবান পাইয়ে দিলেন। সেটা সঙ্গে থাকায় বরাবর তারি স্ববিধে হয়ে গেল। শেষে হাতীর বাচ্চা বিক্রী করে দিশি জাহাজে নারকেল চালানোর সঙ্গে মিছেকে চালান দিয়ে মাস তিনেকের মধ্যে একেবারে আরাকানে এসে পাড়ি জমалаম। খাসা থাকা গিয়েছিল রামদাসবাবু, হঠাৎ খানার মধ্যে আজ এক পরম বজুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা সাফাৎ! ভি. এ. চেলিয়া তাঁর নাম, বড্ড স্নেহ করেন আমাকে। বছরদিনের অদর্শনে

খুঁজতে খুঁজতে একেবারে সিদ্ধাপুর থেকে আসা মূল্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভাবে বোধ হয় খোঁজ পেয়েছেন। তবে, ভিড়ের মধ্যে তেমন নজর দিতে পারেন নি, নইলে পৈত্রিক গলাটার,—এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে গিয়া অকস্মাৎ অপূর্বের মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলেন,—ও কি অপূর্ব? কি হ'ল আপনার?

—অপূর্ব দাঁতে ঠোট চাপিয়া আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাঁহার কথা শেষ না হইতেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সবগে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

(১৮)

অপূর্বের এমন করিয়া বাহির হইয়া যাওয়াটা সকলকেই বিস্মিত করিল। ঘরে আলো বেশি ছিল না, কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক মুখের ভাব ও অশ্রু-বদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন অতিশয় বে-মানান দেখাইল। ব্যারিষ্টার কৃষ্ণ আইয়ার ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে ডাক্তার? অত্যন্ত সেটিমেণ্টাল! তাঁহার শেষ কথাটার উপরে স্পষ্ট একটা অভিযোগের খোঁচা ছিল। অর্থাৎ, এ সকল লোক এখানে কেন?

ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন—তলওয়ারকর। কহিলেন, ইনি মিষ্টার হালদার—অপূর্ব হালদার। এক আফিসে আমরা কাজ করি, আমার স্পিচিয়র অফিসর। একটু খামিয়া সশ্রদ্ধ স্নেহের সহিত বলিলেন, কিন্তু আমার একান্ত অন্তরঙ্গ,—আমার পরম বন্ধু। সেটিমেণ্টাল? ই—য়েস্। ডাক্তারবাব আপনি বোধ করি হালদারের রেজুনের প্রথম অভিজ্ঞতার গল্প শোনেননি? সে এক—

সহসা ভারতীর প্রতি চোখ পড়িতেই তিনি সলজ্জে খামিয়া গিয়া কহিলেন, সে যাই হোক, প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই কিন্তু আমরা বন্ধু,—বাস্তবিক পরম বন্ধু।

তলওয়ারকরের ব্যগ্রতায় ও বিশেষ করিয়া তাঁহার পরম-বন্ধু শব্দটার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে, সেক্টিমেন্টালিস্মের প্রতি খোঁচা দিতে ব্যারিষ্টার সাহেব আর সাহস করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখের চেহারাটা যেন সন্দিগ্ধ এবং অপ্রসন্ন হইয়া রহিল।

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, সেক্টিমেন্ট জিনিসটা নিছক মন্দ নয় কৃষ্ণ আইয়ার। এবং সবাই তোমার মত শক্ত পাথর না হ'লেই চলবে না মনে করাও ঠিক নয়।

কৃষ্ণ আইয়ার খুসি হইলেন না, বলিলেন, তা আমি মনেও করিনে, কিন্তু এটুকু মনে করাও বোধ হয় দোষের নয় ডাক্তার, এই ঘরটা ছাড়াও তাঁদের চলে বেড়াবার যথেষ্ট প্রশস্ত জায়গা পৃথিবীতে খোলা আছে।

তলওয়ারকর মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। যাহাকে তিনি পরম বন্ধু বলিয়া বারবার অভিহিত করিতেছেন তাঁহাকে তাঁহারই সম্মুখে অবাস্তিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কহিলেন, মিষ্টার আইয়ার, অপূর্ববাবুকে আমি চিনি। আমাদের মধ্যে দীক্ষা তাঁর বেশী দিনের নয় সত্য, কিন্তু বন্ধুর অভাবিত মুক্তিতে সামান্য বিচলিত হওয়া আমাদের পক্ষেও মারাজ্যক অপরাধ নয়। সংসারে চলে বেড়াবার স্থান অপূর্ববাবুর যথেষ্টই আছে, এবং আশা করি এ ঘরেও স্থান তাঁর কোনদিন সন্দ্বীর্ণ হবে না।

কৃষ্ণ আইয়ার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আজ অপূর্বকে লক্ষ করিয়া ছিলেন, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু ডাক্তার তাঁহার স্বাভাবিক শান্তির সহিত কহিলেন, নিশ্চয় হবে না তলওয়ারকর, নিশ্চয় হবে না। এই বলিয়া তিনি উপস্থিত সকলের মুখের প্রতি ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ভারতীকেই যেন বিশেষ করিয়া লক্ষ করিয়া হঠাৎ গভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু এই বন্ধু জিনিসটা সুংসারে কতই না ক্ষণভঙ্গুর ভারতী! একদিন যার সম্বন্ধে মনে করাও যায় না, আর

একদিন কতটুকু ছোট্ট কারণেই না তার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে যায়! সেটাও দুনিয়ায় অস্বাভাবিক নয় তলওয়ারকর, তার জ্ঞেও প্রস্তুত থাকা ভাল। মানুষ বড় দুর্বল কৃষ্ণ আইয়ার, বড় দুর্বল! তখন এই সেটিমেটের দরকার হয় তার ধাক্কা সামলাতে।

এই সকল কথার উত্তর দিবারও কিছু নাই, প্রতিবাদ করাও চলে না; উভয়েই মোন হইয়া রহিল, কিন্তু ভারতীর মুখ স্নান হইয়া উঠিল। ডাক্তারের প্রতি তাহাদের অবিচলিত ও অসীম শ্রদ্ধা, অহেতুক একটি বাক্যও উচ্চারণ করা তাঁহার স্বভাব নয়, এ সত্য ভারতী ভাল করিয়াই জানে, কিন্তু কি এবং কাহাকে ইঙ্গিত করিয়া যে এ কথা তিনি কহিলেন, এবং ঠিক কি ইহার তাৎপর্য্য তাহা ধরিতে না পারিয়া মনের মধ্যেটা তাহার শুধু উদ্বেগ ও আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ডাক্তার সম্মুখের ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমার ত ক্রমশঃ যাবার সময় হ'য়ে এল ভারতী, আজ রাত্রেই গাড়ীতে আমি চললাম তলওয়ারকর।

কোথায় এবং কি জ্ঞা, নিজে হইতে না বলিলে একরূপ অনাবশ্যক কেতুহল প্রকাশের বিধি ইহাদের নাই। এক মুহূর্ত্ত জিজ্ঞাস্মুখে চাহিয়া থাকিয়া তলওয়ারকর প্রশ্ন করিল, আমার প্রতি আপনার কি আদেশ?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আদেশই বটে! কিন্তু একটা কথা। বর্মান্ব্যস্থানাভাব যদি হয়ও, নিজের দেশে হবে না তা নিশ্চয়। শ্রমিকের দিকে একটু দৃষ্টি রেখো।

তলওয়ারকর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। আবার ক'র দেখা হবে?

ডাক্তার কহিলেন, নীলকান্ত যোশীর শিষ্য তুমি, এ আবার কি প্রশ্ন তলওয়ারকর?

তলওয়ারকর চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার পুনশ্চ কহিলেন, আর

দেরি কোন্‌দোনা মাও,—বাসায় পৌছতে প্রায় ভোর হয়ে যাবে। প্রাক্‌টিস্‌ তাঁ'হলে এখানেই স্থির ক'রলে কৃষ্ণ আইয়ার ?

কৃষ্ণ আইয়ার মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। ভাড়াটে গাড়ী বাহিরে অপেক্ষা করিয়া ছিল, দুজনে বাহির হইবার সময়ে তলওয়ারকর কেবল একবার কহিল, অন্ধকারে অপূর্ববাবু কোথায় চলে গেলেন একবার দেখা হ'লনা—

কিন্তু এ কথার উত্তর দেওয়া বোধ করি কেহ প্রয়োজন মনে করিলেন না। কিছুক্ষণেই বাহিরে গাড়ীর শব্দে বুঝা গেল তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তখন ডাক্তার বলিলেন, তোমার কি মনে হয় অপূর্ব বাসায় চলে গেছে ?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, খুব সম্ভব আশে পাশে কোথাও আছেন, একটু খুঁজে দেখলেই পাওয়া যাবে। আপনার সঙ্গে আর একবার দেখা না ক'রে তিনি কখনো যাবেন না।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে দশ পনের মিনিটের মধ্যেই এ কাগজটা তার সেরে নেওয়া আবশ্যক। তার বেশি ত আমি সময় দিতে পারবোনা ভাই !

না, এর মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন, এই বলিয়া ভারতী শুধু যে কেবল উপস্থিত ডাক্তারের কথার একটা জবাব দিল তাই নয়, সে আপনাকে আপনি ভরসা দিল। একাকী এই অন্ধকারে অপূর্ব কিছুতেই যাইবেনা, অতএব কোথাও নিকটেই আছে এ বিষয়ে সে যেমন নিশ্চিত ছিল তাহাদেব অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন এই অতিমানবের বিদায়ের পূর্বক্ষণে আর একবার সর্বান্তঃকরণে তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লওয়ারও প্রয়োজনীয়তা সন্দেহও সে তেমন নিঃসংশয় ছিল। নানা দিক দিয়া নানা কারণে আজ অপূর্ব বহু অপরাধ জমা করিয়াছে, সময় থাকিতে তাহাকে দিয়াই সেগুলার ক্ষালন করিয়া না

লইয়াই বা ভারতী বাঁচে কি করিয়া? কিন্তু, সেই অমূল্য, স্বল্প কাল-
টুকু বুঝায় শেষ হইয়া আসিতে লাগিল,—অপূর্বের দেখা নাই! জাঁধার-
দ্বার-পথে ভারতীর চঞ্চল চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া আসিল এবং উৎকর্ণ
চিত্ত বাহিরে পরিচিত পদশব্দের প্রতীক্ষায় একেবারে অধীর হইয়া
উঠিল। কোথাও সে হাতের কাছেই আছে, একবার ইচ্ছা হইল
ছুটিয়া গিয়া সে এক মুহূর্ত্তে খুঁজিয়া আনে, কিন্তু এতখানি ব্যাকুলতা
প্রকাশ করিতে আজ তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। ডাক্তার
তাহার ট্র্যাপ-বাঁধা বোঁচ্কার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাই তুলিয়া
উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ভারতী দেয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল
আর মিনিট পাঁচছয়ের অধিক সময় নাই, কহিল, আপনি কি হেঁটেই
যাবেন?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। ছোটো কুড়ি মিনিটে সদর
রাস্তার উপর দিয়ে খুব সম্ভব একটা ঘোড়ার গাড়ী ফিরে যাবে, চল্‌তি
গাড়ী—গুণা ছয়েক পয়সা ভাড়া দিলেই স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

ভারতী বলিল, পয়সা না দিলেও দেবে। কিন্তু যাবার পূর্বে হুমিত্রা
দিদিকে একবার দেখা দিয়ে যাবেন না? তিনি সত্যই পীড়িত।

ডাক্তার কহিলেন, আমি ত বলিনি তিনি অসুস্থ ন'ন। কিন্তু
ডাক্তার না দেখালেই বা পারবে কি করে?

ভারতী বলিল, কিন্তু তাই যদি হয় ত আপনার চেয়ে বড় ডাক্তারই
বা পৃথিবীতে আছে কে?

ডাক্তার রহস্যভরে জবাব দিলেন, তাহলেই হয়ত! দীর্ঘ
অনভ্যাসে ও বিচ্ছেদে মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছেই, তা ছাড়া বসে
বসে কারও চিকিৎসা করি সে সময়ই বা কই?

কথা-তাহার শেষ না হইতেই ভারতী বলিয়া উঠিল, সময় কই!
সময় কই! কেউ মরে গেলেও সময় হবেনা—এমনিই দেশের কাজ?

দেখুন ডাক্তারবাবু, সবচেয়ে মুছে যাবার মন ও নয়; মুছে যদি সত্যিই কিছু গিয়ে থাকে ত সে দয়া মায়ো!

ডাক্তারের হাসি-মুখ কেবল মুহূর্তের তরে গভীর হইয়াই পুনরায় পূর্বশ্রী প্রারণ করিল। কিন্তু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ভারতী সেই এক মুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। তাহাদের ঘনিষ্ঠতা বহুদূর পর্যন্ত গিয়াছে সত্য, কিন্তু এদিকে অঙ্গুলি সংক্ৰান্ত করিবার অধিকার আজও তাহার ছিলনা। বস্তুতঃ, স্মিত্রাকে কে, ডাক্তারের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, এবং কবে কি করিয়া সে যে এই দলভুক্ত হইয়া পড়িল অজ্ঞাবহ ভারতী তাহার কিছুই জানিত না। তাহাদের সম্প্রদায়ে ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া একান্ত নিষিদ্ধ। স্বতরাং, অনুমান ভিন্ন সঠিক কিছুই জানিবার তাহার উপায় ছিল না। শুধু মেয়েমানুষ বলিয়াই সে স্মিত্রার মনোভাব উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু নিজের সেই অনুভূতি মাত্রটুকু ভিত্তি করিয়া অকস্মাৎ এতবড় ইঙ্গিত ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া সে শুধু সঙ্কুচিত নয়, ভয়ও পাইল। ভয় ডাক্তারকে নয়,—স্মিত্রাকে। একথা কোন মতেই তাঁহার কানে উঠিলে চলিবে না! তাঁহার অল্প পরিচয় জানা না থাকিলেও প্রথম হইতেই সেই নিস্তর তীক্ষ্ণ-বিশ্বাস-বুদ্ধি-শালিনী রমণীর চূর্ভেদ্য নিবিড়তার পরিচয় কাহারও অবিদিত ছিল না। তাঁহার স্বল্প ভাষণে, তাঁহার প্রথম মৌল্যের প্রতি পদক্ষেপে, তাঁহার অবহিত বাক্যালাপে, তাঁহার অচকল আচরণের গাভীরো ও গভীরতার এই দলের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার অপরিমিত দূরত্ব স্বতঃসিদ্ধের মতই যেন সকলে অনুভব করিত। এমন কি তাঁহার অসুস্থতা লইয়াও গায়ে পড়িয়া আলোচনা করিতেও কাহারো সাহস হইত না। কিন্তু একদিন সেই দুর্লভ কঠোরতা ভেদ করিয়া তাঁহার অত্যন্ত গোপন দুর্বলতা যেদিন অপূর্ণ ও গিরতীর সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, যেদিন একজনের বিদ্যাকৌতুকে স্মিত্রা নিজেই সংবরণ করিতে পারে নাই, সেদিন

হইতেই সে যেন সকলের হইতে আরও বহুদূরে আপনাকে আপনি সরাইয়া লইয়া গেছে। সেই দীর্ঘায়ত ব্যবধান অপরের অঘাচিত মহাহতভূতির আকর্ষণে সঙ্কচিত হইবার আভাসমাত্রেই যে তাহর সেই আত্মাশ্রয়ী অন্তর্গত বেদনা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে এই কথা নিঃসংশয়ে অল্পভব করিয়া ভারতীর ক্ষুদ্র চিত্ত শঙ্কায় পূর্ণ হইয়া যাইত।

ভাস্কর আরাম কেদারায় ভাল করিয়া হেলান দিয়া শুইয়া সুদীর্ঘ পদদ্বয় স্তম্ভের টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া সহসা মহা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ—

ভারতী বিষম্যাপন্ন হইয়া কহিল, শুলেন যে বড় ?

ভাস্কর রাগ করিয়া বলিলেন, কেন, আমি কি ঘোড়া যে একটু শুলেই বেতো হয়ে যাবো ? আমার ঘুম পাচ্ছে,—তোমাদের মত আমি দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারিনে।

ভারতী বলিল, দাঁড়িয়ে ঘুমোতে আমরাও পারিনে। কিন্তু কেউ যদি এসে বলে আপনি দৌড়তে দৌড়তে ঘুমোতে পারেন আমি তাতেও আশ্চর্য্য হইনে। আপনার ওই দেহটা দিয়ে সংসারে কি যে না হ'তে পারে তা' কেউ জানে না। কিন্তু সময় হল যে; এখন না বেরুলে গাড়ী চলে যাবে যে!

বাক্গে।

বাক্গে কি রকম ?

উঃ—ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে ভারতী, চোখ চাইতে পারচিনে। এই বলিয়া ভাস্কর দুই চক্ষু মুদিত করিলেন।

কথা শুনিয়া ভারতী পুলকিত চিত্তে অল্পভব করিল কেবল তাহারই মনহুরোধে আজ তাঁহার বাওয়া স্থগিত রহিল। না হইলে শুধু ঘুম কেন বজ্রাঘাতের দোহাই দিয়াও তাঁহার সঙ্গলো বাবা দেওয়া যায়? কহিল, আর ঘুমই যদি সত্যি পেয়ে থাকে ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

ডাক্তার চোখ মুদিয়াই প্রশ্ন করিলেন, তোমার নিজের উপায় হবে কি? অন্ধের পথ চেয়ে সারা রাত বসে কাটাবে?

ভারতী বলিল, আমার বয়ে গেছে। পাশের ছোট ঘরে বিছানা করে এখনি গিয়ে শুয়ে ঘুমবো।

ডাক্তার কহিলেন, রাগ করে শোওয়া যেতে পারে, কিন্তু রাগ করে ঘুমোনো যায় না। বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করার মত শাস্তি আর নেই। তার চেয়ে খুঁজে আনোগে—আমি কারও কাছে প্রকাশ করব না।

ভারতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে লজ্জা ধরা পড়িল না। কারণ, ডাক্তার চোখ বুজিয়াই ছিলেন। তাঁহার নিম্নলিখিত চোখের প্রতি চোখ রাখিয়া ভারতী মুহূর্ত্ত কয়েক মৌন থাকিয়া আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করার মত শাস্তি আর নেই এ আপনি জানলেন কি করে?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, লোকে বলে তাই শুনি।

নিজে থেকে কিছুই জানেন না?

ডাক্তার চোখ মেলিয়া কহিলেন, আরে ভাই, আমাদের মত দুর্ভাগাদের শুতে বিছানাই মেলে না, তাই আবার ছট্‌ফট্‌ করা! এতখানি বাবুখানার কি দুরসৎ আছে? এই বলিয়া তিনি মুচকিয়া হাসিলেন।

ভারতী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সবাই যে বলে আপনার দেহের মধ্যে রাগ নেই, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

ডাক্তার বলিলেন, সত্যি? কখনো না কখনো না! লোকে মিথ্যে করে আমার বিরুদ্ধে গুজব রটায়,—তারা আমাকে দেখতে পাল্লে না।

ভারতী হাসিয়া কহিল, কিছা অত্যন্ত বেশি ভালবাসে বলেই

হয়ত গুহব রটায়। তারা আরও বলে আপনার মান-অভিমান নেই, দয়া-মায়া নেই, বুকের ভেতরটা আগাগোড়া একেবারে পাষণ দিয়ে গড়া।

ডাক্তার কহিলেন, এও অত্যন্ত ভালবাসার কথা। তারপর

ভারতী কহিল, তারপর সেই পাষণ-স্তূপের মধ্যে আছে শুধু একটি বস্তু,—জননী জন্মভূমি! তার আদি নেই, অন্ত নেই, ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই,—তার ভয়ানক চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না বলেই আপনার কাছে কাছে থাকতে পারি, নইলে,—বলিতে বলিতে সে অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্ত থামিয়া কহিল, কি রকম জানেন ডাক্তারবাবু, সুমিত্রাদিদি কে নিয়ে আমি সেদিন বর্ষা অয়েল কোম্পানির কারখানা ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম; সেদিন তাদের নতুন বয়েলারের পরীক্ষা হচ্ছিল। অনেক লোক ভিড় করে তামাসা দেখছিল। কালো পাহাড়ের মত একটা প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড,—কিন্তু, জড়পিণ্ডের বেশি সে আর কিছুই নয়। হঠাৎ তার একটা দরজা খুলে যেতে মনে হল যেন গর্ভেতে তার অগ্নির প্রাবন বয়ে যাচ্ছে। সেখানে এই পৃথিবীটাকেও তাল করে ফেলে দিলে যেন নিমিষে ভস্মসাৎ করে দেবে। শুনলাম সে একাই নাকি এই বিরাট কারখানা চালিয়ে দিতে পারে। দরজা বন্ধ হল, আবার সেই শাস্ত্র জড়পিণ্ড, ভিতরের কোন প্রকাশই বাহিরে নেই। সুমিত্রাদিদির মুখ দিয়ে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি দিদি? সুমিত্রা বললেন, এই ভয়ানক যন্ত্রটাকে মনে রেখো ভারতী, তোমাদের ডাক্তারবাবুকে চিন্তে পাতা। এই তাঁর সত্যিকার প্রতিমূর্ত্তি। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চোখিয়া রহিল।

ডাক্তার অন্তমনস্কের মত একটুখানি হাদিয়া কহিলেন, সবাই কি ভালই আমাকে বাসে! কিন্তু ঘুমে যে আর চোখ চাইতে পারিনে

ভারতী, কিছু একটা কর! কিন্তু তার আগে সে লোকটা গেল কোথায় একবার খোঁজ করবে না?

আপনি কিন্তু কারও কাছে গল্প করতে পারবেন না।

না! কিন্তু আমাকে বুঝি লজ্জা করবার দরকার নেই?

ভারতী নাথা নাড়িয়া বলিল, না। মানুষের কাছেই শুধু মানুষের লজ্জা করে! এই বলিয়া সে হারিকেন লঠনটা হাতে তুলিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মিনিট দশ পনেরো পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, অপূর্ববাবু চলে গেছেন।

ডাক্তার বিষ্ময়ে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, এই অন্ধকারে? একা?

তাইত দেখছি।

আশ্চর্য।

ভারতী বলিল, আমার বিছানা করা আছে, শুতে চলুন।

তুমি?

আমি মেঝেতে একটা কয়ল টপল কিছু পেতে নেব। চলুন।

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তাই চল। লজ্জা সঙ্কোচ মানুষে মানুষকেই করে,—আমি পাষাণ বই ত নয়।

উপরের ঘরে গিয়া ডাক্তার শয্যায় শয়ন করিলে ভারতী মশারী ফেলিয়া দিয়া সমস্ত চারিদিক গুঁজিয়া দিল, এবং তাহারই অনতিদূরে নীচে মেঝের উপর আপনার বিছানা পাতিল। ডাক্তার সেই দিকে চাহিয়া ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে কহিলেন, সকলে মিলে আমাকে এমন করে অগ্রাহ্য করলে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমরা সকলে মিলে আপনাকে মানুষের দল থেকে বার করে পাথরের দেবতা বানিয়ে রেখেছি।

তার মানে আমাকে ভয়ই নেই?

ভারতী অস্বস্তিতে জবাব দিল, একবিন্দু না। আমার থেকে কারও
লেশমাত্র অকল্যাণ ঘটতে পারে এ আমার ভাবতেই পারিনে।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার হাসিয়া শুধু বলিলেন, আচ্ছা টের পাবে কদিন।

শয্যা গ্রহণ করিয়া ভারতী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কে আপনাকে
সব্যসাচী নাম দিলে ডাক্তারবাবু? এতো আপনার আসল নাম নয়।
ডাক্তার হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, আসল যাই হোক, নকল নামটি
দিয়েছিলেন আমাদের পাঠশালার পণ্ডিত মশাই। তাঁর মন্ত উঁচু একটা
আমগাছ ছিল, কেবল আমিই তার ঢিল মেরে আম পাড়তে পারতাম।
একবার ছাত থেকে লাফাতে গিয়ে ডানহাতটা আমার মচকে গেল।
ডাক্তার এসে ব্যাগেজ বেধে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন। সবাই আহা
আহা করতে লাগলো, শুধু পণ্ডিত মশাই খুসি হয়ে বল্লেন, যাক, আম
কটা আমার ঢিলের ঘা থেকে বাঁচলো। পাকলে দুটো একটা হয়ত
মুখে দিতেও পারবো।

ভারতী বলিল, বড্ড দুষ্ট ছিলেন ত!

ডাক্তার বলিলেন, হ্যাঁ, দুর্নাম একটু ছিল বটে। যাই হোক পরের
দিন থেকেই আবার তেমনি আম পাড়ায় লেগে গেলাম, কিন্তু পণ্ডিত-
মশাই কি করে খবর পেয়ে সেদিন হাতে-নাতে একেবারে ধরে ফেল্লেন
খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বল্লেন, ঘাট হয়েছে বাবা সব্যসাচী,
আমের আশা আর করিনে। ডানটা ভেঙেচে, বাঁহাত চলছে, বাঁটা
ভাঙলে বোধহয় পা দুটো চলবে। থাক বাবা, আর কষ্ট করোনা, যে
কটা কাঁচা আম বাকি আছে লোক দিয়ে পাড়িয়ে দিচ্ছি।

ভারতী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, পণ্ডিতমশায়ের
অনেক দুঃখের দেওয়া নাম।

ডাক্তার নিজেও হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমার অনেক দুঃখের নাম।
কিন্তু সেই থেকে আমার আসল নামটা লোকে যেন ভুলেই গেল।

ভারতী ফণকীল স্থির থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সকলে যে বলে দেশ আর আপনি, আপনি আর দেশ—এই দুই-ই আপনাতে একেবারে এক হয়ে গেছে,—এ কি করে হল ?

ডাক্তার কহিলেন, সে-ও এক ছেলেবেলার ঘটনা ভারতী। এ জীবনে কত-কি এলো, কত-কি গেলো, কিন্তু সেদিনটা এ জীবনে একেবারে অক্ষয় হয়ে রইল। আমাদের গ্রামের প্রান্তে বৈষ্ণবদের একটা মঠ ছিল, একদিন রাত্রে সেখানে ডাকাত পড়লো। চৈচাচৈচি কান্না-কাটিতে গ্রামের বহুলোক চারিদিকে জমা হল, কিন্তু ডাকাতদের সঙ্গে একটা গাদা বন্দুক ছিল, তারা তাই ছুড়তে লাগলো দেখে কোন লোক তাদের কাছে ঘেঁসতে পারলে না। আমার জাটতুতো একজন বড়ভাই ছিলেন, তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং পরোপকারী, যাবার জন্তে তিনি ছট্‌ফট করতে লাগলেন, কিন্তু গেলে নিশ্চয় মৃত্যু জেনে সবাই তাঁকে ধরে রেখে দিলে। নিজেকে কোনমতে ছাড়তে না পেরে তিনি সেইখান থেকে গুধু নিফল আফালন, এবং ডাকাতদের গালাগালি দিতে লাগলেন। কিন্তু কোন ফলই তাতে হল না, তারা ওই একটি মাত্র বন্দুকের জোরে দু’তিনশ’ লোকের স্তম্ভে মোহন্ত বাবাজীকে খুঁটিতে বেঁধে তিল তিল করে পুড়িয়ে মারলে। ভারতী, আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, কিন্তু আজও তার কাকুতি মিনতি, আজও তার মরণ-চীৎকার যেন মাঝে মাঝে কানে শুন্তে পাই। উঃ—সে কি ভয়ানক বুক-ফাটা আর্জুনাদ!

ভারতী নিরুদ্ধস্বাসে কহিল, তার পর ?

ডাক্তার কহিলেন, তারপর বাবাজীর জীবন-ভিক্ষার শেষ অন্ত্র সমস্ত গ্রামের সম্মুখে ধীরে ধীরে সাজ হল, তাদের লুট-পাটের কাজও নিশ্চিত নিরুদ্ধে পরিসমাপ্ত হল,—চলে যাবার সময় সন্টার বড়দাদার উদ্দেশে পিতৃউচ্চারণ করে শপথ করে গেল যে আজ তারা শ্রান্ত কিন্তু মাস্থানেক পরে ফিরে এসে এর শোধ দেবে। বড়দা জেলার সাহেব

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে কৈদে কেটে পড়লেন এঁরা। কদ্দুক চাই। কিন্তু পুলিশ বললে, না। বছর দুই পূর্বে একজন অত্যন্ত দাড়াচারী পুলিশ সবইনস্পেক্টরের কান মলে দেবার অপরাধে তাঁর দু'মাস জেল হয়েছিল। এবং এই অপরাধেই সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট বললো, "কোন মতেই না। দাদা বললেন, সাহেব, আমরা কি তবে মারা যাবো? সাহেব হেসে বললেন, এত যার ভয় সে যেন ঘর-বাড়ী বেচে আমার জেলা থেকে অত্র জেলায় চলে যায়।

ভারতী উত্তেজনায বিজ্ঞানায় উঠিয়া বসিয়া কহিল, দিলে না? এত বড় সর্বনাশ আসন্ন জেনেও দিলে না?

ডাক্তার কহিলেন, না। এবং কেবল তাই নয়, বড়দা ব্যাকুল হয়ে যখন তীর-ধনুক ও বর্শা তৈরী করাতেন, পুলিশের লোক খবর পেয়ে সেগুলো পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেল।

কি হল তার পর?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। সেই মাসের মধ্যেই সর্দার তার প্রতিজ্ঞা পালন করলে। এবারে বোধ করি আরও একটা বেশি বন্দুক ছিল। বাড়ীর আর সকলেই পালালেন, শুধু বড়দাকে কেউ নড়াতে পারলে না। কাজেই ডাকাতের গুলিতে প্রাণ দিলেন।

ভারতী রক্তহীন পাংশু মুখে বলিয়া উঠিল, প্রাণ দিলেন?

ডাক্তার কহিলেন, হাঁ। ঘণ্টা চারেক সজ্ঞানে বেঁচে ছিলেন। গ্রামস্থ দ্বজড় হয়ে হৈ চৈ করতে লাগলো, কেউ ডাকাতদের কেউ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে গাল পাড়তে লাগলো, শুধু দাদাই কেবল চুপ করে বসলেন। পাড়া গাঁ, হাসপাতাল দশ বার ক্রোশ দূরে, রাত্রিকাল, গ্রামের ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে এলে তাঁর হাতটা দাদা সরিয়ে দিয়ে কেবল বললেন, থাক, আমি বাঁচতে চাইনে। বলিতে বলিতে সেই পাষণ দেবতার কণ্ঠস্বর হঠাৎ একটুখানি যেন কাঁপিয়া গেল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া

পুনশ্চ কহিলেন, বড়দা আমাকে বড় ভালবাসতেন। কঁাদতে দেখে একটিবাদুঁমাত্র চোখ মেলে চাইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ছিঃ—তোমাদের মত, এই সব গরু ভেড়া ছাগলদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুই আঁ কঁাদিস্নে শৈল। কিন্তু রাজত্ব করার লোভে বারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মাত্ৰ বলতে আর একটা প্রাণীও রাখেনি তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিস্নে। এই ক'টা কথা, এর বেশী আর একটা কথাও তিনি বলেন নি। দুগায়ে একটা উঃ আঃ পর্য্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বার হল না, এই অভিশপ্ত পরাধীন দেশ চিরদিনের জন্ত ছেড়ে চলে গেলেন। কেবল আমিই জানি ভারতী কত মন্ত বড় প্রাণ সেদিন বার হয়ে গেল।

ভারতী নীরবে স্থির হইয়া রহিল। কবে কোন পল্লী-অঞ্চলের এক দুর্গটনার কাহিনী। ডাকাতি উপলক্ষে গোটা দুই অজ্ঞাত অখ্যাত লোকের প্রাণ গিয়াছে। এই ত! জগতের বড় বড় বিবোধের দুঃসহ দুঃখের পাশে ইহা কি-ই বা! অথচ এই পাষাণে কি গভীর ক্ষতই না করিয়াছে! তুলনা শু গণনার দিক দিয়া দুর্বলের দুঃখের ইতিহাসে এই হত্যার নিষ্ঠুরতা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই বাঙলা দেশেই ত নিত্য কত লোকে চোর ডাকাতির হাতে মরিতেছে! কিন্তু একি শুধু তাই? ও পাথর কি এতটুকু আঘাতেই দীর্ণ হইয়াছে? ভারতী অলক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল। এবং বিদ্যুৎ শিখা অকস্মাৎ অন্ধকার চিরিয়া যেমন করিয়া অদৃশ্য বস্তু টানিয়া বাহির করে, ঠিক তেমনি করিয়া ওই পাথরের মুখের পরেই সে যেন সমস্ত অজ্ঞাত রহস্য চক্ষের পলকে প্রত্যক্ষ করিল। সে দেখিল, এই বেদনার ইতিহাসে মৃত্যু কিছুই নয়,—মরণ উহাকে আঘাত করে নাই, কিন্তু মর্মান্তিক আঘাত করিয়াছে ওই দুটো লোকের মৃত্যু। মধ্য দিয়া শৃঙ্খলিত, পদানত সমস্ত ভারতীয়ের উপায়-বিহীন অক্ষমতা! আপন ভাইয়ের আসন্ন হত্যা নিবারণ করিবার অধিকারটুকু হইতেও সে

বঞ্চিত—অধিকার আছে শুধু চোখ মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিবার। ভারতীর সহসা মনে হইল, সমস্ত জাতির এই স্বত্বসহ পাঞ্জনা ও অপমানের দ্বানি এই পাষাণের মুখের পরে যেন নিবিড় নিচ্ছিন্ন কালি লেপিয়া দিয়াছে।

বেদনায় সমস্ত বুকের ভিতরটা ভারতীর আলোড়িত হইয়া উঠিল, কহিল, দাদা!

ডাক্তার সবিস্ময়ে ঘাড় তুলিয়া কহিলেন, দাদা বলে কি তুমি আমাকে ডাক্‌চো?

ভারতী বলিল, হাঁ, তোমাকে। আচ্ছা ইংরাজের সঙ্গে কি তোমার কখনো সন্ধি হতে পারে না?

না। আমার চেয়ে বড় শত্রু তাদের আর নেই।

ভারতী মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, কারও শত্রুতা, কারও অকল্যাণ তুমি কামনা করতে পারো এ আমি ভাবতেও পারিনে দাদা।

ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মুহূ হাসিয়া কহিলেন, ভারতী, এ কথা তোমার মুখেই শোনে এবং এর জন্তে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তুমি সুখী হও। এই বলিয়া তিনি পুনরায় একটুখানি হাসিলেন। কিন্তু, একথা ভারতী জানিত যে এ হাসির মূল্য নাই, হয়ত ইহা আর কিছু,—ইহার অর্থ নিরুপণ করিতে বাণ্ধ্য ব্যথা। তাই সে মৌন হইয়া রহিল। ডাক্তার আস্তে আস্তে বলিলেন, এই কথাটা আমার তুমি চিরদিন মনে রেখ ভারতী, আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই। একদিন মুসলমানের হাতেও এ দেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এতবড় এমন শত্রু জুগতে আর নেই। স্বার্থের দায়ে দীর্বে দীর্বে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা, এই এদের মূলধন! যদি পারো দেশের নর-নারীকে শুধু এই সত্যটাই শিখিয়ে দিও।

নীলের ঘাড়তে টং টং করিয়া চারিটা বাজিল। সমুখের খোলা জানালার বাহিরে রাত্রিশেষের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিল, সেইদিকে নিনিমেষে চক্ষে চাহিয়া ভারতী শুদ্ধ, স্থির হইয়া বসিয়া কত-কি যে ভাবিতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু একটা সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে এতবড় অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

(১৯)

কাল সারা রাত্রি ভারতী ঘুমাইতে পায় নাই। দিনের বেলায় তাহার শরীর ও মন দুই-ই খারাপ ছিল, তাই ইচ্ছা করিয়াছিল, আজ একটু সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিবে। এইজন্ত সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সে রাঁধাবাড়ায় মন দিয়াছিল। এমন সময়ে দলের একজন আসিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিল। স্মিত্রার লেখা, তিনি একটি ছত্রে শুধু এই বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন যে, যে-কোন অবস্থায়, যে-কোন কাজ ফেলিয়া রাখিয়াও সে যেন এই পত্র-বাহকের সঙ্গে চলিয়া আসে।

স্মিত্রার আদেশ লঙ্ঘন করিবার যো নাই, কিন্তু ভারতী অত্যন্ত বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর কি হঠাৎ কোন অসুখ করেছে ? উত্তরে পত্রবাহক জানাইল, না। নীচে নামিয়া দেখিল দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদের অত্যন্ত সুপরিচিত ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী, কিন্তু গাড়োয়ান বদল হইয়াছে। ইহাকে দেখিয়া মনে হয় না গাড়ী চালানো ইহার পেশা। তা' ছাড়া গাড়ী কেন ? স্মিত্রার বাসায় যাইতে ত মিনিট তিনেকের অধিক সময় লাগে না। অধিকতর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি হীরা সিং ? স্মিত্রা কোথায় ?

এই হীরা সিং লোকটি তাহাদের পথের-দাবীর সভ্য না হইলেও অতিশয় বিশ্বাসী। জাতিতে পাঞ্জাবী শিখ, পূর্বে হংকঙে পুলিশে

চাকরি করিত, এখন বেঙ্গল টেলিগ্রাফ অফিসে পিয়নের কাজ করে। সে চুপি চুপি কহিল যে, মাইল চার পাঁচ দূরে অত্যন্ত গোপন এবং অত্যন্ত জরুরি সভা বসিয়াছে, তাহার না যাইলেই নয়। ভারতী আর কান প্রশ্ন না করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়ীর সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া যাত্রা করিল। এবং হীরা সিং সরকারী পিয়নের পোষাকে সরকারী দু'চাকার গাড়ীতে অগ্র পথে প্রস্থান করিল। পথে ভারতীর অনেকবার মনে হইল সে গাড়ী ফিরাইয়া তাহার রিভলবার সঙ্গে লইয়া আসে, কিন্তু দেরি হইবার ভয়ে আর ফিরিতে পারিলনা, অস্থায়ী অরক্ষিত ভাবেই তাহাকে অনিশ্চিত স্থানের উদ্দেশে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইল। গাড়ী যে অত্যন্ত ঘুর পথে চলিয়াছে তাহা ভিতরে থাকিয়াও ভারতী বুঝিল, এবং কিছুক্ষণেই পথের অসমতলতা ও অসংস্কৃত ছরবস্থা অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিল তাহার স্রোত ছাড়াইয়া গেছে, কিন্তু ঠিক কোথায় তাহা জানা কঠিন। সঙ্গে ঘড়ি ছিলনা কিন্তু অনুমান রাত্রি দশটার কাছাকাছি গাড়ী গিয়া একটা বাগানে প্রবেশ করিয়া থামিল। হীরা সিং পূর্বেই পৌছিয়াছিল, সে গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। মাথার উপরে বড় বড় গাছ মিলিয়া অন্ধকার এমনি দুর্ভেদ্য করিয়াছে যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না, নীচে দীর্ঘ ও অত্যন্ত ঘন ঘাসের মধ্যে পায়ে-হাঁটা পথের একটা চিহ্নমাত্র আছে, এই ভয়ানক পথে হীরা সিং তাহার দু'চাকার গাড়ীর ক্ষুদ্র লণ্ঠনের আলোকে পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। পথে চলিতে ভারতীর সহস্রবার মনে হইতে লাগিল সে ভাল করে নাই, ভাল করে নাই। এই ভীষণ স্থানে আসিয়া সে ভাল করে নাই। অন্ধকারে তাহার তাহার একটা জীর্ণ ভগ্ন অটালিকায় আসিয়া পৌছিল, অন্ধকারে তাহার আভাসমাত্র দেখিয়াই ভারতী বুঝিল ইহা বহুদিন পরিত্যক্ত একটা চাউণ্ড। কোন্ অদূর অতীতে বৌদ্ধ-শ্রমগণ এখানে বাস করিতেন সম্ভবতঃ, কোথাও একটা লোকালয় পর্যন্ত ইহার কাছাকাছি নাই।

এতবড় ভাঙা বাড়ী, এতটুকু আলো নাই, মাছুষ নাই, মাছুষের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—দরজা জানালা চোরে চুরি করিয়া লইয়া গেছে,—সুমুখের ঘরে ঢুকিতেই বাজুড় ও চামচিকার ভয়ানক গন্ধে ভারতীর দম আটকাইয়া আসিল,—তাহারই মধ্যে দিয়া পথ, বোধ করি কত যে বিধবদ সর্প তথায় আশ্রয় লইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মস্ত হল-ঘরের এককোণে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। কাঠের সিঁড়ির মাঝে মাঝে কাঠ নাই, এই দিয়া ভারতী হীরার হাত ধরিয়া দ্বিতলে উঠিয়া সুমুখের বারান্দা পার হইয়া এতক্ষণে এত দুঃখের পরে নিদ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরের মধ্যে চাটাই পাতা, একধারে গোটা দুই মোমবাতি জলিতেছে, এবং তাহারই পার্শ্বে সভানেত্রীর আসনে বসিয়া সুমিত্রা। অপর প্রান্তে ডাক্তার বসিয়া ছিলেন, তিনিই সম্মুখে কণ্ঠে ডাকিয়া কহিলেন, এস ভারতী আমার কাছে এসে বোস।

অজানা শব্দায় ভারতীর বুকের মধ্যে গুরু গুরু করিয়া উঠিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু একটুখানি যেন জ্বত পদেই সে কাছে গিয়া ডাক্তারের বুক ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার কাঁধের উপর বা হাতখানি রাখিয়া যেন তিনি নিঃশব্দে তাহাকে ভরসা দিলেন। হীরা সিং ঘরে ঢুকিল না; দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ভারতী চাহিয়া দেখিল যাহারা বসিয়া আছে পাঁচ ছয় জনকে সে একেবারেই চেনে না। পরিচিতের মধ্যে ডাক্তার ও সুমিত্রা ব্যতীত রামদাস তলওয়ারকর ও কৃষ্ণ আইয়ার। একজন ভীষণাকৃতি লোককে সর্বপ্রথমেই চোখে পড়ে—পরণে তাহার গেরুয়া রঙের আলখাল্লা এবং মাথায় সুরহং পাগড়ী। মুখখানা বড় হাঁড়ির মত গোলাকার এবং দেহ গণ্ডারের মত স্থূল, মাংসল ও ককর্শ। ভাঁটার মত চোখের উপর জ্বর চিহ্নমাত্র নাই, কঠিন শলাবু মত গৌফের রোম বোধ করি দূর হইতে গণিয়া বলা যায়, রঙ তামার মত, লোকটা যে অনাথ্য মোঙ্গল জাতীয় দৃষ্টিপাত মাত্র তাহাতে সংশয়

থাকেনা। এই বীভৎস ভয়ানক লোকটার প্রতি ভারতী চোখ তুলিয়া চাহিতেই পারিলনা। মিনিট দুই সমস্ত ঘরটা একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল, তখন স্মিত্রা ডাকিয়া কহিলেন, ভারতী, তোমার মনের ভাব আমি জানি, তাই তোমাকে ডেকে এনে দুঃখ দেবার আমন্ত্রণ ইচ্ছাই ছিল না, কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই হ'তে দিলেন না। অপূর্ববাবু কি করেছেন জানো ?

ভারতীর নিভৃত হৃদয়ে এমনিই কি যেন একটা তাহাকে সারাদিন ধরিয়া বলিতেছিল। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক ও মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, শুধু সে নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

স্মিত্রা কহিলেন, বোথা কোম্পানী রামদাসকে আজ ডিসমিস করেছে। অপূর্বরও সেই দশা হোতো শুধু পুলিশ কমিশনারের কাছে আমাদের সমস্ত কথা অকপটে ব্যক্ত করেই তাঁর চাকরিটা বেঁচেছে। মাইনে ত কম নয়, বোধ হয় পাঁচশ।

রামদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

স্মিত্রা কহিলেন, শুধু এই নয়। পথের-দাবী যে বিদ্রোহীর দল, এবং আমরা যে লুকিয়ে পিস্তল রিভলবার রাখি সে সংবাদও তিনি গোপন করেন নি। এর শাস্তি কি ভারতী ?

সেই ভীষণকৃতি লোকটা গর্জন করিয়া উঠিল, ডেথ্ !

এতক্ষণে ভারতী নিনিমেষ দুই চক্ষু তাহার মুখের প্রতি তুলিয়া স্থির হইয়া রহিল।

রামদাস কহিল, সব্যসাচীই যে ডাক্তার এ খবর তাহা জানে। হোটেলের ঘরের মধ্যেই তাঁকে ধরা যেতে পারে অপূর্ববাবু এ কথা জানাতেও ক্রটি করেন নি। এমন কি, আমি ইতিপূর্বে যে পোলিটিক্যাল অপরাধে বছর দুই জেল খেটেছি,—তাও।

স্মিত্রা কহিলেন, ভারতী, ডাক্তার ধরা পড়লে তার ফল কি জানো ?

ফাঁসি। 'অ' যদি না হয়, ট্রান্সপোর্টেশন্! জেটেল্মেন! এ অপরাধের কি শাস্তি আপনারা অমুমোদন করেন?

সকলে সম্মুখে কহিল, ডেথ

ভারত! তোমার কিছু বলবার আছে?

ভারতী কথা কহিতে পারিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল তাহার বলিবার কিছু নাই।

সেই ভয়ঙ্কর লোকটা এবার বাঙ্গলার কথা কহিল। উচ্চারণ শুনিয়া বুঝা গেল সে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগ। বলিল, এক্সিকিউশনের ভার আমি নিলাম। আমি কিন্তু গুলি-গোলা, ছুরি-ছোরা বুঝিনে। এই আমার গুলি এবং এই আমার গোলা! এই বলিয়া সে বাগের মত দুই খাথা মুঠা করিয়া শূণ্যে উত্থিত করিল।

কৃষ্ণ আইয়ার দ্বারের দিকে চাহিয়া হীরা সিংকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বাগানের উত্তর কোণে একটা শুকনো কুয়া আছে—একটু বেশি মাটি চাপ দিয়ে কিছু শুকনো ভাল পালা ফেলে দেওয়া চাই। গন্ধ না বার হয়।

হীরা সিং মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, কোনরূপ ক্রটি হইবে না।

তলওয়ারকর কহিল, বাবুজিকে তাঁর দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়ে দেওয়া হোক।

সমবেত জুরির মাঝখানে অপূর্বের অপরাধের বিচার মিনিট পাঁচকের মধ্যেই সমাধা হইয়া গেল। বিচারকের রায় যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি স্পষ্ট। না বুঝিবার মত জটিলতা কোথাও নাই। ভারতী সমস্তই শুনিল, কিন্তু তাহার কান ও বুদ্ধির মাঝখানে কোথায় একটা দুর্বল প্রকার দাঁড়াইয়াছিল, বাহিরের বস্তু যেন কিছুতেই সেটা ভেদ করিয়া আর ভিতরে পৌছাইতে পারিতেছিল না। তাই, গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত যে-কেহ কথা কহিতেছিল তাহারই মুখের প্রতি ভারতী ব্যাকুল জিজ্ঞাসু চোখে নির্বোধের মত চাহিয়া দেখিতেছিল। এইটুকু মাত্র সে

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, অপূর্ব গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, এবং এই লোকগুলি তাকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এদেশে জীবন তাহার সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু এ সঙ্কট যে কিরূপ আসন্ন হইয়াছে, সে তাহার কিছুই বুঝে নাই। স্মিত্রার ইচ্ছিতে একজন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল, এবং মিনিট দুই পরে যে দৃশ্য ভারতীর চোখে পড়িল তাহা অতি বড় দুঃস্বপ্নের অতীত। সেই লোকটা অপূর্বকে লইয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার দুই হাত পিঠের দিকে দৃঢ় করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা, এবং কোমর হইতে মস্ত ভারি একখণ্ড পাথর বুলিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্ত চৈতন্য হারাইয়া ভারতী ডাক্তারের দেহের উপর ঢলিয়া পড়িল। কিন্তু সকলের দৃষ্টি তখন অপূর্বের প্রতি নিবদ্ধ ছিল বলিয়াই শুধু একজন ভিন্ন এ খবর আর কেহ জানিতে পারিল না।

ভারতী এখানে আসিবার পূর্বেই অপূর্বের এজাহার লওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে অস্বীকার কিছুই করে নাই। আফিসের বড় সাহেব ও পুলিশের বড় সাহেব, এই দুই সাহেবে মিলিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত তথ্যই জানিয়া লইয়াছে তাহা সে বলিয়াছে, কিন্তু কিসের জন্ত যে, দলের এবং দেশের এত বড় শত্রুতা সাধন করিল তাহা সে এখনও জানে না।

আজ বেলা বারোটার মধ্যেই রামদাস এ সম্বাদ স্মিত্রার কর্ণগোচর করে। দণ্ড স্থির হইয়া যায়, এবং যে উপায়ে অপূর্বকে হস্তগত করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

আফিসের ছুটির পরে আজ অপূর্ব হাঁটিয়া বাসায় গেলেন সাহস করিবে না তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়া তাহাদের ভাড়াটে গাড়ীখানা হীরার সাহায্যে আফিসের গেটের কাছে রাখা হয়। এই ফাঁদে অপূর্ব সহজেই পা দেয়। কিছুদূর আসিয়া গাড়োয়ান জানায় যে, মস্ত একটা রোলার ভাঙ্গিয়া গলির মোড় বন্ধ হইয়া আছে, ঘুরিয়া বাইতে হইবে।

অপূর্ব স্বীকার করে। ইহার পরেই বোধ হয় সে অগ্রমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে যখন তাহার চৈতন্য হয়, তখন হীরা সিং গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিস্তল দেখাইয়া তাহাকে অনায়াসে এখানে লইয়া আসে।

স্মিত্রা ডাকিয়া কহিলেন, অপূর্ববাবু আমরা আপনাকে ডেথ সেন্টেন্স দিলাম। আর কিছু আপনার বলার আছে ?

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে কিছুই বুঝে নাই।

ডাক্তার এতক্ষণ কোন কথাই প্রায় বলেন নাই, পিছনে চাহিয়া কহিলেন, হীরা, তোমার পিস্তলটা কই ?

হীরা সিং ইঙ্গিতে স্মিত্রাকে দেখাইয়া দিল, ডাক্তার হাত বাড়াইয়া বলিলেন, পিস্তলটা দেখি স্মিত্রা !

স্মিত্রা বেন্ট হইতে খুলিয়া ডাক্তারের হাতে দিলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কারও কাছে পিস্তল কিথা রিভল্ভার আছে ?

আর কাহারও কাছে ছিল না তাহা সকলেই জানাইল। তখন স্মিত্রার পিস্তল নিজের পকেটের মধ্যে রাখিয়া ডাক্তার একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, স্মিত্রা, তুমি বললে ডেথ সেন্টেন্স আমরা দিলাম। কিন্তু ভারতী ত দেয়নি।

স্মিত্রা এক মুহূর্ত্ত ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, ভারতী দিতে পারে না।

ডাক্তার বলিলেন, পারা উচিতও নয়। তাই না ভারতী ?

ভারতী কথা কহিল না, এই কঠিনতম প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাক্তারের ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইল।

ডাক্তার তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, অপূর্ববাবু যা' করে ফেলেছেন সে আর ফিরবে না—তার ফলাফল আমাদের

নিতেই হবে। শান্তি দিলেও হবে, না দিলেও হবে। কিন্তু আমি বলি তাতে কাজ নেই—ভারতী এঁর ভার নিন্। এই দুর্বল মানুষটিকে একটু মজবুত করে গড়ে তুলুন। কি বল স্মিত্রা ?

স্মিত্রা কহিলেন, না।

সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, না।

সেই কুদর্শন লোকটাই সর্বাপেক্ষা অধিক আফালন করিল। সে তাহার খাবা-মুগল শূত্র তুলিয়া ভারতীকে ইঙ্গিত করিয়াই কি একটা বলিয়া ফেলিল।

স্মিত্রা কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, আমরা সকলে একমত। এতবড় অগ্রায় প্রশ্নে আমাদের সমস্ত ভেঙে-চুরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

ডাক্তার বলিলেন, যদি যায় ত উপায় কি ?

স্মিত্রার সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচ সাত জন গর্জিয়া উঠিল, উপায় কি ? দেশের জগ্ন, স্বাধীনতার জগ্ন, আমরা কিছুই মানবো না। আপনার একার কথায় কিছুই হতে পারবেনা।

গর্জন থামিলে ডাক্তার উত্তর দিলেন। এবার তাঁহার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য্য রকমের শান্ত ও মৃদু শুনাইল। তাহাতে উৎসাহ বা উত্তেজনার বাষ্পও ছিলনা, বসিলেন, স্মিত্রা, বিদ্রোহে প্রশ্ন দিয়োনা। তোমরা ত জানো, আমার একার মত তোমাদের একশ জনের চেয়েও বেশি কঠিন। সেই ভয়ঙ্কর লোকটাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রজেন্দ্র, তোমার উদ্ধত্যের জগ্ন বাটাভিরাতে একবার আমাকে তুমি শান্তি দিতে বাধ্য করেছিলে। দ্বিতীয়বার বাধ্য করোনা।

ভারতী মুখ তুলে নাই, তখনও তেমনি পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার সর্বদেহ ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছিল। পিঠের উপর স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া তেমনি সহজ গলায় কহিলেন, ভয় নেই ভারতী, অপূর্বকে আমি অভয় দিলাম।

‘ভারতী মুখ তুলিল না, ভরসাও পাইল না। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের হৃদীয় সৰু সৰু আঙুলগুলো নিজের মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, কিন্তু ওঁরা ত অভয় দিলেন না।

ডাক্তার কহিলেন, সহজে দেবেও না। কিন্তু একথা ওরা বোঝে যে, আমি যাকে অভয় দিলাম তাকে স্পর্শ করা যায় না! একটু হাসিয়া বলিলেন, ভাল খেতে পাইনে ভারতী, আধপেটা খেয়েই প্রায় দিন কাটে,—তবুও ওরা জানে এই ক’টা সৰু আঙুলের চাপে আজও ব্রজেন্দ্রের অতবড় বাঘের খাবা গুঁড়ো হয়ে যাবে! কি বল ব্রজেন্দ্র?

চট্টগ্রামী মগ মুখ কালো করিয়া নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু অপূর্ব যেন না আর এখানে থাকে। ও দেশে যাক। অপূর্ব ট্রেটর নয়, স্বদেশকে ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসে কিন্তু অধিকাংশ,—থাক, স্বজাতির নিন্দা আর কোরব না,—কিন্তু বড় দুর্বল। ওকে মজবুত করবার ভার তোমাকে দিলাম সত্য, কিন্তু আমার ভরসা নেই ভারতী। বাড়ী ফিরে গিয়ে ওর আজকের কথা, তোমার কথা, কোনটা ভুলতেই বেশি সময় লাগবে না। যাক, সে পরের কথা। আপাততঃ, আমরা সভানেত্রীকে অত্যাচার করতে পারি আজকের মত সভা ভঙ্গ করা হোক। এই বলিয়া তিনি সুমিত্রার প্রতি চাহিলেন।

সুমিত্রা তাঁহাকে কখনো তুমি, কখনো আপনি বলিয়া সম্মানে কথা কহিত, এখন সেই ভাবেই কহিল, অধিকাংশের মত যেখানে ব্যক্তি-বিশেষের গায়ের জোরে পরাভূত হয়, তাকে আর খাই বলুক সভা বলে না। কিন্তু এই নাটক অভিনয় করাবারই যদি আপনার স্বপ্ন ছিল পূর্বাহ্নে জানাননি কেন?

ডাক্তার কহিলেন, না হলেই ছিল ভাল, কিন্তু অবশ্যবিশেষে নাটক যদি হয়েও থাকে সুমিত্রা, অভিনয়টা যে ভাল হয়েছে তা’ তোমাদের স্বীকার করতে হবে।

রামদাস কহিল, এরকম যে হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

ডাক্তার বলিলেন, বন্ধুত্ব জিনিসটা যে এমনি ক্ষণভঙ্গুর সে ধারণাই কি তোমার ছিল তল-পারকর ? অথচ, এমন সত্যও জগতে দুর্লভ।

কৃষ্ণ আইয়ার কহিল, বর্ম্মার এ্যাক্টিভিটি আমাদের উঠলো। এখন পালাতে হবে।

ডাক্তার বলিলেন, হবে। কিন্তু সময় মত স্থান ত্যাগ করা এবং এ্যাক্টিভিটি ত্যাগ করা এক বস্তু নয় আইয়ার। দীর্ঘকাল কোথাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে যদি না পাই, তার জন্তে নাশিশ করা আমাদের মাজেনা। এই বলিয়া তিনি ভারতীকে ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, হীরা সিং, অপূর্ববাবুর বান্দন খুলে দাও, চল, ভারতী, তোমাদের একটু নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

হীরা সিং আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইলে সুমিত্রা কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, অভিনয়ের শেষ অঙ্কে আনন্দে হাততালি দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এ নতুন নয়। ছেলেবেলায় কোথায় একটা উপলক্ষ্যে যেন পড়েছিলাম। কিন্তু একটুখানি যেন বাদ রইল। যুগল-মিলন আমাদের সম্মুখে হয়ে গেলে অভিনয়ে আর কোথাও খুঁত থাকতো না। কি বল ভারতী ?

ভারতী লজ্জায় মরিয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, লজ্জা পাবার এতে কিছুই নেই ভারতী। বরঞ্চ, আমি কামনা করি অভিনয় সমাপ্ত করবার মালিক যিনি তিনি যেন একদিন কোথাও এর খুঁত না রাখেন। পকেট হইতে ‘সুস্মিত্রার পিস্তলটা বাহির করিয়া তাহার কাছে দেখিয়া দিয়া বলিলেন, আমি এদের পৌঁছে দিতে চল্লাম, কিন্তু ভয় নেই, আমার কাছে আর একটা গাদা পিস্তল রইল। ব্রজেন্দ্রের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সহাস্তে কহিলেন, তোমরা ত সবাই তামাশা করে বলতে, অন্ধকারে আমি প্যাচার মত দেখতে পাই—আজ যেন কেউ সে কথা ভুলো না।

এই বলিয়া তিনি একটা প্রচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত করিয়া ভারতী ও অপূর্বকে লইয়া বাহির হইতে উত্তত হইলেন।

সুমিত্রা অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, ফাঁসির দড়িটা কি নিজের হাতে গলায় না পরলেই হত না ?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, সামান্য একটা দড়িকে ভয় করলে চলবে কেন সুমিত্রা ? •

কোন একটা কার্যের পূর্বে এই মানুষটিকে মৃত্যুর ভয় দেখাইতে যাওয়া যে কত বড় বাহুল্য ব্যাপার তা স্মরণ করিয়া সুমিত্রা নিজেই লজ্জিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সমস্ত ত ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কিন্তু আবার কখন দেখা হবে ?

ডাক্তার বলিলেন, প্রয়োজন হলেই হবে।

সে প্রয়োজন কি হয় নি ?

হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হবে। এই বলিয়া তিনি অপূর্ব-ভারতীকে সঙ্গে করিয়া সাবধানে নীচে নামিয়া গেলেন।

যে গাড়ী ভারতীকে আনিয়াছিল তাহা অপেক্ষা করিতেছিল। সুমিত্রা হইতে গাড়িওয়ান প্রভুকে তুলিয়া ইহাতেই তিনজনে যাত্রা করিলেন। বহুক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া এইবার ভারতী কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

অপূর্ববাবুর বাসায়,—এই বলিয়া ডাক্তার গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিয়া লইয়া স্থির হইয়া বসিলেন। মাইল দুই নিঃশব্দে চলার পরে গাড়ী থামাইয়া ডাক্তার নামিতে উত্থিত হইলে ভারতী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কেন ?

ডাক্তার বলিলেন, এইবার ফিরি। গুরা অপেক্ষা করে আছে, একটা বোঝা-পড়া হওয়া ত চাই !

বোঝা-পড়া ? ভারতী আকুল হইয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া

কহিল, সে কিছুতেই হতে পারবে না। তুমি সঙ্গে চল। কিন্তু কিছুটা উচ্চারণ করিয়া সে স্মিত্রার মতই অপ্রতিভ হইল। কারণ ইহার বলা মানাই স্থির করিয়া বলা। এবং সংসারের কোন ভয়ই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিবে না। তথাপি ভারতী হাত ছাড়িয়াও দিলনা, ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু তোমাকে যে আমার বড় দরকার দাদা!

সে আমি জানি। অপূর্ববাবু, আপনি কি পরশুর জাহাজে বাড়ী যেতে পারবেন না?

অপূর্ব কহিল, পারবো।

ভারতী হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কহিল, দাদা, এখনই আমাকে বাসায় যেতে হবে।

ভান্ডার ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলেন, না। তোমার কাগজ-পত্র, তোমার পথের-দাবীর খাতা, তোমার পিস্তল-টোটা সমস্তই এতক্ষণে নবতারা সরিয়ে নিয়ে গেছে। ভোর নাগাদ থানা-হাঙ্গামী হবে,—আটিষ্ট স্বয়ং শরীরে,—তার খেনো-মদের বোতল, আর তার সেই ভাঙা বেহালাখানা—অপূর্ববাবু, আপনার সে বেহালাটার ওপর একটু দাবী আছে, না? এই বলিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, এ ছাড়া ভয়ানক কিছু আর পুলিশ সাহেবের হাতে পড়বে না। কাল নটা দশটা আন্দাজ বাসায় ফিরে রাঁধা-বাড়া খাওয়া-দাওয়া সেয়ে বোধ করি একটুখানি ঘুম দেবারও সময় পাবে ভারতী। রাত্রি দুটো তিনটে নাগাদ দেখা পাবে—কিছু খাবার-দাবার রেখো।

ভান্ডারী অবাক হইয়া রহিল। মনে মনে বলিল, এমন একান্ত সজাগ ন, হইলে কি এই মরণ-যজ্ঞে কেহ সঙ্গে আসিতে চাহত? মুখে কহিল, তোমার চোখে কিছু এড়াই না, তুমি সকলের ভাল-মন্দই চিন্তা কর। সংসারে আমার আপনার কেউ নেই, তোমার পথের-দাবী থেকে আমাকে বিদায় দিওনা দাদা।

অন্ধকারের মধ্যেই 'ভীক্তার বারম্বার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ভগবানের কাজ থেকে বিদায় দেবার অধিকার কারও নেই, কিন্তু এর দ্বারা তোমাকে বদলে নিতে হবে।

ভারতী কহিল, তুমিই বদলে দিয়ো।

ভীক্তার এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, সহসা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, ভারতী, আর আমার সময় নেই, আমি চললাম। এই বলিয়া অন্ধকার পথে মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

(২০)

গাড়ী চলিবার উপক্রম করিতেই ভারতী অপূর্বর বাসার ঠিকানা বলিয়া দিতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, দেখো গাড়োয়ান ত্রিশ নম্বর—

তাহার কথা শেষ না হইতেই গাড়োয়ান বলিয়া উঠিল, আই নো— আই নো।

গাড়ীর পরিসর ছোট বলিয়া দুজনে ঘেসাঘেসি বসিয়াছিল, গাড়োয়ানের মুখের ইংরাজী কথায় অপূর্বর সমস্ত দেহ যে শিহরিয়া উঠিল ভারতী তাহা স্পষ্ট অনুভব করিল। ইহার পরে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ঘড়ু ঘড়ু, ছড়ু ছড়ু করিয়া ভাড়াটে গাড়ী চলিতেই লাগিল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন কথাই হইল না। অন্ধকার নিঃশব্দ নিশীথে গাড়ীর চাকা ও পথের পাথরের সংঘর্ষে যে কঠোর শব্দ উঠিতে লাগিল, তাহাতে অপূর্বর সর্বদ্বন্দ্ব ক্ষণে ক্ষণে কাঁটা দিয়া কেবলই ভয় হইতে লাগিল পাড়ার কাহারও ঘুম ভাঙিতে আর বাকি থাকিবেনা, এবং সহরের সমস্ত পুলিশ ছুটিয়া আসিল বলিয়া। কিন্তু কোন্‌ ঘণ্টানা ঘটিল না, গাড়ী আসিয়া বাসার দরজায় থামিল। ভারতী ভিতরে হইতে গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া অপূর্বকে নামিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজেও তাহার পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করিল, কত ভাড়া?

গাড়োয়ান একটুখানি হাসিয়া কহিল, নীট এ পাই। পরক্ষণেই বাঁশ দুই মাথা নাড়িয়া বলিল, গুড্‌ নাইট্‌ টু ইউ! এই বলিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিয়া সোজা বাহির হইয়া গেল।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তেওয়ারী আছে ত ?

আছে।

উপরে উঠিয়া দ্বারে করাঘাত করিয়া অপূর্ব তেওয়ারীর ঘুম ভাঙ্গাইল; কপাট খুলিয়া তেওয়ারী দীপালোকে প্রথমেই দেখিতে পাইল ভারতীকে। কাল অপূর্ব বাসায় কিরিয়াছিল প্রায় ভোরবেলায়, আজ কিরিয়াছে রাত্রি শেষ করিয়া। সঙ্গে আছে ভারতী। তাই বুঝিতে তেওয়ারীর বাকী কিছুই রহিল না; ক্রোধে সর্বাঙ্গ জলিতে লাগিল এবং একটা কথাও না কহিয়া সে জরতবেগে নিজের বিছানায় গিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। এই মেয়েটিকে তেওয়ারী ভালবাসিত। একদিন তাহাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া খুষ্টান হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু, কিছু দিন হইতে ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে অপূর্বের সম্বন্ধে নানা প্রকার অসম্ভব ভ্রুশিষ্টতা তেওয়ারীর মনে উঠিতেছিল,—এমন কি জাতিনাশ পর্য্যন্তও। সেই সর্বনাশের প্রকট মূর্তি আজ যেন তেওয়ারীর মানসপটে একেবারে মুদ্রিত হইয়া গেল। তাহাকে এমন করিয়া শুইয়া পড়িতে দেখিয়া কেবল অভ্যাসবশতঃই অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, দোর দিলিনি তেওয়ারী ?

তাহাঁড় মুচ্ছাহত উদ্ভ্রান্ত চিত্ত লক্ষ কিছুই করে না। কিন্তু লক্ষ করিয়াছিল ভারতী। সে-ই তাড়াতাড়ি জবাব দিল, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।

অপূর্ব শোবার ঘরে আসিয়া দেখিল, খাটের উপর শয্যাতেমনি গুটানো রহিয়াছে, পাতা হয় নাই। বস্তুতঃ, বারান্দায় বসিয়া পথ

চাহিয়া থাকিতেই আজ তেওয়ারীর সমস্ত সন্ধ্যাটা গিয়াছে, বিছানা করার কথা মনেও পড়ে নাই। কিন্তু সে উত্তর দিবার পূর্বেই ভারতী বাস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি আরাম কেদারাটায় একটুখানি বহ্নন, আমি এক মিনিটে সব ঠিক করে দিচ্ছি।

চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া অপূর্ব পুনশ্চ ডাকিল, এক গেলাস জল দে তেওয়ারী!

তাহার পাশের টুলের উপরেই খাবার জলের কুঁজা ও গেলাস ছিল, বিছানা পাতিতে পাতিতে তাহা দেখাইয়া দিয়া ভারতী বলিল, ঘুমন্ত মানুষকে আর কেন তুলবেন অপূর্ববাবু, আপনি নিজেই একটু চেষ্টা নিন।

অপূর্ব হাত বাড়াইয়া কুঁজাটা তুলিতে গিয়া তুলিতে পারিল না; তখন উঠিয়া আসিয়া কোন মতে জল গড়াইয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পান করিয়া পুনরায় বসিতে বাইতেছিল, ভারতী মানা করিয়া কহিল, আর ওখানে না, একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়ুন।

অপূর্ব শান্ত বালকের তায় নিঃশব্দে আসিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। ভারতী মশারী ফেলিয়া দারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিতেছিল, অপূর্ব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় শোবে?

আমি? ভারতী কিছু আশ্চর্য হইল। কারণ, এরূপ ঘটনা নূতনও নয়, এবং এ ঘরের কোথায় কি আছে তাহাও তাহার অবিদিত নয়। এই অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু আরাম চৌকিটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, সকাল হতে আর ঘটা দুই মাত্র দেরি আছে। ঘুমোও।

অপূর্ব হাত বাড়াইয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, না ওখানে নয়, তুমি আমার কাছে বোস।

আপনার কাছে? বাস্তবিকই ভারতীর বিশ্বয়ের অবধি রহিল না। অপূর্ব আর যাহাই হোক, এ সকল ব্যাপারে কখনও আত্মবিশ্বস্ত হইত

না। এমন কতদিন কত উপলক্ষেই ত তাহারা একঘরে রাত্রি যাপন করিয়াছে, কিন্তু মর্যাদাহানিকর একটা কথা একটা ইঙ্গিতও কোন দিন তাহার আচরণে প্রকাশ পায় নাই।

অপূর্ব কহিল, এই দেখ এরা আমার হাত ভেঙে দিয়েছে। কেন তুমি এদের মধ্যে আমাকে টেনে আনলে? তাহার কথার শেষ দিকটা অকস্মাৎ কান্নায় রুদ্ধ হইয়া গেল। ভারতী মশারীর একটা দিক তুলিয়া দিয়া তাহার কাছে বসিল, পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বহুক্ষণ ধরিয়া শক্ত বাধনের ফলে হাতের স্থানে স্থানে কালশিরা পড়িয়া ফুলিয়া আছে। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছিল, ভারতী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া লইয়া সাহস দিয়া বলিল, কিছু ভয় নেই, তোয়ালে ভিজিয়ে আমি ভাল করে জড়িয়ে দিচ্ছি, দু এক দিনেই সমস্ত ভাল হয়ে যাবে। এই বলিয়া সে উঠিয়া গিয়া স্নানের ঘর হইতে একটা গামছা ভিজাইয়া আনিল, এবং সমস্ত নীচের হাতটা বাধিয়া স্নিগ্ধকর্থে কহিল, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আমি আপনার মাথায় হাত বুলািয়ে দিচ্ছি। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অপূর্ব অশ্রুবিবিক্ত-স্বরে বলিল, কাল জাহাজ থাকলে আমি কালই চলে যেতুম।

ভারতী কহিল, বেশ ত, পরশুই যাবেন। একটা দিনের মধ্যে আপনার কোন অমঙ্গল হবে না।

অপূর্ব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিতে লাগিল, গুরুজনের কথা না শুনেই এই-সব ঘটে। মা আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছিলেন।

মা বুঝি আপনাকে আস্তে দিতে চাননি?

না, একশ বার মানা করেছিলেন, কিন্তু আমি শুনিনি। তার ফল হল এই যে, কতকগুলো ভয়ানক লোকের একেবারে চিরকালের জুড়ে বিষ-দৃষ্টিতে পড়ে রইলুম। সে বা হবার হবে, দুর্গা দুর্গা বলে পরশু

একবার জাহাজে উঠতে পারলে হয়। এই বলিয়া সে সহসা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু সেই সঙ্গে যে ইহা অপেক্ষাও শতগুণ গভীর নিঃশ্বাস আর একজনের হৃদয়ের মূল পর্য্যন্ত নিঃশ্বাসে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। আর একটা দিনও যেন না অপূর্বের বিলম্ব ঘটে, দুর্গা দুর্গা বলিয়া একবার সে জাহাজে উঠিতে পারিলে হয়! বর্ষায় আসা তাহার সর্ব্বাংশেই বিফল হইয়াছে, বাড়ী গিয়া এ দেশের জন কয়েকের বিষ-দৃষ্টির কথাই শুধু তাহার চিরদিন স্মরণে থাকিবে, কিন্তু সকল চক্ষুর অন্তরালে একজনের কুণ্ঠিত দৃষ্টির প্রতি বিন্দু হইতেই যে নীরবে অমৃত বারিমাছে, একটা দিনও হয়ত, সে কথা তাহার মনে পড়িবে না।

অপূর্ব্ব কহিতে লাগিল, এ বাড়ীতে পা দিয়েই তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হল, কোটে জরিমানা পর্য্যন্ত হয়ে গেল যা জন্মে কখনো আমার হয়নি। এর থেকেই আমার চৈতন্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হল না।

ভারতী চুপ করিয়াছিল, চুপ করিয়াই রহিল। অপূর্ব্ব নিজেও এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া তাহার দুরদৃষ্টির স্রজ ধরিয়া বলিল, তেওয়ারী আমাকে বার বার সাবধান করেছিল,—বাবু, ওরা এক জাত, আমরা এক জাত, এ সব করবেন না। কিন্তু কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে থগাবে বল? চাকরি সেই গেল,—পাঁচশ টাকা মাইনে এ বছরে কটা লোকে পায়? তাছাড়া এ হাত আমি লোকের স্মৃতিতে বার কোরব কি করে?

ভারতী আস্তে আস্তে বলিল, ততদিনে হাতের দাগ ভাল হয়ে যাবে। ইহার বেশি কথা মুখ দিয়া তাহার বাহির হইল না। মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, সে হাত আর চলিতে চাহিল না, এবং এই অত্যন্ত সাধারণ তুচ্ছ লোকটাকে সে মনে মনে ভালবাসিয়াছে মনে করিয়া নিজের কাছেই যেন সে লজ্জায় মরিয়া গেল। এ কথা দলের অনেকেই জানিয়াছে আজ অপূর্ব্বের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া তাহাদের কাছে অপরাধী এবং

স্বমিত্রার চক্ষে সে ছোট হইয়া গেছে, কিন্তু এই অতি তুচ্ছ মানুষটাকে হত্যা করিবার অদম্য ও ক্ষুদ্রতা ইহাতে সে যে তাহাদের রক্ষা করিতে পারিয়াছে ইহাই মনে করিয়া এখন তাহার গর্ভ বোধ হইল।

অপূর্ব বলিল, দাগ সহজে যাবে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে যে কি জবাব দেব জানিনে। কিন্তু শ্রোতার নিকট হইতে শায় না পাইয়া আপনিই কহিতে লাগিল, সকলে ভাববে কাজ চালাতে আমি পারলুম না। তাইত লোকে বলে, বাঙালীর ছেলেরা বি-এ, এম-এ, পাশ ক'রে বটে, কিন্তু বড় চাকরি পেলে রাখতে পারে না। আমার কলেজের ছেলেরা আমাকে ছি ছি করতে থাকবে, আমি উত্তর দিতে পারব না।

যাহোক কিছু একটা বানিয়ে বলে দেবেন। আচ্ছা, আপনি ঘুমোনু এই বলিয়া ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

আর একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দাও না ভারতী!

না, আমি বড় ক্লান্ত।

তবে থাক, থাক। রাতও আর নেই।

ভারতী পাশের ঘরে আসিয়া দেখিল, আলোটা তখনও মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, এবং তেওয়ারী তেম্নি চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। অদূরে ভাঙাগোছের একখানা ডেক্ চেয়ার পড়িয়া ছিল তাহাতেই আসিয়া সে উপবেশন করিল। অপূর্বের ঘরে ভাল আরাম চৌকি ছিল কিন্তু ওই লোকটিকে স্রমুখে রাখিয়া একই ঘরের মধ্যে রাত্রি যাপন করিতে আজ তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইল। ডেক্ চেয়ারে কোন-মতে একটু হেলান দিয়া পড়িয়া মনের মধ্যে যে তাহার কি করিতে লাগিল তাহার সীমা নাই। ইতিপূর্বে এই ঘরের মধ্যেই সে একাধিক বার কঠিন খাকা খাইয়াছে, কিন্তু আজিকার সহিত তাহার তুলনাই হয়না। ভারতীর প্রথমেই মনে হইল, কি করিয়া এবং কাহার অপরিণীম

করণায় অপরূপ সুনিশ্চিত ও প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে আজ রক্ষা পাইল, অথচ রাত্রিটাও প্রভাত হইলনা, এতবড় কথাটা সে ভুলিয়াই গেল। তাহার পরম্পরকৃতলওয়ারকরের প্রতি, দলের প্রতি এবং বিশেষ করিয়া ওই ডাক্তার লোকটির প্রতি যে কি অপরিসীম অপরাধ করিয়াছে সে কথাই তাহার মনে নাই। সেখানে বড় চাকরি ও হাতের দাগটাই তাহার সমস্ত স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। সেইখানে বসিয়া হঠাৎ ভারতীর চোখে পড়িল, সুমুখের খোলা জানালার ফাঁক দিয়া ভোরের আলো দেখা দিয়াছে। সে মুহূর্ত্তে উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিল, এবং কদম্বা, অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত স্থানে মাতালের নেশা কাটিয়া গেলে সে যেমন করিয়া মুখ ঢাকিয়া পলায়ন করে, ঠিক তেমনি করিয়া সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

(২১)

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সকল কথা, সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়া ভারতী পরিশেষে কহিল, অপূর্ববাবু যে মস্ত লোক এ ভুল আমি একদিনও করিনি, কিন্তু তিনি যে এত সামান্য, এত তুচ্ছ,—এ ধারণাও আমার ছিল না।

ভারতীর ঘরে খাটের উপর বসিয়া সব্যসাচী ডাক্তার একথানা বইয়ের পাতা উল্টাইতে ছিলেন, তাহার প্রতি চাহিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন, কিন্তু আমি জানতাম। লোকটা এত তুচ্ছ না হলে কি এতবড় ভালবাসা তোমার এত তুচ্ছ কারণেই যায় ? যাক্, বাঁচা গেল ভাই, কাকে কি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছিলে বইত নয় !

ইতস্ততঃ বিকিণ্ড জিনিষ পত্র, বিশেষ করিয়া মোষের উপরে ছড়ানো পুস্তকের রাশি চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যায় এ ঘরে ইতিপূর্বে পুলিশ তদন্ত হইয়া গেছে। সেইগুলা সব গুছাইতে গুছাইতে ভারতী কথা কহিতে

ছিল। সে হাতের কাজ বন্ধ করিয়া সবিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলিল, তুমি তোমাসা কোরচ দাদা ?

না।

নিশ্চয়।

ডাক্তার কহিলেন, আমার মত ভয়ানক লোক, যে বোমা পিস্তল নিয়ে কেবল মানুষ খুন করে বেড়ায়, তার মুখে তোমাসা ?

ভারতী কহিল, আমিও বলিনে, তুমি মানুষ খুন করে বেড়াও ! ওকাজ তুমি পারোই না। কিন্তু তোমাসা ছাড়া এ কি হতে পারে বলত ? ঘণ্টা দুই তিনের মধ্যেই যে সব ভুলে গিয়ে মনে রাখলে শুধু হাতের দাগ আর পাঁচশ টাকার চাকরি, তার চেয়ে অধম, ক্ষুদ্র ব্যক্তি আর ত আমি দেখতে পাইনে। তুমি বলছিলে এ আমার মোহ। ভাল, তাই যদি হয়, তুমি আশীর্বাদ কর, এ মোহ আমার চিরদিনের মত কেটে যাক, আমি সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তোমার দেশের কাজে লেগে যাই।

ডাক্তারের ওষ্ঠাধর চাপা হাসিতে বিকশিত হইয়া উঠিল, কহিলেন, তোমার মুখের ভাষাটা যে মোহ কাটার মতই তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু মুন্সিল এই যে কণ্ঠস্বরে তার আভাসটুকু পর্য্যন্ত নেই। তা, সে যাই হোক, ভারতী, তোমাকে দিয়ে আমার দেশের কাজ কিন্তু এক তিলও হবে না। তার চেয়ে তোমার অপূর্ববাবুই ঢের ভাল। দেনা-পাণ্ডার চুল-চেরা বিচার করতে করতে বোঝা-পড়া একদিন তোমাদের হয়ে যেতেও পারে। বরঞ্চ, তাই করগে।

ভারতী কহিল, তার মানে দেশকে আমি ভালবাসতে পারব না ?

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, অনেক পরীক্ষা না দিয়ে কিন্তু ঠিক কুরে কিছুই বলা যায়না ভাই।

ভারতী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহসা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, এই তোমাকে আজ বলে রাখলাম দাদা, সমস্ত পরীক্ষাতেই আমি

উজ্জীর্ণ হইতে পারবো। তোমার কাজের মধ্যে এত স্বার্থ, এত সংশয়, এতবড় ক্ষুদ্রতার স্থান নাই।

তাহার উত্তেজনায় ডাক্তার হাসিলেন, পরে ক্রীড়াচ্ছলে নিজের ললাটে কল্পঘাত করিয়া বলিলেন, হা আমার পোড়া কপাল! দেশ মানে কি বুঝে রেখেচ খানিকটা মস্ত বড় মাটি, নদ-নদী আর পাহাড়? একটিনাত্র অপূর্বকে নিয়েই জীবনে দিক্কার জন্মে গেল, বৈরাগী হতে চাও, আর সেখানে কেবল শত সহস্র অপূর্বই নয়, তার দাদাও বিচরণ করেন। আরে পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হোলো কৃতজ্ঞতা! যাদের সেবা করবে তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, প্রাণ যাদের বাঁচাবে, তারাই তোমাকে বিক্রী করে দিতে চাইবে। মৃত্যু আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে ভেঁমার ছুঁচের মত বিধবে। শ্রদ্ধা নেই, স্নেহ নেই, সহানুভূতিই নেই, কেউ কাছে ডাকবেনা, কেউ সাহায্য করতে আনবেনা, বিষধর সাপের মত তোমাকে দেখে লোকে দূরে সরে যাবে। দেশকে ভালবাসার এই আমাদের পুরস্কার, ভারতী, এর বেশি দাবী করবার কিছু যদি থাকে, ত সে শুধু পরলোকে। এতবড় ভয়ানক পরীক্ষা তুমি কিসের জন্তে দিতে যাবে, যোন্? বরঞ্চ, আশীর্বাদ করি অপূর্বকে নিয়ে তুমি সুখী হও,—আমি নিশ্চয় জানি, তার সবল দ্বিধা, সরল সংস্কার ছাপিয়ে তোমার মূল্য একদিন তার চোখে পড়বেই পড়বে।

ভারতীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত নীরবে নতমুখে থাকিয়া প্রবল চেষ্টায় তাহা নিবারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারোনা বলেই কোনমতে আমাকে বিদায় করে দিতে চাও দাদা?

তাহার এই একান্ত সকল নিঃসঙ্কোচ প্রশ্নের এমনি সোজা উত্তর বোধ হয় ডাক্তারের মুখে আসিল না, হাসিয়া বলিলেন, তোমার মত

লক্ষী মেয়ের মায়া কি সহজে কেউ কাটাতে পারে বোন? কিন্তু, কাল স্বচক্ষেই ত দেখতে পেল এম নথো কত লুকোচুরি, কত হিংসে, কত মন্বাস্তিক ক্রোধ জড়িয়ে রয়েছে। তোমার পানে চাইলেই মনে হয় এ সবেম জন্মে তুমি নও, এর মধ্যে টেনে এনে তৈরি করেছিল কাজ হয়নি। শুধু তোমার কাছে কাজ আদায়ের আশা বাকী। দিন আছে, যেদিন ছুটি নেবার আমার তলব এসে পৌছবে।

ভারতী এবার আর তাহার চোখের জল বাতাসে পড়িতে পারিলনা। কিন্তু তখনই হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, তুমিও আর এদের মধ্যে থেকোনা দাদা।

তাহার কথা শুনিয়া ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এবার কিন্তু বড় বোকার মত কথা হয়ে গেল ভারতী।

ভারতী অপ্রতিভ হইলনা, কহিল, তা' জানি, কিন্তু এরা সবাই যে ভয়ঙ্কর নির্দিয়।

আর আমি?

তুমিও ভারি নির্দিয়।

স্বমিত্রাকে কি রকম মনে হল ভারতী?

এই প্রশ্ন শুনিয়া ভারতীর মাথা হেঁট হইয়া গেল। লজ্জা উত্তর দিতে সে পারিলনা, কিন্তু উত্তরের জন্ত তাগিদও আসিল না। কিছুক্ষণের জন্ত উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। বেশিক্ষণ নয়, কিন্তু এইটুকু মাত্র মৌনতার অবকাশ পথ দিয়া এই অত্যাশ্চর্য মাহুতটির অত্যধিক আশ্চর্য্য হৃদয়ের রহস্তাবৃত তলদেশে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই ডাক্তার সমস্ত ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া ফেলিলেন। সহসা ছেলেমাহুতের মত মাথা নাড়িয়া স্মিতস্বরে কহিলেন, অপূর্ব্বকে তুমি বড় অবিচার করেছ ভারতী। এতবড় মারাত্মক কাণ্ড এর ভেতরে আছে সে বেচারী বোধ করি কল্পনাও করে নি। বাস্তবিক

বল্টি তোমাকে, এত ছোট, এত হীন সে কখনো নয়। চাকরি করতে বিদেশে এসেছে, বাড়ীতে না আছে, ভাই আছে, দেশে বন্ধু-বান্ধব আছে, সাময়িক উন্নতি করে দশজনের এক জন হবে এই তার আশা। কিন্তু নিখোঁচে, ভদ্রলোকের ছেলে পরাধীনতার লজ্জা সে জন্মভব করে। আরো দশজন বাঙালীর ছেলের মত সত্য সত্যই সে স্বদেশের কল্যাণ প্রার্থনা করে। তাই তুমি বললে যখন পুথের-দাবীর সভ্য হও, দেশের কাজ করো, সে বললে বহুৎ আচ্ছা! তোমার কথা শুনে যে তার কখনো মন্দ হবে না এইটুকুই কেবল সে নিঃসংশয়ে বোঝে। এই বিদেশে সকল আপদে-বিপদে তুমিই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সেই তুমিই যে হঠাৎ তাকে মরণের মধ্যে ঠেলে দেবে সে তার কি জানতো বল?

ভারতী অশ্রু গোপন করিতে মুখ নীচু করিয়া কহিল, কেন তুমি তাঁর জন্তে এত ওকালতী কোরচ দাদা, তিনি তাঁর যোগ্য নন। যে সব কথা তাঁর মুখ থেকে কাল শুনেচি, তারপরেও তাঁকে শ্রদ্ধা করা আর উচিত নয়।

ভাস্কর হাসিয়া বলিলেন, অল্পচিত কাজই না হয় জীবনে একটা করলে। এই বলিয়া একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ত চোখে দেখনি, ভারতী, কিন্তু আমি দেখেচি। তারা যখন তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধলে সে অবাক হয়ে রইল। তারা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এই সমস্ত বলেছ? সে ঘাড় নেড়ে বললে, হাঁ। তারা বললে, এর শাস্তি—তোমাকে মরতে হবে। প্রত্যুত্তরে সে কেবল ফাল্ ফাল্ করে চেয়ে রইল। আমি ত জানি তাঁর বিহ্বল দৃষ্টি তখন কান্নে ঝুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাই ত তোমাকে আনতে পাঠিয়েছিলাম বোন। এখন যাই কেননা তোমাকে সে বলে থাক, ভারতী, এ ধাক্কা বোধ হয় আজও অপূর্ব কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

ভারতী আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, ঝরু ঝরু করিয়া কাদিয়া ফেলিয়া কহিল, কেন আমাকে তুমি এই সব শোনাচ্চ দাদা। তোমার চেয়ে কারও আশঙ্কা বেশি নয়, তাঁর আশ্রয়ে বেশি বিপদে তোমার চেয়ে কেউ পড়ে নি। তবুও কেবল আমার দিকে চেয়ে তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি ঘরে-বাইরে শত্রু তৈরি করলে!

ইস্! তাই বই কি!

তবে কিসের জন্তে তাঁকে বাঁচাতে গেলে বলত?

বাঁচাতে গেলাম অপূর্বকে? আরে ছিঃ! আমি বাঁচাতে গেলাম তগবানের এই অমূল্য সৃষ্টিটিকে। যে বস্তু তোমাদের মত এই দুটি সামান্য নর-নারীকে উপলক্ষ করে গড়ে উঠেছে তার কি দাম আছে নাকি? যে ব্রহ্মের মত বর্জিত লোককে দেব তাই নষ্ট করে ফেলতে— শুধু এই ভারতী, শুধু এই। নইলে নাচুষের প্রাণের মূল্য আছে নাকি আমাদের কাছে? একটা কাণাকড়িও না! এই বলিয়া ডাক্তার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ভারতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কি হাসো দাদা। তোমার হাসি দেখলে আমার গা জলে যায়। আমার এমন ইচ্ছে করে যে তোমাকে আঁচল চাপা দিয়ে কোন বনে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে, তঁচরকাল লুকিয়ে রেখে দি। যারা পরে তোমাকে ফাঁসি দেবে তত্থাই কি তোমার দাম জানে? তারা কি টের পাবে জগতের কি সর্বনাশ তারা করলে? নিছের দেশের লোকই তোমাকে খুনে, ডাকাত, বক্তাপিপাস্থ, —কত কথাই না বলে! কিন্তু আমি ভাবি, বুকের মধ্যে এত স্নেহ, এত স্নেহ নিয়ে তুমি কেমন করে এর মধ্যে আছ!

এইবার ডাক্তার আর একদিকে চাহিয়া রহিলেন, সহসা জবাব দিতে পারিলেন না। তারপরে মুখ ফিরাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এখন সেই স্বচ্ছন্দ সুন্দর হাসিটি মুখে ফুটিল না। কথা কহিলেন,

কিন্তু সেই সহজ কণ্ঠস্বরে কোথা হইতে একটা অপরিচিত ভার চাপিয়া আসিল, কহিলেন, নিঃস্বস্তি দিয়ে কি কখনো,—আচ্ছা থাক্ সে কথা। তোমাকে একটা গল্প বলি। নীলকান্ত যোশী বলে একটি মারহাট্টা ছেলেকে তুমি জানি, কিন্তু তোমাকে দেখে পর্যন্ত কেবলি আমার তাকেই মনে পড়ি। রাস্তা দিয়ে মরা নিয়ে যেতে দেখলে তার চোখ দিয়ে জল পড়তো। একদিন রাত্রে কলম্বোর একটা পার্কের মধ্যে আমরা দুজনে বেড়া ডিঙিয়ে আশ্রয় নিই। গাছতলার একটা বেঞ্চের উপরে শুতে গিয়ে দেখি আর একজন শুয়ে আছে। মাছুষের সাড়া পেয়ে সে জল জল করতে লাগলো, চারিদিকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরিয়েছে,—দেশলাই জেলে তার মুখের পানে তাকিয়েই বোঝা গেল, কলেরা। নীলকান্ত তার শুশ্রূষায় লেগে গেল। ফর্সা হয়ে আসে, বোল্‌লো, যোশী, লোকটা সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন করেই হোক পেয়াদাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই বাগানটার রয়ে গেছে, কিন্তু সকালে তা' হয়ে না। ওয়ারেন্টের আসামী আমরা,—এ তো মরবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যে ফাঁসি হবে। চল, সরি! নীলকান্ত কঁাদতে লাগলো, বল্লে, এ অবস্থায় একে কি করে ফেলে যাবো ভাই,—তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি থাক আমি থাকি। অনেক বুঝালাম, কিন্তু যোশীকে নড়াতে পারলাম না।

ভারতী সভয়ে কহিল, কি হল তার পরে?

ডাক্তার কহিলেন, লোকটা বিবেচক ছিল, ভোর হবার পূর্বেই চোখ বুজলো। তাই সে যাত্রায় নীলকান্তকে নড়াতে পারলাম। সন্ধ্যাকাল যখন থাকিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, সিঙ্গাপুরে জেদ্দার ফাঁসি হয়। পণ্টনের সিপাইদের নাম বলে দিলে ফাঁসিটার তার মাপ হতো,—গবর্ণমেন্ট থেকে অনেক প্রকার চেষ্টাই হয়েছিল, কিন্তু যোশী সেই যে ঘাড় নেড়ে বল্লে আমি জানিনে, তার আর বদল হল না।

অতএব, রাজ্যের আইনে তার ফাঁসি হক্ক। অথচ, বাদেবর্তী সে প্রাণ দিলে, তাদের সে ভাল করে চিন্তা না। এখনও এই সব ছেলে এদেশেই জন্মায় ভারতী, তা, নইলে বাকি জীকট তোমার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকতেই হয়ত রাজি হয়ে পড়তাম।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। মা তাকে কহিলেন, নরহত্যা আমার ব্রত নয়, ভাই, তোমাকে সত্যিই বল্চি, ও আমি চাইনে।

চাইতে না পারো, কিন্তু প্রয়োজন হলে ?

প্রয়োজন হলে ? কিন্তু, ব্রজেন্দ্রের প্রয়োজন এবং সব্যসাচীর প্রয়োজন ত এক নয় ভারতী।

ভারতী বলিল, সে আমি জানি। আমি তোমার প্রয়োজনের কথাই জিজ্ঞাসা কর্চি দাদা।

প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার স্বর্ণকাল চূপ করিয়া বহিলেন। মনে হইল যেন উত্তর দিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেছেন। তাহার পরে কতকটা যেন অচমত্বের মত ধীরে ধীরে বলিলেন, কে জানে কেবে-আমার সেই পরম প্রয়োজনের দিন আসবে। কিন্তু, থাক্, ভারতী, এ তুমি জানতে চেয়োনা। তার চেহারা তুমি কল্পনাতেও সহিতে পারবেনা, বোন।

ভারতী এ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, কহিল, এ ছাড়া কি আর পথ নেই ?

না।

ডাক্তার মুখের এই সংশয়লেশহীন অকুণ্ঠিত উত্তর জানিয়া ভারতী হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর 'না' সে সত্যিই মাথু করিতে পারিল না। ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, এ ছাড়া আর পথ নেই, এমন কিন্তু হতেই পারে না দাদা।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, না, পথ আছে বই কি! আপনাকে ভোলাস্বর অনেক রাত্তা খোলা আছে, ভারতী, কিন্তু সত্যে পৌছাঙ্গর আর দ্বিতীয় পথ নেই।

ভারতী কহিতে পারিল না। শাস্ত্র, মুহূ কণ্ঠে কহিল, দাদা, তুমি অশেষ জ্ঞানী। এই একটি মাত্র লক্ষ্য স্থির রেখে তুমি পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েচ, তোমার অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। তোমার মত এত বড় মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। আমার মনে হয়, কেবল তোমার সেবা করেই আমি সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। তোমার সঙ্গে তর্ক সাজেনা, কিন্তু বল, আমার অপরাধ নেবেনা?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কি বিপদ! অপরাধ নেব কিসের জগে?

ভারতী তেমনি স্নিক্ত সবিনয়ে কহিতে লাগিল, আমি ক্রীশ্চান, শিশুকাল থেকে ইংরাজকেই আত্মীয় জেনে, বন্ধু জেনে বড় হয়ে উঠেছি, রাজ তাদের প্রতি মন দ্বণায় পূর্ণ করে তুলতে আমার ভারি কষ্ট হয়। কিন্তু তুমি ছাড়া এ কথা আমি কারও সম্মুখে বলতে পারিনে। অথচ, আমাদের মতই আমি ভারতবর্ষের,—বাঙলা দেশের মেয়ে। আমাকে আমি কিসের কোরো না।

তার কথা শুনিয়া ডাক্তার আশ্চর্য্য হইলেন। সম্মুখে ডান হাতখানি তাহার মাথার উপরে রাখিয়া কহিলেন, এ আশঙ্কা কেন ভারতী? তুমি ত জানো তোমাকে আমি কত স্নেহ, কত বিশ্বাস করি।

ভারতী বলিল, জানি। আর তুমিও কি আমার ঠিক এই কথাই জাননা? তোমার ভয় নেই, ভয় তোমাকে দেখানো যায় না। শুধু এইজগতের কেবল তোমাকে বলতে পারিনি, এ বাড়ীতে আর তুমি এসো না। কিন্তু এও জানি, আজকে রাত্রির পরে আর কখনো,—না, তা' নয়, হয়ত, অনেকদিন আর দেখা হবেনা। সেদিন যখন তুমি

সমস্ত ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ করলে তখন প্রতিবাদ আমি করিনি, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বিরস্তর এই প্রার্থনাই করেছি, এত বড় বিদ্বেষ যেন না তোমার অন্তরের সমস্ত সত্য আচ্ছন্ন করে রাখে। দাদা, তবুও আমি তোমাদেরই।

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, হাঁ আমি জানি, তুমি আশীর্বাদেই।

তা'হলে এ পথ তুমি ছাড়া।

ডাক্তার চমকিয়া উঠিলেন, কোন্ পথ ?

বিশ্ববীর্ষদের এই নির্ধন পথ।

কেন ছাড়তে বল ?

ভারতী কহিল, তোমাকে মরতে দিতে আমি পারবনা। সুমিত্রা-পাটের, কিন্তু আমি পারিনে। ভারতের মুক্তি আমরা চাই—অকপটে, অসঙ্কোচে, মুক্তকণ্ঠে চাই। দুর্বল, পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীর অন্ন-বস্ত্র চাই। মৃত্যু জন্ম নিয়ে মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই। ভগবানের এতবড় সত্যে উপস্থিত হবার এই নিষ্ঠুর পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই এ আমি কোন দৃষ্টিতেই ভাবতে পারিনে। পৃথিবী ঘুরে তুমি শুধু ওই পথের খুঁটটাই জেনে এসেছ, সৃষ্টির দিন থেকে স্বাধীনতার তীর্থ-যাত্রী শত সহস্র যাত্রকের পারে পারে এই পথের চিহ্নটাই হয়ত তোমার চোখে স্পষ্ট হয়ে পড়েচে, কিন্তু বিশ্ব-মানবের একান্ত শুভ-বুদ্ধি, তার অনন্ত বুদ্ধির ধারা কি এমনই নিঃশেষ হয়ে গেছে যে এই রক্ত-রেখা ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানই কোন দিন তার চোখে পড়বে না ? এমন বিধান কিছুতেই সত্য হতে পারেনা। দাদা, মৃত্যুভয়ের এতবড় পরিপূর্ণতা তুমি ছাড়া আর কোথাও আমি দেখিনি,—নিষ্ঠুরতার এই বারম্বার চলা-পথে তুমি আর ছেলেওনা। দুয়ার হয়ত আজও রুদ্ধ আছে, তাই তুমি আমাদের জগ্রে খুলে দাও—এ জগতের সবাইকে ভালবেসে আমরা তোমাকে অনুসরণ করে চলি।

ভক্তার স্নানমুখে একটুখানি হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর ভারতীর মাথার পিঠে হাত রাখিয়া বার দুই ধীরে ধীরে চাপড়াইয়া কহিলেন, স্নান করার সময় নেই ওই, আমি চললাম।

কোন্‌র দিকে গেলেনা, দাদা?

প্রত্যুত্তরে ভক্তার শুধু কহিলেন, ভগবান যেন তোমার ভাল করেন।
—এই বলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

(২২)

জলপথে শত্রুপক্ষীয় জাহাজের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে নদীর ধারে, সহরের শেষ প্রান্তে একটি ছোট রকমের মাটির কেল্লা আছে, এখানে সিপাহি-সান্নী অধিক থাকেনা, শুধু ব্যাটারি চালনা করিবার জন্ত কিছু গোরা-গুলন্দাজ ব্যাটাকে বাস করে। ইংরেজের এই নিবিঘ্ন শান্তির দিনে বিশেষ কড়া-কড়ি এখানে ছিলনা। নিষেধ আছে, অগ্ন্যমনস্ক পথিক কেহ তাহার সীমানার মধ্যে গিয়া পড়িলে তাড়া করিয়াও আসে, কিন্তু ঐ পর্যান্তই। ইহারই একদারে গাছ-পালার মধ্যে পাথরে বাধানো একটা ঘাটের মত আছে, হয়ত কোন উচ্চ রাজ-কর্মচারীর আগমন উপলক্ষে ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, কিন্তু এখন ইহার কাজও নাই, প্রয়োজনও নাই। ভারতী মাঝে মাঝে একাকী আসিয়া এখানে বসিত। কেল্লার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাহাদের প্রতি ছিল তাহাদের কেহ যে দেখে নাই তাহা নহে, সম্ভবতঃ স্ত্রীলোক বলিয়া, এবং ভদ্র স্ত্রীলোক বলিয়াই তাহারা আপত্তি করিতনা। বোধ করি এই মাত্র স্বর্ণস্বয়ং হইয়া থাকিবে, কিন্তু অন্ধকার হইতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। নদীর কাতক অংশে, এবং পরপারবর্তী গাছপালার উপরে শেষ হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে; দলে দলে পাখীর সারি এদিক হইতে ওদিকে উড়িয়া চলিয়াছে,—কাকের কালো দেহে, বকের শাদা পালকে, ঘুঘুর বিচিত্র পাখুর মর্দাঙ্গে আকাশের রাস্তা আলো মিশিয়া হঠাৎ যেন তাহাদিগকে

কোন অজানা দেশের জীব করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের অবধি হচ্ছন্দ গতি অতুসরণ করিয়া ভারতী নির্নিবেচকে চাহিয়া রহিল। কি জানি, কোথায় ইহাদের বাসা, কিন্তু সে অলক্ষ্য স্বাক্ষর কাহারও এড়াইয়া যাইবার যো নাই। এই কথা মনে করিয়া তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া চাহিয়া দেখিল দূর বৃক্ষশ্রেণীর সোনার দীপ্তি নিবিয়া আসিতেছে এবং মাথার উপরে গাছ-পালা নদীতে দীর্ঘতর ছায়াপাত করিয়া জল কালো করিয়া আনিয়াছে এবং তাহারই মধ্যে হইতে অন্ধকার ঘন স্বদীর্ঘ জিহ্বা মেলিয়া সমুদ্রের সমস্ত আলোক নিঃশব্দে লেহন করিয়া লইতেছে।

সুহসা নদীর ডানদিকের বাঁক হইতে একখানি ক্ষুদ্র শাম্পান নৌকা সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌকায় মাঝি ভিন্ন অন্য আরোহী ছিল না। সে চট্টগ্রামী মুসলমান। ক্ষণকাল ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চট্টগ্রামের দুর্কোধ্য মুসলমানী বাঙলায় কহিল, আম্মা, ওপারে যাবে? এক আনা পয়সা দিলেই পার করে দিই।

ভারতী হাত নাড়িয়া কহিল, না, ওপারে আমি যাবো না।

মাঝি বলিল, আচ্ছা ছোটো পয়সা নাও, চল।

ভারতী কহিল, না বাপু তুমি যাও। বাড়ী আমার এপারের ওপারে যাবার আমার দরকার নেই।

মাঝি গেলনা, একটু হাসিয়া কহিল, পয়সা না হয় নাই দেবে, চল তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে ঘাটের ওপারে নৌকা ভিড়াইতে উত্তত হইল। ভারতী ভয় পাইল। গাছপালা মধ্যে স্বাক্ষর অন্ধকার এবং নির্জন। দীর্ঘ দিন এদেশে থাকার জন্য ইহাদের ভাষা বলিতে না পারিলেন ভারতী বৃত্তিত। এবং ইহাও জানিত, চট্টগ্রামের এই মুসলমান মাঝি-সম্প্রদায় অতিশয় দুর্বৃত্ত। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুদ্বসরে কহিল, তুমি যাও বলুচি এখান থেকে, নইলে পুলিশ ডাকবে।

তাহার উচ্চ কণ্ঠ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে বোধ হয় চট্টগ্রামী মুসলমান এবার ভয় পাইয়া থাকিল। ভারতী চাহিয়া দেখিল লোকটার বয়স আন্দাজ ষাশ হইয়াছে, কিন্তু সখ যায় নাই। পরণে লতা-পাতা ফুল-কাটা পুস্প তেলে ও ময়লায় অত্যন্ত মলিন। গায়ে মূল্যবান মিলিটারি ফক কাট, জবির পাড়, কিন্তু যেমন নোঙরা তেমনি জীর্ণ। বোধ হয় কোন পুরাতন দামা কাপড়ের দোকান হইতে কেনা। মাথায় বেগদার গ্রাকড়ার টুপি, কপাল পর্যন্ত টানা। এই যুক্তির প্রতি রোষদৃষ্টিতে চাহিয়া ভারতী কয়েক মুহূর্ত পরেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দাদা, চেহারা যাই হোক, কিন্তু গলার আওয়াজটাকে পর্যন্ত বদলে মুসলমান করে ফেলেচ!

মাঝি কহিল, যাবো, না পুলিশ ডাকবে?

ভারতী লিল, পুলিশ ডেকে তোমাকে বরিয়ে দেওয়াই উচিত। অপূর্ববাবুর ইচ্ছেটা আর অপূর্ণ রাখি কেন!

মাঝি কহিল, তার কথাই বল্চি! এসো। জোয়ার আর বেশি নেই, এখনো কোশ দুই যেতে হবে।

ভারতী নৌকায় উঠিলে, ঠেলিয়া দিয়া ডাক্তার পাকা মাঝির মতই হতবেগে অগ্রসর হইলেন। যেন দুই হাতে তুখানা দাঁড় টানাই তাহার পেশা। কহিলেন, লামা জাহাজ চলে গেল দেখলে?

ভারতী কহিল, হা।

ডাক্তার কহিলেন, অপূর্ব এই দিকের ফাষ্ট ক্লাস ডেকে দাঁড়িয়েছিল দেখলে পেলো?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

ডাক্তার কহিলেন, তার বাসায় কিম্বা আফিসে আমার বাবার ঘো ছিল না, তাই জেটির একধারে শাম্পান বেঁধে আমি ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হাত তুলে সেলাম করতেই—

ভারতী ব্যাকুল হইয়া কহিল, কার জন্তে কিসের জন্তে এতবড় ভয়ানক কাজ তুমি করতে গেল দাদা? প্রাণটা কি তোমার একেবারেই ছেলেখেলা?

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, একেবারেই না। আমার গেলাম কিসের জন্তে? ঠিক সেই জন্তে যে জন্তে তুমি চুপটি করে এখানে একলা বসে আছো, বোন।

ভারতী উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কিছুতেই চাপিতে পারিল না। কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, কথখনো না। এখানে আমি এমনি এসেছি—প্রায় আসি। কারও জন্তে আমি কথখনো আসিনি। তোমাকে চিন্তে পারলেন?

ডাক্তার সহাস্তে বলিলেন, না, একেবারেই না। এ বিত্তে আমার খুব ভাল করেই শেখা,—এ দাড়ি-গোক ধরা সহজ কথ নয়, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে ছিল অপূর্ববাবু যেন আমাকে চিন্তে পারেন। কিন্তু এত ব্যস্ত যে তার সময় ছিল কই?

ভারতী নীরবে চাহিয়া ছিল, সেই অত্যন্ত উৎসুক মুখের প্রতি চাহিয়া ক্ষণকালের জন্ত ডাক্তার নির্বাক হইয়া গেলেন।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে কি হল?

ডাক্তার বলিলেন, বিশেষ কিছুই না।

ভারতী চেষ্টা করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, বিশেষ কিছু যে হয়নি সে শুধু আমার ভাগ্য। চিন্তে পারলেই তোমাকে ধরিয়ে দিতেন। আর সে অপমান এড়াবার জন্তে আমাকে আত্মহত্যা করতে হতো। চাকরি বন্ধ, কিন্তু প্রাণটা বাঁচলো! এই বলিয়া সে দূর পরপারে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া নিঃশ্বাস মোচন করিল।

ডাক্তার নীরবে নৌকা বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া ভারতী সহসা মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি ভাবচো দাদা?

বলত দেখি ?

বোলব ? তুমি অবচো এই ভারতী মেয়েটা আমার চেয়ে ঢের বেশি মায়ায় চিন্তা পাবে। নিজের প্রাণ বাঁচাতে কোন শিক্ষিত লোকই হে — দীনতা স্বীকার করতে পারে,—লজ্জা নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, মায়া দুয়া এই,—খবর দিলেনা, খবর নেবার এতটুকু চেষ্টি করলেনা,—ভয়ের তাড়নায় একেবারে জন্তর মত ছুটে পালিয়ে গেল, এ কথা আমি কল্পনা করতেও পারিনি, কিন্তু ভারতী একেবারে নিঃসংশয়ে ছেনেছিল ! ঠিক এই না ? সত্যি বোলো।

ডাক্তার ঘাড় ফিরাইয়া নিকন্তরে দাঁড় টানিয়া চলিতে লাগিলেন, কিছুই বলিলেন না।

আমার দিকে একবার চাওনা দাদা !

ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই ভারতীর দুই চোঁট খবু খবু করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কহিল, মানুষ হয়ে মনুষ্য জন্মের কোথাও কোন বালাই নেই এমন কি করে হয় দাদা ? এই বলিয়া সে দাঁত দিয়া জোর করিয়া তাহার গুঠাধরের কম্পন নিবারণ করিল, কিন্তু দুই চোখের কোণ বহিয়া ঝবু ঝবু করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ডাক্তার সায় দিলেন না, প্রতিবাদ করিলেন না, মাঝনার একটি বাক্যও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কেবল পলকের জন্ত যেন মনে হইল তাহার স্বর্মাটানা চোখের দীপ্তি ঈষৎ স্তিমিত হইয়া আসিল।

ইরাবতীর এই ক্ষুদ্র শাখানদী অগভীর ও অপ্রশস্ত বলিয়া প্রীয়ার বা বড় নৌকা সচরাচর চলিত না। জেলেদের মাছ ধরার পান্সি কিনারায় বাধা মাঝে মাঝে দেখা গেল, কিন্তু লোকজন কেহ ছিল না। মাথার উপরে তারা দেখা দিয়াছে, নদীর জল কালো হইয়া উঠিয়াছে, নির্জন ও পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে ডাক্তারের সতর্কচালিত দাঁড়ের সামান্য একটুখানি শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ কোথাও ছিল না। উভয়

ভীরের বৃক্ষশ্রেণী যেন সম্মুখে এক হইয়া মিশিয়াছে। তাহারই ঘনবিশ্বস্ত
মাথা-পল্লবের অঙ্ককার অভ্যন্তরে সজল দুটি নিবন্ধ করিয়া ভারতী নীরবে
স্থির হইয়া বসিয়াছিল। তাহাদের শাস্পান যে কোন্‌ কানায় চলিয়াছিল
ভারতী জানিত না, জামিবার মত উৎসুক সন্ধ্যার সেই অবস্থাও
তাহার ছিল না, কিন্তু সহসা প্রকাণ্ড একটা গাছের অশ্রু-পল্লব-লতা-
পাতা সমাচ্ছন্ন অতি সংকীর্ণ খাদের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র তরী
প্রবেশ করিল দেখিয়া সে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কোথায়
নিয়ে বাচো?

ডাক্তার কহিলেন, আমার বাসায়।

সেখানে আর কে থাকে?

কেউ না।

কখন আমাকে বাসায় পৌছে দেবে?

পৌছে দেব? আজ রাত্রির মধ্যে যদি না দিতে পারি কাল
সকালে যেরো।

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, না দাদা সে হবে না। তুমি আমাকে
যেখান থেকে এনেছ সেখানে ফিরে রেখে এস।

কিন্তু আমার যে অনেক কথা আছে ভারতী!

ভারতী ইহার জবাব দিল না, তেমনি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইয়া
বলিল, না, তুমি আমাকে ফিরে রেখে এস।

কিন্তু কিসের জন্ত ভারতী? আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয় না?

ভারতী অধোমুখে নিরন্তর হইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, এমন কত রাত্রি ত তুমি একাকী অপূর্বের সঙ্গে
কাটিয়েছ, সে কি আমার চেয়েও তোমার বেশি বিশ্বাসের পাত্র?

ভারতী তেমনি নির্বাক হইয়াই রহিল, ই না কোন কথাই কহিল
না। খালের এই স্থানটা যেমন অন্ধকার তেমনি অপ্রশস্ত। দু'ধীরের

গাছের ডাল মাঝে মাঝে তাহার গায়ে আসিয়া ঠেকিতে লাগিল। এদিকে নদীতে তাঁটার উল্টা টান হুকু হইয়া গেছে,—ডাক্তার খোলার মধ্যে হইতে বর্জন বাহির করিয়া জালিয়া সম্মুখে রাখিলেন, এবং দাঁড় রাখিয়া দিন একটা রীতিমত রাশ হাতে লইয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিলেন, আজ যেখানে ভোজ্যে নিয়ে যাচ্ছি ভারতী, দুনিয়ার কেউ নেই সেখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু আমার মনের কথা বুঝতে বোধ হয় তোমার আর বাকি নেই? এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া যেন জোর করিয়া হাসিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাহার মুখের চেহারা ভারতী দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাহার হাসির স্বরে কে যেন অকস্মাৎ তাহার ভিতর হইতে তাকে দিক্কার দিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া নিঃশঙ্ক-কণ্ঠে কহিল, তোমার মনের কথা বুঝতে পারি এত বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু, তোমার চরিত্রকে আমি চিনি। একলা থাকা আমার উচিত নয় বলেই ওকথা বলেছি দাদা, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

ডাক্তার স্বপ্নকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বাভাবিক শাস্তকণ্ঠে কহিলেন, ভারতী, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হয়। তুমি আমার বোন, আমার দিদি, আমার মা,—এ বিশ্বাস নিজের পরে না থাকলে এ পথে আমি আনুতাম না। কিন্তু তোমার মূল্য দিতে পারে এ সংসারে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এর শতাংশের এক অংশও অপূর্ণ যদি কোনদিন বোঝে ত জীবনটা তার সার্থক হয়ে যাবে। দিদি, সংসারের মধ্যে তুমি ফিরে যাও,—আমাদের ভেতরে আর তুমি থেকো না। কেবল তোমার কথাটাই বলবার জন্যে আজ অপূর্ণের সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। আজ একটা কথাও না বলিয়া অপূর্ণ চলিয়া গেছে। চাকরি করিতে বন্দ্য আনিয়াছিল, মাঝে ক'টা দিনেই বা পরিচয়!

পথের দাবী

সে ব্রাহ্মণের ছেলে, ধর্ম ও হিন্দু-আচারের প্রতি তাহার অগাধ নিষ্ঠা, তাহার দেশ আছে, সমাজ আছে, বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন কত কি! আর অস্পৃশ্য ক্রীশ্চানের মেয়ে ভারতী! দেশ নাই, গৃহ নাই, মা-বাপ নাই, আপনাব বলিতে কোথাও কেহ নাই। এ পরিচয় যার সাক্ষ্য হইয়াই থাকে ত অভিযোগের কি-ই বা আছে! ভারতী তেমনি শব্দেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কেবল অন্ধকারে দুই চক্ষু বহিয়া তাহার অবিরল জল পড়িতে লাগিল।

অনতিদূরে গাছ-পালার মধ্যে হইতে সামান্য একটু আলো দেখা গেল। ডাক্তার দেখাইয়া কহিলেন, ওই আমার বাসা। এই বাকটা পেরোলেই তার দোরগোড়ায় গিয়ে উঠবো। খুব ফ্রি ছিলাম, কি একরকম মায়াম জড়িয়ে গেলাম, ভারতী, তোমার জন্তেই আমার ভাবনা। কোন একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছ শুধু এইটুকুই যদি যাবার আগে দেখে যেতে পারতাম!

ভারতী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। বলিল, আমি ত ভালই আছি, দাদা।

ডাক্তারের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। এ বস্তুটা এতই অসাদারণ যে, ভারতীর কানে গিয়া তাহা বিধিল। কহিলেন, কোথায় ভাল আছ ভাই? আমার লোক এসে বললে তুমি ঘরে নেই। ভাবলাম জেটির উপরে কোথাও এক জায়গায় তোমাকে পাবো, পেলাম না বটে, কিন্তু তখন নিশ্চয় মনে হল এই নদীর ধারে কোথাও-না-কোথাও দেখা তোমার মিলবেই। দুর্ভাগ্য তোমার অনন্দই, শুধু চুরি করে পালায়নি, ভারতী, তোমার সাহসটুকু পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

এ কথার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া ভারতী নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, সেদিন রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে আমাকে

বিছাড়া ছেড়ে দিয়ে তুমি নীচে গুলে। হেসে বললে, দাদা, তুমি কি আবার মাহুষ যে তোমাকে আমার লজ্জা বা ভয়? তুমি ঘুমোও। কিন্তু আজ আমি সে সাহস নেই। বিশেষ নির্ভর করবার লোক অপূর্ণ নয়, তবু সে কখনো কখনো বলে কালও হয়ত এ আশঙ্কা তোমার মনেও হতো না। আশ্চর্য্য এই যে তোমার মত মেয়েরও নির্ভর স্বাধীনতাকে তার মত একটি অক্ষম লোকেও না কত সহজেই ভেঙে দিয়ে যেতে পারে।

ভারতী মুহূর্তে কহিল, কিন্তু উপায় কি দাদা?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উপায় হয়ত নেই। কিন্তু আমি ভাবছি বোন, চরিত্রকে তোমার সন্দেহ করতে আজ কেউ কাছে নেই বলে, তোমার নিজের মনটাই যদি অহরহ তোমাকে সন্দেহ করে বেড়ায় তুমি বাঁচবে কি করে? এমন করে ত কারও প্রাণ বাঁচে না ভারতী।

এমন করিয়া ভারতী আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই। তাহার সময় ছিলই বা কই! তাহার শ্রদ্ধাও বিশ্বাসের অবশিষ্ট রহিল না, কিন্তু সে নির্বাক হইয়া রহিল।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, আমি আর একটি মেয়েকে জানি, সে জাতে রুখ। কিন্তু তার কথা থাকুক। কবে তোমাদের আবার দেখা হবে আমি জানিনে, কিন্তু মনে হয় যেন একদিন হবে। বিদাতা করুন, হোক। তোমার ভালবাসার তুলনা নেই, সেখান থেকে অপূর্ণকে কেউ সরাতে পারবে না, কিন্তু নিজেই তার গ্রহণযোগ্য করে রাখবার আজ থেকে এই যে জীবনব্যাপী অতি-সতর্ক সাধনা শুরু হবে, তার প্রতিদিনের অসঙ্গানের গ্লানি মল্লুগুত্বকে যে তোমার একেবারে খর্ব্ব করে দেবে ভারতী! হায়রে! এমন চিরশুদ্ধ হৃদয়ের মূল্য যেখানে নেই, সেখানে এমনি করেই বোঝাতে হয়! পদ্মফুল চিবিয়ে না খেয়ে যারা তৃপ্তি মানে না, সেহের শুদ্ধতা দিয়ে এমনি করেই কান মলে তার কাছে দাম আদায় হয়! হবেও হয়ত। কি জানি, কপালে বাঁচবার মিয়াদ ততদিন আমার

পথের দাবী

২৮২

আছে কি না, কিন্তু যদি থাকে দিদি, বোন বলে গর্ক করবার তখন আর
সবাসাচীর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে তা'হলে কি করতে বল, তুমিই
ত আমাকে বারবার বলেছ সংসারের মধ্যে দিগের যেতে।

কিন্তু মাথা হেঁট করে যেতে ত বলিনি।

ভারতী বলিল, কিন্তু মেরেনাহুদের উঁচু মাথা ত সবাই পছন্দ করে
না দাদা।

ডাক্তার বলিলেন, তবে যেমনা।

ভারতী স্নানমুখে হাসিয়া বলিল, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকো
দাদা, যাওয়া আমার হবে না। সমস্ত পথ নিজের হাতে সজ্জ করে কেবল
একটি পথ খুলে রেখেছিলাম, সেও আজ বন্ধ হয়ে গেছে এ ত তুমি
নিজের চোখেই দেখে এসেছ। এখন, যে পথ আমাকে দেখিয়ে দেবে
সেই পথেই চলবো; কেবল এইটুকু মিনতি আমার রেখো, তোমাদের
ভয়ঙ্কর পথে আমাকে তুমি ডেকো না। ভগবানের মত ছুপ্পাপ্য বস্তু
পাবারও এত রাস্তা বেরিয়েছে, শুধু তোমার লক্ষ্যে পৌছবারই রক্তপাত
ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই? আমার একান্ত মনের বিশ্বাস মানুষের
বুদ্ধি একেবারে শেষ হয়ে যায় নি, কোথাও-না-কোথাও অন্য পথ আছেই
আছে! এখন থেকে তারই সন্ধানে আমি পথে বার হবো। ভয়ানক
ছুখে যে কি সে রাত্রে আমি টের পেয়েছি, যেদিন তোমরা তাঁকে হত্যা
করতে উত্তত হয়েছিলে।

ডাক্তার হাসিলেন, কহিলেন, এই আমার বাসা। এই পায় ফুট
নৌকো-জোর করিয়া ডান্দায় ঠেলিয়া দিয়া অবতরণ করিলেন, এবং লঠন
হাতে তুলিয়া লইয়া পথ দেখাইয়া কহিলেন, জুতো খাল নেবে এসো।
পায়ে একটু কাদা লাগবে।

ভারতী নিঃশব্দে নামিয়া আসিল। গোটা চারেক মোটা মোটা

সেই কাঠের খুঁটির উপর পুরাতন ও প্রায় অব্যবহার্য তক্তা মারিয়া একটা কাঠের বাড়ী খাড়া করা হইয়াছে। জোয়ারের জল সরিয়া গিয়া মনে তল্লাট একটু পাক পড়িয়াছে, লতা-পাতা, গাছ-পালা পচা দুর্গন্ধে বুড়ো পর্য্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে, সন্মুখের হাত দুই পরিসর পথটুকু ছাড়া চারিদিক কেয়া ও দেনো গাছের এমনি দুর্ভেজ জঙ্গলে ঘেরিয়া আছে, যে, শুধু সাপ-খোপ বাঘ ভালুক নয়, একপাল হাতী লুকাইয়া থাকিলেও দেখিবার যো নাই। ইহার ভিতরে যে মানুষ বাস করিতে পারে তাহা চোখে না দেখিলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু এই লোকটির কাছে সকলই সম্ভব। ভাঙ্গা কাঠের সিঁড়ি ও দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে একটি সাত আট বছরের ছেলে আসিয়া যখন দ্বার খুলিয়া দিল, তখন ভারতী বিষয়ে বাক্যহীন হইয়া রহিল। ভিতরে পা বাড়াইতেই দেখিতে পাইল মেঝের উপর চাটাই পাতিয়া শুইয়া একজন অল্পবয়স্ক বর্ষা স্ত্রীলোক, তিন চারিটি ছেলে-মেয়ে যে যেখানে পড়িয়া, ইহাদেরই একজন ঘরের মধ্যে বোধ হয় একটা অপকর্ম করিয়া রাখিয়াছে,—খুব সম্ভব অনাবশ্যক বোধেই তাহা পরিত্যক্ত হয় নাই—একটা দুঃসহ দুর্গন্ধে গৃহের বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, মেঝের সর্বত্র ছড়ানো ভাত, মাছের কাটা এবং পিয়াজ-রসূনের খোলা, নিকটেই গোটী দুই তিন কালি-মাখা ছোট বড় মাটির-হাড়ি, ছেলেগুলি হাত ডুবাইয়া খাব্লাইয়া ভাত তরকারী খাইয়াছে তাহা চাহিলেই বুঝা যায়; ইহারই পাশ দিয়া ভারতী ডাক্তারের পিছু পিছু আর একটা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথাও কোন আসবাবের বাসাই নাই, মেঝের উপর চাটাই পাতা, একধারে একটা সতরঞ্চি গুটান ছিল, ডাক্তার স্বহস্তে বাড়িয়া তাহা পাতিয়া দিয়া ভারতীকে বসিতে দিলেন। ভারতী নিঃশব্দে, উপবেশন করিয়া চাহিয়া দেখিল সেই পরিচিত প্রকাণ্ড বোচ্কাটি ডাক্তারের একপাশে রহিয়াছে। অর্থাৎ, সত্য সত্যই ইহার এই ঘরটিই

বর্তমান বাসস্থান। ওঘর হইতে বর্ষা স্ত্রীলোকটি কি একটা স্ক্রিডাসা করিল, ডাক্তার বর্ষা ভাষাতেই তাহার জবাব দিলেন। অনতিকাল পরেই সেই ছেলেরা সানুকিতে করিয়া দু চাঙড় ভাত, পেছাদায় ঝোল এবং পাতায় করিয়া থানিকটা মাছ-পোড়া আনিয়া একধারে রাখিয়া দিয়া গেল। নৌকার লণ্ঠনটি ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারই আলোকে এই সকল খাদ্যবস্তুর প্রতি চাহিবামাত্রই ভারতীর গা বমি-বমি করিয়া উঠিল।

ডাক্তার কহিলেন, তোমারও বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু এসব—

ভারতীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না, না, কিছুতে না। সে ক্রীষ্টানের মেয়ে, জাতিভেদ মানেনা, কিন্তু যেখান হইতে যেভাবে এই সকল আনীত হইল তাহা ত সে আসিবার পথেই চোখে দেখিয়া আসিয়াছে।

ডাক্তার কহিলেন, আমার কিন্তু ভারি ক্ষিদে পেয়েছে ভাই, আগে পেটটা ভরিয়ে নিই। এই বলিয়া তিনি হাত ধুইয়া স্মিতমুখে আহারে বসিয়া গেলেন। ভারতী চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, ঘুণায় ও অপরিণীম ব্যথায় মুখ ফিরাইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর হইতে কান্না যেন সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িতে চাহিল। হায়রে দেশ! হায়রে মুক্তির পিপাসা! জগতে কিছুই ইহারা আর আপনার বলিয়া অবশিষ্ট রাখে নাই। এই গৃহ, এই খাদ্য, এই ঘৃণিত সংশ্রব, এমনি কবিতা এই বহু পশুর জীবন যাপন, ক্ষণকালের জগ্ন মৃত্যুও ভারতী আছে অনেক সুসহ বলিয়া মনে হইল। সে হয়ত অনেকেরই পারে, কিন্তু এই যে দেহ-মনের অবিশ্রাম নির্যাতন, আপনাকে আপনি স্বেচ্ছায় পলে পলে এই যে হত্যা করিয়া চলার দুঃসহ সহিষ্ণুতা স্বর্গে মর্ত্তে কোথাও কি ইহার তুলনা আছে! অদীনতার বেদনা কি ইহাদের এ

জীবনের আর সমস্ত বেদনা-বোধই একেবারে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে! কিছুই কঁপাও বাকি নাই! তাহার অপূর্বকে মনে পড়িল। তাহার চাকরির শৌক, তাহার বন্ধু-মহলে হাতের কাল্‌শিরার লজ্জা,—ইহাগাই ত মাতার সহস্রকোটি সন্তান! ইহাগাই ত দেশের মেরু-মজ্জা, খাইয়া পরিয়া পাশ করিয়া চাকরিতে কৃতকায্য হইয়া যাহাদের একটানা জীবন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত পরম নিরাপদে কাটিতেছে! আর ওই যে লোকটি একান্ত তৃপ্তিতে নির্লিকার চিত্তে বসিয়া ভাত গিলিতেছে,—ভারতীর মুহূর্ত্তের জন্ম মনে হইল, হিমাচলের কাছে সহস্রখণ্ড উপলের তিলান্ন বেশি তাহারা নয়! আর তাহাদের একজনকে ভালবাসিয়া, তাহারই ঘরের গৃহিণীপণ্যর বঞ্চিত হুখে আজ সে বুক ফাটিয়া মরিতেছে। অকস্মাৎ ভারতী ছোর করিয়া বলিয়া উঠিল, দাদা, তোমার নিদ্দিষ্ট-ওই রক্তা-রক্তির পথ কিছুতেই ভাল নয়। অতীতের যত নজিরই তুমি দাও,—যা অতীত, যা বিগত, সে-ই চিরদিন ঊর্ধ্ব অনাগতের বুক চেপে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, মানব-জীবনে এ বিধান কিছুতেই সত্য নয়! তোমার পথ নয়, কিন্তু তোমার এই সকল-বিসর্জন-দেওয়া দেশের সেবাই আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম। অপূর্ববানু স্বখে থাকুন, তাঁর দ্বায়ে আর আমি শোক করিনে, আমার বাঁচবার মন্ত্র আজ আমি চোখে দেখতে পেরেছি।

ভাস্কর্য্য সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া ভাতের ডেলার মধ্যে হইতে অক্ষুটকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল ভারতী?

(২৩)

হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া ভাস্কর্য্য তাঁহার বোঁচকার উপরে ছাপিয়া বসিলেন। পূর্বোক্ত ছেলেটি মস্ত মোটা একটা বম্বা সেলাই টানিতে, টানিতে ঘরে ঢুকিল, এবং কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া নাক-মুখ দিয়া অপঘ্যাপ্ত ধূম, উদ্দিগরণ করিয়া চুকটটি ভাস্কর্য্যের হাতে দিয়া প্রস্থান করিল।

ভারতীর মুখে বিশ্বাসের চিহ্ন অল্পভব করিয়া ডাক্তার সহাস্তে কহিলেন, অমনি পেলে আমি সংসারে কিছুই বাদ দিতে ভালবাসিনে। ভারতী। অপূর্বের কাকাবাবু আমাকে স্বপ্ন বেদুনের জেটিতে প্রথম প্রেমের করেন, তখন পকেট থেকে আমার গাঁজার কল্কে বার হয়ে পড়েছিল। নইলে, বোধ হয় ছুটি পেতাম না। এই বলিয়া তিনি মুহু মুহু হাসিতে লাগিলেন।

ভারতী এ ঘটনা শুনিয়াছিল, কহিল, সে আমি জানি, এবং হাজার ছুটি পেলেও যে ওটা তুমি খাওনা তা-ও জানি। কিন্তু এ বাড়ীটি কার দাদা?

আমার।

আর এই বন্দি মেয়েটি, এবং শিশুগুলি?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, না, ওঁরা আমার একটি মুসলমান বন্ধুর সম্পত্তি। আমরা মত ফাঁসি-কাঠের আসামী, কিন্তু সে অল্প বাবদে। সম্পত্তি স্থানান্তরে গেছেন, পরিচয় ঘটবার সুযোগ হবেনা।

ভারতী কহিল, পরিচয়ের জন্তে আমি ব্যাকুল নই; কিন্তু সর্বদিক থেকে তুমি যে স্বর্গপুরীতে এসে আশ্রয় নিয়েছ, তার থেকে আমাকে বাসায় রেখে এসো দাদা, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ডাক্তার হাসিমুখে জবাব দিলেন, এ স্বর্গপুরী যে তোমার সইবেনা, সে তোমাকে আনবার পূর্বেই আমি জানতাম। কিন্তু, তোমাকে বলবার আমার যত কথা ছিল, সে তো এই স্বর্গপুরী ছাড়া প্রকাশ করবার। আর দ্বিতীয় স্থান নেই ভারতী। আজ তোমাকে একটুখানি ঠাণ্ডা পেতেই হবে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি শীঘ্রই আর কোথাও যাবে?

ডাক্তার কহিলেন, হাঁ। উত্তর এবং পূর্বের দেশগুলো আর একবার ঘুরে আসতে হবে। ফিরতে হয়ত বছর দুই লাগবে। কিন্তু, আজ

তুমি মানুষকে এত ব্যথা পেয়েছ বোন, যে সকল কথা বলতে আমার লজ্জা হয়। কিন্তু আজকের রাত্রির পরে আর যে সহজে তোমাকে দেখা দিতে পারবো সে ভরসাও করিনে।

কথা শুনিয়া ভারতী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কহিল, তুমি কি তা'হলে কালই চলে যাচ্ছো ?

ডাক্তার মৌন হইয়া রহিলেন। ভারতী মনে মনে বুঝিল ইহার আর পরিবর্তন নাই। তারপরে এই রাত্রিটুকু অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই—এ দুনিয়ায় সে একেবারে একাকী। খোঁজ করিবারও কেহ থাকিবেনা!

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, হাঁটা-পথে আমাকে দক্ষিণ চীনের ক্যান্টনের ভিতর দিয়ে এগোতে হবে। আর শু পথে কক্ষস্থলে যদি না অ্যামেরিকায় গিয়ে পড়ি ত প্রশান্ত মহাসাগরের ছাপগুলো ঘুরে আবার এই দেশেতেই এসে আশ্রয় নেব। তারপরে আগুন যতদিন না জলে, আমি এইখানেই রইলাম ভারতী। একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর কিবুতে যদি না-ই পারি বোন, বোধ হয় খবর একটা পাবেই।

এই মানুষটির শাস্তকণ্ঠের সহজ কথাগুলি কতই সামান্য, কিন্তু ইহার ভয়ঙ্কর চেহারা ভারতীর চোখের সম্মুখে কুটিয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, হাঁটাপথে চীনদেশে যাওয়া যে কত ভয়ানক সে আমি শুনেছি। কিন্তু তুমি মনে মনে হেসোনা দাদা, আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি,—অতটুকু তোমাকে আমি চিনি। কিন্তু, বেরিয়েই যদি যাও, এইখানেই আবার কেন ফিরে আসতে চাও? তোমার নিজের জন্মভূমিতে কি তোমার কাজ নেই?

ডাক্তার কহিলেন, তাঁরই কাজের জন্তে আমি এদেশ ছেড়ে মইজে যাবো না। মেয়েরা এ দেশের স্বাধীন, স্বাধীনতার মর্ম্ম তারা বুঝবে। তাদের আমার বড় প্রয়োজন। আগুন যদি কখনো এদেশে জলছে

পথের দাবী

দেখতে পাও, যেখানেই থাকো, ভারতী, এই কথাটা আমায় তথ্য স্বরণ করো, এ আগুন মেয়েরাই জেলেচে। কথাটা তোমার মনে থাকবে ত ?

এই ইঙ্গিত ভারতী বুঝিল, কহিল, কিন্তু তোমার পথের পথিক ত আমি নই !

ডাক্তার কহিলেন, তা' আমি জানি। কিন্তু পথ তোমার যাই কেন না হোক, বড় ভাইয়ের কথাটা স্বরণ করতে ত দোষ নেই,—তবু ত দাদাকে মাঝে মাঝে মনে পড়বে !

ভারতী কহিল, বড় ভাইকে মনে পড়বার আমার অনেক জিনিষ আছে। কিন্তু এমনি করেই বুঝি তোমার বিপথে মামুষকে তুমি টেনে আনো দাদা ? আমাকে কিন্তু তা' পারবে না। এই বলিয়া সহসা সে উঠিয়া পড়িল, এবং গুটানো সতরঞ্চিটা ঝাড়িয়া পাতিয়া দিয়া বাগের আলনা হইতে কদল বালিশ প্রভৃতি পাড়িয়া লইয়া স্বহস্তে শয্যা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, অপূর্ববাবুর জাহাজের চাকা আজ আমাকে যে পথের সন্ধান দিয়ে গেছে, এ জীবনে সেই আমার একটিমাত্র পথ। আবার যেদিন দেখা হবে, এ কথা তুমিও সেদিন স্বীকার করবে।

ডাক্তার ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হঠাৎ এ আবার কি শুরু করে দিলে ভারতী ? এই ছেঁড়া কদলটুকু কি আমি নিজে পেতে নিতে পারতাম না ? এর ত কোন দরকার ছিল না।

ভারতী কহিল, তোমার ছিল না বটে, কিন্তু আমার ছিল। আর জন্মে যখনই বিছান' পাতি দাদা, তোমার এই ছেঁড়া কদলটুকু আর কখনো তুলব না। মেয়ে মানুষের জীবনে এরও যদি না দরকার থাকে ত কিসের আছে বলে দিতে পারো ?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, এর জবাব আমি দিতে পারলাম না,

বোম্ব তোমার কাছে আমি হার মানছি। কিন্তু তুমি ছাড়া নিজের পরাধীন আমাকে কোন দিন কোন মেয়েমানুষের কাছেই স্বীকার করতে হয়নি।

ভারতী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, স্মিত্রাদিদির কাছেও না ?

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না।

শয্যা প্রস্তুত হইলে ডাক্তার তাঁহার বৌচকার আসন ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভারতী অদূরে মেঝের উপর বসিয়া ফণকাল অধোমুখে নীরবে থাকিয়া কহিল, যাবার পূর্বে আর একটি কথা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ছোট বোনের অপরাধ মাপ করবে ?

করব।

তবে বল স্মিত্রাদিদি তোমার কে ? কোথায় তাঁকে তুমি পেলে ?

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পরে মুখ হাসিয়া বলিলেন, ও যে আমার কে, এ জবাব সে নিজে না দিলে আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু, যেদিন ওকে চিনতাম না বল্লেও চলে, সে দিন নিজেই আমি জ্ঞী বলে ওর পরিচয় দিয়েছিলাম। স্মিত্রা নাম আমারই দেওয়া,—আজ সেইটেই বোধ করি ওর নজির।

ভারতী গভীর কৌতুহলে স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, শুনেচি, ওর মা ছিল নাকি ইহুদি মেয়ে, কিন্তু বাপ ছিলেন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। প্রথমে সার্কাসের দলের সঙ্গে জাভায় যান, পরে স্বরভাষা রেলওয়ায়ে ষ্টেশনে চাকরি করতেন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন স্মিত্রা মিশনারিদের ইকুলে লেখাপড়া শিখতো, তিনি মারা যাবার পরে বছর পাঁচ ছয়ের ইতিহাস আর তোমার শুনে কাজ নেই।

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, না দাদা সে হবে না, তুমি সমস্ত বল।

ডাক্তার কহিলেন, আমিও সমস্ত জানিনে ভারতী, শুধু এইটুকু

জানি যে মা, মেয়ে, দুই মামা, একটি চীনে, এবং জন কই মাদ্রাসী মুসলমানে মিলে এঁরা জাহায লুকানো আফিও গাঁজা বাবসা করতেন। তখনও কিছুই জানিনে কি করে, শুধু দেখতে পেতাম বাটাভিয়া থেকে সুরভায়ার পথে রেল গাড়ীতে সুমিত্রাকে প্রাইভেট আসা করতে। অতিশয় সস্ত্রী বলে অনেকের মত আমারও দৃষ্টি পড়েছিল। এই পর্যন্তই। কিন্তু, হঠাৎ একদিন পরিচয় হয়ে গেল তেগে স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে। বাঙ্গালীর মেয়ে বলে তখনই কেবল প্রথম খবর পেলাম।

ভারতী বলিল, হৃন্দরী বলে আর সুমিত্রাদিদিকে ভুলতে পারলে না, —না দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, সে বাই হোক একদিন জাভা ছেড়ে কোথায় চলে গেলাম ভারতী,—বোধ হয় ভুলেও গিয়েছিলাম,—কিন্তু খানেক পরে অকস্মাৎ বেঙ্কুলান সহরের জেঠিতে দেখা সাক্ষাৎ। এক জোরদার আফিও, চারিদিকে পুলিশ, আর তার নামে সুমিত্রা। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে তার জল পড়তে লাগলো, এ সন্দেহ আর বহিল না যে আমাকে তাকে বাঁচাতেই হবে। আফিওর সিন্দুকটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে একেবারে স্ত্রী বলে তার পরিচয় দিলাম। এতটা সে ভাবেনি, সুমিত্রা চমকে গেল। সুমিত্রার ঘটনা বলে সুমিত্রা নাটকটাও আমারই দেওয়া। নইলে, তার সাবেক নাম ছিল, রোজ দাউদ। তার বেঙ্কুলানের মামলা-মকদ্দমা পাদাও সহরে হোতো, আমার এ পুরম বন্ধু ছিলেন পল ক্রুগার, তাঁর বাড়ীতে সুমিত্রাকে নিয়ে। মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সুমিত্রাকে খালাস দিলেন বটে, কিন্তু, সুমিত্রা আর আমাকে খালাস দিতে চাইলে না।

ভারতী হাসিয়া কহিল, খালাস কোন দিন পাবেওনা দাদা।

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ তাঁদের দলের লোক খবর পেয়ে

ঊষা—কি মারতে লাগলো, বন্ধু জুগারও দেখতে পেলাম সৌন্দর্যে চকল হয়ে উঠেছেন, খতএব তাঁর জিম্মাতে রেখেই একদিন চুপি চুপি স্ত্রীমাত্রা ছেড়ে সরে পড়লাম।

ভারতী আশ্চর্য হইয়া বলিল, এদের মাঝে তাঁকে একলা ফেলে রেখে? উঃ—তুমি কি নিষ্ঠুর দাদা!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ অনেকটা অপূর্বের মত। আবার বছরখানেক কেটে গেল। তখন সেলিবিস দ্বীপে ম্যাকেসার সহরে একটি ছোট্ট অপন্নত হোটেলে বাস করছিলাম, একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে ঢুকে দেখি স্ত্রীমাত্রা বসে। তার পরণে হিন্দু মেয়েদের মত ভসরের শাড়ী, আর এই প্রথম আজ আমাকে সে হিন্দু মেয়ের মতই হেঁট হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি সমস্ত ছেড়ে চলে এসেছি, সমস্ত অতীত মুছে ফেলে দিয়েছি, আমাকে তোমার কাজে ভক্তি করে নাও, আমার চেয়ে বিশ্বস্ত অতুচ্চ তুমি আর পাবে না।

ভারতী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, তার পরে?

ডাক্তার কহিলেন, পরের ঘটনা শুধু এইটুকুই বলতে পারি, ভারতী, স্ত্রীমাত্রার বিকঙ্কে নালিশ করবার আমি আজও কোন হেতু পাইনি। সে একুশ বছরের সমস্ত সংস্কার একদিনে মুছে ফেলে আসতে পারে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু, বড় নিষ্ঠুর।

ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কেবলই ইচ্ছা করিতে লাগিল জিজ্ঞাসা করে, হোক নিষ্ঠুর, কিন্তু, তাকে তুমি কতখানি ভালবাসো? কিন্তু, লজ্জায় এ কথা সে কিছুতেই মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না। অথচ ওই আশ্চর্য্য রমণীর গোপন অন্তরের অনেক ইতিহাসেরই আজ সে সন্ধান পাইল। তাহার নিঃশ্বাস মৌনতা, কষ্টময়, উদাসীন—কিছুই অর্থ বৃদ্ধিতে যেন আর তাহার বাকি রহিল না।

হঠাৎ একটা অতকিত দীর্ঘশ্বাস ডাক্তারের মুখ দিয়া বাহির হইয়া

পথের দাবী.

২৩২

পড়ায় মুহূর্তকালের জন্ত যেন তিনি সজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু, ওই মুহূর্তের জন্তই। সুদীর্ঘ সাধনায় দেহ ও মনের প্রকৃতি দুটি উপরেই অসামান্য অধিকার এতদিন তিনি বুঝায় অর্জন করেন নাই। পরক্ষণেই তাঁহার শান্ত কণ্ঠ ও সহজ হাস্যমুখ ফিরিয়া আসিল, বলিলেন, তারপরে স্মিত্রাকে নিয়ে আমাকে ক্যান্টনে চলে আসতে হ'ল।

ভারতী হাসি গোপন করিয়া ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, চলে নাই আসতে দাদা, কে তোমাকে মাথার দিবি দিগেছিল বল? আমরা ত কেউ দিইনি!

ডাক্তার হাসিমুখে ক্ষণকাল নীরব হইয়া থাকিয়া বলিলেন, মাথার দিবি যে ছিল না তা' নয়, কিন্তু, ভেবেছিলাম সে-কথা আর কেউ জান্বে না, কিন্তু, তোমাদের দোষ এই যে শেষ পর্যন্ত না শুনলে আর কৌতুহল মেটে না। আবার না বললে এমন সব কথা অনুমান করিতে থাক্বে যে তার চেয়ে বরঞ্চ বনাই ভাল।

ভারতী কহিল, আমিও ত তাই বল্ছি দাদা, ঐটুকু ভুলি বলে ফেল।

ডাক্তার কহিলেন, ব্যাপারটা এই যে স্মিত্রা আমার হোটেলেই একটা দোতলার ঘর ভাড়া নিলে। আমি অনেক নিষেধ করলাম, কিন্তু, কিছুতেই শুনলে না। যখন বললাম, আমাকে তাহলে অগ্রত্ন যেতে হবে, তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। বল্লে, আমাকে আপনি আশ্রয় দিন। পরদিনই ব্যাপারটা বোঝা গেল। সেই দাউদে দল দেখা দিলেন। জম দশেক লোক, একজন অন্ধক আর্বুবি আ' ফ নিগ্রো, ছোটখাটো একটা হাতীর মত, অন্যায়সে স্মিত্রাকে গ্ৰী বলে দাবী করে বস্লে।

ভারতী কহিল, আবার তোমারই সাংসাতে! তোমাদের দুজনের বোধ করি খুব বাগড়া বেধে গেল?

তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ। সুমিত্রা অস্বীকার করে বাববাব কিস্তিতে লাগলো সমস্ত মিথ্যা, সমস্তই একটা প্রকাণ্ড বড়বড়! অর্থাৎ, তারা তাকে চোরাই আফিও বেচার কাজে ফিরিয়ে নিতে যেতে চায়। প্রশান্ত মহাসাগরে সমস্ত দ্বীপগুলোতেই এদের ঘাঁটি আছে,— এদের একটা প্রকাণ্ড ছব্বত্তের দল। এরা না পারে এমন কাজ নেই। বুঝলাম সুমিত্রা কেন আমার কাছ থেকে যেতে চায়নি, এবং তার চেয়েও বেশি বুঝলাম যে এ সমস্তার সহজে মীমাংসা হবে না। তাদের কিস্তি বিলম্ব সয়না, সমস্তই একটা রফা করে সুমিত্রাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। বাধা দিলাম, পুলিশ ডেকে দরিয়ে দেব ভয় দেখালাম, তারা চলে গেল, কিন্তু রীতিমত শাসিয়ে গেল যে তাদের হাত থেকে আজও কেউ নিস্তার পায়নি। কথাটা নেহাৎ তারা মিথ্যা বলে বায়নি।

ভারতী শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, তারপরে ?

ডাক্তার কহিলেন, রাত্রিটা সাবদান হয়ে রইলাম। তারা যে সদল-বলে ফিরে এসে আক্রমণ করবে, তা জান্তাম।

ভারতী বাগ্র হইয়া কহিল, তখন তোমরা পালিয়ে গেলে না কেন ? পুলিশে খবর দিলে না কেন ? ডচ্ গবর্ণমেণ্টের পুলিশ-পাহারা বলে কি কিছু নেই না কি ?

ডাক্তার কহিলেন, না থাকার মধ্যেই। তা ছাড়া থানা-পুলিশ করা আমার নিজেরও খুব নিরাপদ নয়। যাই হোক, রাত্রিটা কিন্তু নিরাপদেই কাটিলো। এখানে সমুদ্রের কিনারা বয়ে বাবার অনেক বাবসা-বাণিজ্যের নৌকা পাওয়া যায়, পরদিন সকালেই একটা ঠিক করে এলাম, কিন্তু সুমিত্রার হল অর,—সে উঠতে পারলে না। অনেক রাত্রে দোর খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, জানালা দিয়ে উকি হেন্দে দেখলাম হোটেল-ওয়াল কপাট খুলে দিয়েছে, এবং জন দশ বারো লোক বাড়ীতে ঢুক্চে। তাদের ইচ্ছে ছিল আমার দরজাটা কোনমতে

আটকে রেখে তারা পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে হুমিত্রার ঘর গিয়ে ঢোকে।

ভারতী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তা'পরে? তোমরা পালালে কোথা দিয়ে?

ডাক্তার বলিলেন, তার আর সময় হল কই; কিন্তু তাদের আগেই আমি দোর খুলে উপরে যাবার সিঁড়িটা আটকে ফেললাম।

ভারতী পাশ্চাত্যে জিজ্ঞাসা করিল, একলা? তারপরে?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরের ঘটনাটা অন্ধকারে ঘটলো, সঠিক বিবরণ দিতে পারব না। তবে নিজেদের জানি। একটা গুলি এসে বাঁ কাঁধে বিঁধলো, আর একটা লাগলো ঠিক হাঁটুর নীচে। সকাল হলে পুলিশ এলো, পাহারা এলো, গাড়ী এলো, ডুলি এলো, জন ছয়েক লোককে তুলে নিয়ে গেল,—হোটেল-ওয়ালো এজাহার দিলে ডাকাত পড়েছিল। ইংরাজ রাজত্ব হলে কতদূর কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু সেলিবিসের আইন-কানুন বোধ হয় আলাদা, লোকগুলোর নিশান-দিহি যখন হল না, তখন পুঁতে টুঁতে ফেললে বোধ হয়।

বিবরণ শুনিয়া ভয়ে ও বিশ্বয়ে ক্ষণকাল ভারতীর বাক্যবোধ হইয়া রহিল, পরে শুধু বিবর্ণ মুখে অশ্রুটকণ্ঠে কহিল, পুঁতে টুঁতে ফেললে কি? তোমার হাতে কি তবে এতগুলো মানুষ মারা গেল নাকি?

ডাক্তার কহিলেন, আমি উপলক্ষ মাত্র। নইলে নিজেদের হাতেই তারা মারা গেল ধরতে হবে।

আর ভারতী কথা কহিল না, শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া বসিয়া রহিল। ডাক্তার নিজেও কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, তারপরে কতক নৌকোয় কতক ঘোড়ার গাড়ীতে কতক গিমাংরে মিনাডো সহরে এসে পৌঁছলাম, এবং সেখান থেকে নাম ধাম ভাড়িয়ে একটা চীনা জাহাজে চড়ে কোন মতে দুজনে ক্যান্টনে এসে উপস্থিত

হয় না? কিন্তু আর বোধ হয় তোমা শুনতে ইচ্ছে করচে না? ঠিক নাকি ভারতী? কেবলি মনে হচ্চে দাদার হাতেও মানুষের রক্ত মাখানো?

অত্মমনস্ক ভারতী তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবেনা দাদা?

এখনি যাবে?

হাঁ, আমাকে তুমি দিয়ে এসো।

-তবে চল। এই বলিয়া তিনি মেঝের একখানা তক্তা সরাইয়া কি একটা বস্ত্র লুকাইয়া পকেটে লইলেন। ভারতী বুঝিল তাহা গাদা পিস্তল। পিস্তল তাহারও আছে, এবং স্ফুমিত্রার উপদেশ মত সে-ও ইতিপূর্বে গোপনে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়াছে, কিন্তু, ইহা যে মানুষ মারিবার যন্ত্র, এ চৈতন্য আজ যেন তাহার প্রথম হইল। আর ঐ যেটা ভাঙারের পকেটে রহিল, হয়ত, কত নরহত্যা ই উহা করিয়াছে এই কথা মনে করিয়া তাহার দর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নৌকায় উঠিয়া ভারতী ধীরে ধীরে বলিল, তুমি যাই কেননা কর, তুমি ছাড়া আমার আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় আশ্রয় নেই। যতদিন না আমার মন ভাল হয় আমাকে তুমি ফেলে যেতে পারবে না দাদা। বল যাব না।

ভাস্কর মুহূ হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা তাই হবে বোন, তোমার কাছে ছুটি নিয়মই আমি যাবো।

(২৪)

নদীপথের সমস্তক্ষণ ভারতীর মন কত-কি ভাবনাই যে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দেশ নাই। অধিকাংশই এলো-মেলো,—শুধু যে চিন্তাটা মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাকে সব চেয়ে বেশি ধাক্কা দিয়া গেল সে স্ফুমিত্রার ইতিবৃত্ত। তাহার প্রথম যৌবনের দুর্ভাগ্যময় অপরূপ

কাহিনী। স্মিত্রাকে বন্ধু বলিয়া ভাবিবার দুঃসাহস কোন মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়, তাহাকে ভালবাসিতে ভারতী পারে নাই, কিন্তু সর্ব বিষয়ে তাহার অসাধারণ শ্রেষ্ঠতার জন্ত হৃদয়ের গভীর ভক্তি তাহাকে অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন যত অপরাধই অপূর্ণ করিয়া থাক, নারী হইয়া অবলীলাক্রমে তাহাকে হত্যা করার আদেশ দেওয়ায় ভক্তি তাহার অপরিণীত ভয়ে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল,—বলির পশু রক্ত-মাথা খজোর সম্মুখে খেমন করিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে,—তেমনি। অপূর্ণকে ভারতী যে কত ভালবাসিত স্মিত্রার তাহা অপরিণীত ছিল না, ভালবাসা যে কি বস্তু সেও তাহার অবদিত নয়, তথাপি আর একজনের প্রাণাধিকার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে নারী হইয়া নারীর তিলাঙ্ক বাধে নাই। বেদনার আগুনে বুকের ভিতরটা যখন তাহার এমনি করিয়া ছু ছু করিয়া জ্বলিতে থাকিত, তখন সে আপনাকে আপনি এই বলিয়া বুকাইত যে কর্তব্যের প্রতি এতবড় নিশ্চয় নিষ্ঠা না থাকিলে পথের-দাবীর কতী করিত তাহাকে কে? যাহাদের নিজের জীবনের মূল্য নাই, রাজদ্বারে রাজার আইনে যে-সকল প্রাণ বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে তাহারা নির্ভর করিত তবে কিসে? তাহার জ্ঞান, তাহার শিক্ষা, তাহার কৈশোর ও যৌবনের বিচিত্র ইতিহাস, তাহার আসক্তির অনতিবর্তনীয় দৃঢ় সংসক্তি, তাহার কর্তব্যবোধ, তাহার পায়ণ জন্ম সকলের সনেই আজ ভারতী সঙ্গতি দেখিতে লাগিল। নারী বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড অভিমান ভারতীর ছিল, আজ সে গেল আপনা আপনিই একেবারে বাতুল্য হইয়া গেল। আর তাহাকে নিজের স্বজাতি বলিয়া ভাবিতেই পারিল না। আজ তাহার মনে হইল, স্নেহের দিক দিয়া, করুণার দিক দিয়া স্মিত্রার কাছে দাবী করিবার, ভিক্ষা জানাইবার মত পরিহাস পৃথিবীতে যেন আর দ্বিতীয় নাই।

নৌকাঘাটে আসিয়া লাগিতেই একজন গাছের আড়াল হইতে হাতির হইরা আসিল। ডাক্তারের হাত ধরিয়া ভারতী নীচের সিঁড়িতে পা দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ লোকটার প্রতি চোখ পড়িতেই সে সভয়ে পা তুলিয়া লইল।

ডাক্তার মুহূর্ত্তে কহিলেন, ও আমাদের হীরা সিং তোমাকে পৌছে দেবার জন্তে দাঁড়িয়ে আছে। কেয়া সিংজী খবর সব ভালো ?

হীরা সিং বলিল, সব আছা।

আমিও যেতে পারি নাকি ?

হীরা কহিল, আপ্‌কো কহি যানা ছুনিয়ামে কোই রোক সক্তা ? এই বলিয়া সে একটু হাসিল।

বুঝা গেল পুলিশের লোক ভারতীর বাসার প্রতি নজর রাখিয়াছে, ডাক্তারের যাওয়া নিরাপদ নয়।

ভারতী হাত ছাড়িলনা, চুপি চুপি কহিল, আমি যাবোনা দাদা।

কিন্তু তোমার ত পালিয়ে থাকবার দরকার নেই ভারতী।

ভারতী তেমনি আস্তে আস্তে বলিল, দরকার থাকলেও আমি পালাতে পারবোনা। কিন্তু এর সঙ্গে যাবো না।

ডাক্তার আপত্তির কারণ বুঝিলেন। অপূর্ব্ব বিচারের দিন এই হীরা সিংই তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, কিন্তু তুমিত জানো ভারতী পাড়াটা কত খারাপ, এত রাত্রে একলা যাওয়া ত তোমার চলে না। আর আমি যে—

ভারতী ব্যাকুলকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না দাদা, তুমি আমাকে পৌছে দেবে, আমি ত এখনও পাগল হইনি যে—

এই বলিয়া সে অসম্পূর্ণ কথা মারখানাই খামিয়া গেল। কিন্তু, এতরাত্রে ও পাড়ায় একাকী যাওয়াও যে অসম্ভব, এ সত্যই বা তাহার চেয়ে বেশি কে জানিত ? হাত ছাড়িয়া নৌকা হইতে নামিবার

কিছুমাত্র লক্ষণ না দেখিয়া ডাক্তার স্নেহাৰ্দ্দস্বরে আস্তে আস্তে বলিলেন, আমার ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোমাকে আমার নিশ্চয়ই লজ্জা করে। কিন্তু যাবে দিদি আর এক জায়গায়? আমাদের কবির ওখানে? সে নদীর তীর আর পারেই থাকে। যাবে?

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কবি কে দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, আমাদের ওস্তাদজী, বেহালা-বাজিয়ে,—

ভারতী খুসি হইয়া কহিল, তাঁকে কি ঘরে পাওয়া যাবে? আর মদ জুটে থাকে ত অজ্ঞান হয়েই হয়ত আছেন।

ডাক্তার কহিলেন, আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু আমার গলা শুনেই তার নেশা কেটে যায়। তা ছাড়া কাছেই নবতারা থাকেন—হয়ত তোমাকে দুটো খাইয়ে দিতেও পারুব।

ভারতী ব্যস্ত হইয়া বলিল, রক্ষা কর দাদা, এই শেষ রাত্তিরে আর আমাকে খাওয়ারবার চেষ্টা কোরো না, কিন্তু তাই চল যাই, সকাল হলেই আমরা ফিরে আসবো।

ডাক্তার পুনরায় নৌকা ভাসাইয়া দিলে হীরা সিং অন্ধকারে পুনরায় যেন মিলাইয়া গেল। ভারতী কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, দাদা, এই লোকটিকে পুলিশে এখনও সন্দেহ করেনি?

ডাক্তার কহিলেন, না। ও টেলিগ্রাফ আফিসের পিয়ন, মানুষের জরুরি তার বিলি করে বেড়ায়, তাই ওকে দিনরাত্রির কোন সময়ে কোনখানেই বে-মানান দেখায়না।

সেইমাত্র জোয়ার স্রুজ হইয়াছে, খাঁড়ি হইতে বাহির হইয়া বড় নদীতে কতকটা উজাইয়া না গেলে ও-পারের যথাস্থানে নৌকা ভিড়ানো শক্ত, এইজন্ত কিনারা ঘেসিয়া দীঘে দীঘে অভ্যস্ত সাবধানে লগি ঠেলিয়া যাওয়ার পরিশ্রম অনুভব করিয়া ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, থাক্গে, কাজ নেই দাদা আমাদের ওখানে গিয়ে। তার চেয়ে বরঞ্চ

ল, তোমার বাড়ীতেই ফিরে যাই। জোয়ারের টানে আধঘণ্টাও থাকবে না।

ডাক্তার কহিলেন, কেবল সেজ্ঞা নয়, ভারতী, ওর সঙ্গে দেখা হ্রাও আমার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রত্যুত্তরে ভারতী উপহাসভরে হাসিয়া বলিল, ওঁর সঙ্গে কোন মানুষের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে এ তো আমার সহজে বিশ্বাস হয় না, দাদা।

ডাক্তার ফণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা কেউ একে জানো না, ভারতী, ওর মত সত্যকার গুণী সহসা কোথাও তুমি পাবে না। ওই ভাড়া বেহালাটি মাত্র পূজি করে ও যায়নি এমন জায়গা নেই। তা'ছাড়া ও ভারি পণ্ডিত। কোথায় কোন্ বইয়ে কি আছে ও ছাড়া জেনে নেবার আমার আর দ্বিতীয় লোক নেই। একে আমি যথার্থ ভালবাসি।

ভারতী মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া কহিল, তা'হলে ওঁকে তুমি মদ ছাড়াবার চেষ্টা করোনা কেন ?

ডাক্তার কহিলেন, আমি কাউকে কোন কিছু ছাড়াবারই ত চেষ্টা করিনে ভারতী। একটুখানি চূপ করিয়া বলিলেন, তা'ছাড়া ও কবি, ও গুণী, ওদের জাত আলাদা। ওদের ভাল-মন্দ ঠিক আমাদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ার ভাল-মন্দের বাধা আইন ওকে মাপ করে চলে না। ওর গুণের ফল তারা সবাই মিলে ভোগ করে, শুধু দোষের শাস্তিটুকু সহ্য করে ও নিজে। তাই মাঝে মাঝে ও বেচারা যখন ভারি দুঃখ পায়, তখন, আর একটি লোক যে মনে মনে তার অংশ নেয়, সে আমি।

ভারতী কহিল, তুমি সকলের জন্তেই দুঃখ বোধ কর দাদা, তোমার মন মেয়েদের চেয়েও কোমল। কিন্তু, তোমার গুণীকে তুমি বিশ্বাস

কর কি করে? উনি মাতাল হয়ে ত সমস্তই বলে ফেলতে পারেন।

ডাক্তার কহিলেন, ওই জানটুকুই ওর বাকি থাকে। আর একটা সুবিধা এই যে, ওর কথায় বিশেষ কেউ বিশ্বাসও করেনা।

ভারতী কহিল, ওঁর নাম কি দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, অতুল, সুরেন, দীরেন,—যখন যা নাম আসে। আসল নাম শশিপদ ভৌমিক।

আমার মনে হয় উনি নবতারার বড় বাপা।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন, বলিলেন, আমারও মনে হয়। এই বলিয়া তিনি পরপারের জগু নৌকার মুখ ফিরাইলেন। জোড় ও দাঁড়ের প্রবল আকর্ষণে ক্ষুদ্র তরঙ্গী অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, এবং দেখিতে দেখিতে এপারে আসিয়া ঠেকিল। চারিদিকেই সাহেব কোম্পানীর বড় বড় কাঠের মাড় সুপাকার করা, তাহারই কাঁকে কাঁকে জোয়ারের জল ঢুকিয়া দূরবর্তী জাহাজের তীব্র আলোকে বিক বিক করিতেছে, ইহারই একটা কাঁকের মধ্যে ডিঙ্গি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া ডাক্তার ভারতীর হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িলেন। বিচ্ছিন্ন কাঠের উপর দিয়া সাবধানে পা টিপিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা মজীর্ণ পথ পাওয়া গেল, আশে পাশে ছোট বড় ডোবা, লতা গুল্ম কাঁটাগাছে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহারই একদা দিয়া এই অন্ধকার বনের মধ্যে যে কোথায় গিয়াছে তাহার নির্দেশ নাই। ভারতী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, ও-পারের এমনি, একটা ভয়ঙ্কর স্থান থেকে আর একটা তেমনি ভয়ঙ্কর জায়গায় নিয়ে এলে। বাবু ভালুকের মত এ ছাড়া কি তোমরা আর কোথাও থাকতে জানোনা? আর কিছু ভয় না কর সাপের ভয়টা ত করতে হয়?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, সাপ বিলাত থেকে আসেনি দিদি, তাদের ধর্মজান আছে, বিনা অপরাধে কামড়ায় না।

মন্তব্য শুনিয়া ভারতীর আর এক দিনের কথা মনে পড়িল। সেদিনও তাঁহার এমনি সহাস্ত কণ্ঠস্বরে ইউরোপের বিক্রেতা কি অপরিদ্রীম ঘণাই প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আর বাঘ-ভালুক বোন? কতদিনই ভাবি, এই ভারতবর্ষে মানুষ না থেকে যদি কেবল বাঘ-ভালুকই থাকতো! হয়ত, বিদেশ থেকে শীকার করতে এরা আসতো, কিন্তু এমন অহিনিশি রক্তশোষণের জন্ত কামড়ে পড়ে থাকতনা।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। সমস্ত জাতি-নিবিশেষে কাহারও এতখানি বিদেষ তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত। বিশেষ করিয়া এই মাহুঘটির এতবড় বিশাল বক্ষতল হইতে যখন গরল উছলিয়া উঠিত, তখন দুই চক্ষু তাহার জলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। নিজের মনে প্রাণপণে বলিতে থাকিত, ইহা কখনও সত্য নয়, কিছুতে সত্য নয়। এমন হইতেই পারে না।

কিছুকণ হইতে একটা অপূর্ব স্বপ্নর মাঝে মাঝে আনিয়া তাহাদের কানে লাগিত ছিল, সহসা খমকিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার বলিলেন, ওস্তাদজী আমাদের সঙ্গে আছেন এবং সজ্জানে আছেন,—এমন বেহালা তুমি কখনো শোননি ভারতী।

আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ভারতী স্তব্ধ হইয়া থাকিল। কোথায় কোন্ অন্ধকারের বুক চিরিয়া কত কারাই যেন ভাসিয়া আসিতেছে। তাহার আদি অন্ত নাই, এ সংসারে তাহার তুলনা হয় না। মিনিট দুয়ের জন্ত ভারতীর যেন সংজ্ঞা রহিল না। ডাক্তার তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া কহিলেন, চল।

ভারতী চকিত হইয়া কহিল, চল। আমি কখনো এমন ভাবিনি, কখনো এমন শুনিনি।

ডাক্তার আস্তে আস্তে বলিলেন, পৃথিবীতে আমার অগম্য ত স্থান নেই, এর চেয়ে ভাল আমিও কখনো শুনেচি মনে হয় না। একটু হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু পাগ্লার হাতে পড়ে ঐ বেহালা বেচারার জুড়িশার অবধি নেই। আমিই বোধ হয় ওকে দশবার উদ্ধার করে দিয়েচি। এখনো শুনেচি অপূর্বের কাছে পাঁচ টাকায় বাধা আছে।

ভারতী কহিল, আছে। ওর নাম করে টাকাটা আমি তাঁকে পাঠিয়ে দেব।

গাছ-পালার আড়ালে একখানা দোতারা কাঠের বাড়ী। এক-তলাটা পাক, ছোয়ারের জল এবং দে'না গাছে দখল করিয়াছে, অমুখে একটা কাঠের সিঁড়ি এবং তাহারই নিকট ধাপে একটা তোরণের মত করিয়া তাহাতে মস্ত বড় একটা রঙ্গীন চীনা লণ্ঠন ঝুলিতেছে। ভিতরের আলোকে স্পষ্ট পড়া গেল তাহার গায়ে বড় বড় কালো অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা,—শশি-তারার লজ্জা।

ভারতী বলিল, বাড়ীর নাম রাখা হয়েছে শশি-তারার লজ্জা ? লজ্জা তো বুঝলাম, শশি-তারার কি ?

ডাক্তার মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, বোধ হয় শশিপদর শশী এবং নবতারার তারার এক করে শশি-তারার লজ্জা হয়েছে।

ভারতীর মুখ গুণ্ডীর হইল, কহিল, এ ভারি অদ্ভুত। এ সব তুমি প্রশয় দাও কি করে ?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, তোমার দাদাটিকে তুমি কি সর্বশক্তিমান মনে কর ? কে কার লজ্জের নাম শশি-তারার রাখবে, কে কার প্যালেসের নাম অপূর্ব-ভারতী রাখবে, সে আমি ঠেকাব কি করে ?

ভারতী রাগ করিয়া বলিল, না দাদা, এ সব নোঙরা কাণ্ড তুমি বারণ করে দাও। নইলে আমি ওর ঘরে যাবো না।

ডাক্তার কহিলেন, শুনেচি ওদের শীঘ্র বিয়ে হবে।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া বলিল, বিয়ে হবে কি করে, ওর যে স্বামী বেঁচে আছে ?

ডাক্তার কহিলেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'লে মবুতে কতক্ষণ দিদি ? শুনেচি বাপটা মরেছে দিন পনের হল।

ভারতী অতিশয় বিরক্তি সঙ্গেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ও হয়ত মিছে কথা। তাছাড়া, এক বছর অন্ততঃ ওদের ত থামতেই হবে, নইলে সে যে ভারি বিশী দেখাবে।

তাহার উৎকর্ষা দেখিয়া ডাক্তার মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, বেশ, বলে দেখবে। তবে, থামলে বিশী দেখাবে কি, না থামলে বিশী দেখাবে সেইটেই চিন্তার কথা।

এই ইঙ্গিতের পরে ভারতী লজ্জায় নীরব হইয়া রহিল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ডাক্তার চাপা গলায় বলিতে লাগিলেন, পাগ্লাটার জন্তই কষ্ট হয়, শুনেচি ঐ জীলোকটাকে নাকি ও যথার্থই ভালবাসে। আর কাউকে যদি বাসত ! সহসা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু সংসারের ভাল-মন্দের ফরদাস, বন্ধুগণের অভিকচি,—এসব অতি তুচ্ছ কথা ভারতী ! কেবল এইটুকু কামনা করি ওর ভালবাসার মধ্যে সত্য যদি থাকে ত সেই সত্যই যেন শুকে উদ্ধার করে দেয়।

ভারতী চমকিয়া উঠিল ! এবং তেমনি চাপাকণ্ঠেই সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, সংসারে তা কি হয় দাদা ?

ডাক্তার অন্ধকারেই একবার মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। তাহার পরে নিশ্কেপদে উঠিয়া গুণীর বন্ধ দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ডাক শুনিয়া বেগলা থামিল। থানিক পরে ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া শশিপদ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারকে সে সহজেই চিনিল, কিন্তু আবারে ঠাহর করিয়া ভারতীকে চিনিতে পারিয়া একেবারে নাকাইয়া উঠিল,—আ্যা আপনি ? ভারতী ? আহ্নন, আহ্নন

আমার ঘরে আসুন। এই বলিয়া সে দুই হাত ধরিয়া তাকে ভিতরে লইয়া গেল। তাহার আনন্দদীপ্ত মুখের অকপট আবেগনে, তাহার অকৃত্রিম উচ্ছ্বসিত সমাদরে ভারতীর সমস্ত ক্রোধ জন খসিয়া গেল। শশী বিছানার কোন এক নিভৃত স্থান হইতে বড় একটা খাম বাহির করিয়া ভারতীর হাতে দিয়া কহিল, খুলে পড়ুন। পরশু দেশ হাজার টাকার ড্রাফট আস্ছে—নট এ পাই লেস্! বল্‌তাম না? আমি জোচ্চর! আমি মিথ্যাবাদী! আমি মাতাল! কেমন হল ত? দশ হাজার! নট এ পাই লেস্!

এই দশ হাজার টাকার ড্রাফট সম্বন্ধে একটা পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা প্রয়োজন। তাহার বন্ধু-বান্ধব, শত্রু-মিত্র, পতি-পিতৃ-স্বপরিচিত এমন কেহ ছিলনা যে অচির ভবিষ্যতে একটা মোটা টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা শশীর মুখ হইতে শুনে নাট। কেহ বড় বিশ্বাস করিত না, বরঞ্চ ঠাট্টা তামাসাই করিত, কিন্তু ইহাই ছিল ওস্তাদজীর মূলধন। ইহারই উল্লেখ করিয়া সে একান্ত অসবোঝে লোকের কাছে ধার চাহিত। এবং শীঘ্রই একদিন স্বদে-আসলে পরিশোধ করিয়া দিবে তাহা শপথ করিয়া বলিত। এই অত্যন্ত অনিশ্চিত অর্থাগমের উপর তাহার কত আশা ভরসাই না জড়াইয়া ছিল! বছর পাঁচ সাত পূর্বে তাহার বিস্ত্রশালী মাতামহ যখন মারা যান তখন সে মাসতূত ভাগ্যেদের সঙ্গে সম্পত্তির একটা অংশ পাইয়াছিল। এতদিন এইটাই তাহাদের কাছে বিক্রী করিবার কথাবার্তা চলিতেছিল। মাসখানেক পূর্বে তাহা শেষ হইয়াছে। খামের মধ্যে কলিকাতার এক বড় এটপির চিঠি ছিল, টাকাকাটা দুই এক দিনেই পাওয়া যাইবে তিনি লিখিয়া ছানাই দাধেন।

ভারতী চিঠি পড়িয়া শেষ করিলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ হাজার টাকার না কথা ছিল, শশী?

শশী হাত নাড়িয়া বলিল, আহা, দশ হাজার টাকাই কি সোজা নাকি ? তাছাড়া নিজের মাস্তুত ভাই,—সম্পত্তি ত একরকম আপনার ঘরেই রইল, ডাক্তারবাবু, আর ঠিক সেই কথাই ত মেজ্জা লিখে জানিয়েছেন। কি রকম লিখেছেন একবার—এই বলিয়া মেজ্জার চিঠির জ্ঞাত উদ্ভিবার উপক্রম করিতে ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, থাক্ থাক্, মেজ্জার চিঠির জ্ঞাতে আমাদের কৌতূহল নেই। ভারতীকে বলিলেন, এই রকম একটা স্ফাপা মাস্তুত ভাই আমাদের থাকলে—এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

শশী খুসি হইল না, সে প্রাণপণে প্রমাণ করিতে লাগিল যে, সম্পত্তিটা একপ্রকার বিক্রী না করিয়াই এতগুলো টাকা পাওয়া গেল, এবং সে কেবল তাহার মেজ্জার মত আদর্শ পুরুষ সংসারে ছিল বলিয়া।

ভারতী মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, সে ঠিক কথা অতুলবাবু, মেজ্জাকে না দেখেই তাঁর দেবচরিত্র আমার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। ও আর সপ্রমাণ করবার প্রয়োজন নেই।

শশী তৎক্ষণাৎ কহিল, কাল কিন্তু আমাকে আর দশটা টাকা দিতে হবে। তাহলে সেদিনের দশ, কালকের দশ আর অপূর্ববাবুর দরুণ সাড়ে আট টাকা,—পুরোপুরি ত্রিশ টাকাই পরিশু তবু দিবে দেব। নিতে হবে, না বলতে পারবেন না কিন্তু।

ভারতী হাসিতে লাগিল। শশী কহিতে লাগিল, ড্রাফ্টটা এলেই ব্যাঙ্কে জমা করে দেব। মাতাল, জোচ্চোর, স্পেসিওথ্রিক্ট যা মুখে এসেছে লোকে বলছে, কিন্তু এবার দেখাবো। আসলে হাত পড়বেনা, কেবল সূদের টাকাতেই সংসার চালিয়ে দেবো, বরঞ্চ বাঁচবে দেখবেন, পোষ্ট অফিসেও একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে,—যেই কিছু বাঁথা চলবে না। চাই কি বছর পাঁচেকের মধ্যে একটা বাড়ী কিনতেও পারবো।

আর কিনতেই ত হবে,—সংসার ঘাড়ে পড়ল কিনা! সহজ নয়ত আজকালকার বাজারে!

ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে মুখ গভীর করিয়া আর এক দিকে চাহিয়া রহিল।

শশী কহিল, মদ ছেড়ে দিয়েছি শুনেচেন বোধ হয়?

ডাক্তার কহিলেন, না।

শশী কহিল, হাঁ একেবারে। নবতারা প্রতিজ্ঞে করিয়ে নিয়েছেন।

এই লইশ উভয়ের আলোচনা দীর্ঘ হইতে পারিত, কিন্তু একজনের সর্বোত্তম প্রশ্নমালায় ও অপরের উৎসাহদীপ্ত উত্তর দানের ঘটায় ভারতী বিপন্ন হইয়া উঠিল। সে কোনটাতেই যোগ দিতে পারিতেছে না দেখিয়া ডাক্তার অগ্র প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আসল কথা পাড়িলেন। কহিলেন, শশী, তুমি ত তা'হলে এখান থেকে আর শীঘ্র নড়তে পারচনা।

শশী বলিল, নড়া? অসম্ভব।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, আমাদের তা'হলে এখানে একটা স্থায়ী আড্ডা রইল।

শশী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, সে কি করে হতে পারে? আপনাদের সঙ্গে ত আর আমি সম্বন্ধ রাখতে পারবনা। লাইক্ আমার রিক্স করা যায় না।

ডাক্তার ভারতীকে লক্ষ করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, আমাদের ওস্তাদের আর যা দোষই থাক, চক্ষুলাজ্জা আছে এ অপবাদ আতবড় শত্রুতেও দেবেনা। পারো যদি এই বিচ্ছেটা গর কাছে শিখে নাও ভারতী।

প্রত্যুত্তরে শশীর পক্ষ লইয়া ভারতী অত্যন্ত ভালমাহুষের মত বলিল, কিন্তু মিথ্যে আশা দেওয়ার চেয়ে স্পষ্ট বলাই ত ভাল। আমি

পারিনে, কিন্তু অভুলবাবুর কাছে এ বিত্তে শিখে নিতে পারলে আজ ত আমার ছুটি হয়ে যেতো দাদা।

তাহার কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটা হঠাৎ যেন কেমন ভারি হইয়া গেল। শশী মনোনিবেশ করিলনা, করিলেও হয়ত তাৎপর্য বোধ করিতনা, কিন্তু ইহার নিহিত অর্থ তাহার বুঝিবার তাহার বিলম্ব হইল না।

মিনিট দুই সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন। প্রথমে কথা कहিলেন ডাক্তার, বলিলেন, শশি, দিন দুয়ের মধ্যে আমি যাচ্ছি। ইঁটা পথে চীনের মধ্যে দিয়ে প্যাসিফিকের সব আইল্যান্ডগুলোই আর একবার ঘুরব। বোধ হয় জাপান থেকে অ্যামেরিকাতেও যাবো। কবে ফিরবো জানিনে, ফিরবই কিনা তাই বা কে জানে,—কিন্তু, হঠাৎ যদি কখনো ফিরি শশি, তোমার বাড়ীতে বোধ হয় আমার স্থান হবে না ?

শশী ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি মিনিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে তাহার নিজের মুখ ও কণ্ঠস্বর আশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হবে। আমার বাড়ীতে আপনার স্থান চিরকাল হবে।

ডাক্তার কৌতুকভরে कहিলেন, সে কি কথা শশি, আমাকে স্থান দেওয়ার চেয়ে বড় বিপদ মাহুয়ের আর আছে কি ?

শশী মুহূর্ত চিন্তা না করিয়া বলিল, সে জানি, আমার জেল হবে। তা' হোক্গে। এই বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, এমন বন্ধু আর নেই। ১৯১১ সালে জাপানের টোকিও সহরে বোমা ফেলার জন্তে যখন কোটোকুর সমস্ত দলবলের প্রাণদণ্ড হল, ডাক্তার তখন তার খবরের কাগজের ইংলিশ সাব্‌এডিটার। বাসার সন্মুখের দিকটা পুলিশে ঘিরেচে, আমি কাঁদতে লাগলাম, উনি বললেন, মরলে চলবেনা

শশী, আমাদের পালাতে হবে। পিছনের জানালা থেকে দড়ি বেঁধে আমাকে নামিয়ে দিয়ে নিজেও নেমে পড়লেন,—ডাক্তারবাবু, উঃ—মনে আছে আপনার? এই বলিয়া সে বিগত স্মৃতির তাড়নায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আছে বই কি।

শশী কহিল, থাকার ত কথা। কিন্তু অ-কিম সাহায্য না করলে সেবার ভবলীলা আমাদের সঙ্গ হত ডাক্তারবাবু। সাংহাই বোটে আর পা দিতে হতনা। উঃ—ঐ বোটে ব্যাটারদের মত বজ্জাত আর ভু-ভারতে নেই! আমি ত আর সত্যিই আপনাদের বোমার দলে ছিলাম না—বাসায় থাকতাম, বেহালা শেখাতাম। কিন্তু সে কথা কি গুনতো? শয়তান ব্যাটারদের না আছে আইন, না আছে আদালত! ধবুতে পারলেই আমাকে ঠিক জবাই করে ছাড়ত। আজ যে এই কথা কইচি, চলে ফিরে বেড়াচ্ছি সে কেবল গুরই রূপায়। এই বলিয়া সে চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। কহিল, এমন বন্ধু শুনিয়ায় নেই ভারতী, এমন দয়া-মায়াও সংসারে দেখিনি।

ভারতীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, কহিল, তোমার সমস্ত কাহিনী একদিন আমাদের গল্প করে শোনাওনা দাদা। ভগবান তোমাকে এত বুদ্ধি দিয়েছিলেন, শুধু কি এই অমূল্য প্রাণটার দাম বোঝবার বুদ্ধিটুকুই দিতে ভুলে ছিলেন! সেই জাপানীদের দেশেই তুমি আবার যেতে চাও?

শশী কহিল, আমিও ঠিক সেই কথাই বলি ভারতী! বলি, অতবড় স্বার্থপর, লোভী, নীচাশয় জাতির কাছে কোন প্রত্যাশাই করবেন না। তারা কোন দিন আপনাকে কোন সাহায্যই করবে না।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, কোমরে সেই দড়ি বাঁধার ঘটনাও শশী ভুল্লে না, জাপানীদের সে এ জীবনে মাপ করতেও পারলে না। কিন্তু

এই তাদের সমস্তটুকু নয় ভারতী, এতবড় আশ্চর্য্য জাতও পৃথিবীতে আর নেই। শুধু আজকের কথা নয়, প্রথম দৃষ্টিতেই তারা শাদা-চামড়াকে চিনেছিল। আড়াইশ বৎসর আগে যে জাত আইন করতে পেরেছিল, চন্দ্র সূর্য্য যতদিন বিজয়মান থাকবে খৃষ্টান যেন না তাদের রাজ্যে ঢোকে, এবং সে যেন তার চরম শাস্তি ভোগ করে, সে-জাত বাই কেননা করে থাক তারা আমার নমস্কার !

বক্তার দুইচক্ষু এক নিমিষেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ত্রায় জলিয়া উঠিল। সেই বজ্রগর্ভ ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সম্মুখে শশী যেন উদ্ভ্রান্ত হইয়া গেল। সে সভয়ে বারবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, সে ঠিক ! সে ঠিক !

ভারতীর মুখদিয়া কথা বাহির হইল না, তাহার বুকের মধ্যেটা যেন অভূতপূর্ব্ব অব্যক্ত আবেগে থব্ থব্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল আজ এই গভীর নিশীথে, আসন্ন বিদায়ের প্রাক্কালে এক মুহূর্ত্তের জন্ত এই লোকটির সে স্বরূপ দেখিতে পাইল।

ডাক্তার নিজের বক্ষদেশে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, কি বল্ছিলে ভারতী, এর মূল্য বোঝাবার মত বুদ্ধি ভগবান আমাদের দেননি ? মিছে কথা ! শুনবে আমার সমস্ত ইতিহাস ? ক্যান্টনের একটা গুপ্ত-সভার মধ্যে স্থনিষ্ঠাৎ সেন্ আমাকে একবার বলেছিলেন—

ভারতী হঠাৎ ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, কারা যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠ্চে—

ডাক্তার কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, পকেট হইতে বীরে স্বেস্ত্রে পিস্তল বাহির করিয়া কহিলেন, এই অন্ধকারে আমাকে বাঁপতে পারে পৃথিবীতে কেউ নেই। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাহার মুখের উপর উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

কেবল বিচলিত হইলনা শশী। সে মুখ তুলিয়া কহিল, আজ নবহারাণদের একবার আসার কথা ছিল, বোধ হয়—

ডাক্তার হামিয়া ফেলিয়া কহিলেন, বোধ হয় নয়, তিনিই। অত্যন্ত লঘু পদ। কিন্তু, মঙ্গে তাঁর 'দেব'টা আবার কারা?

শশী বলিল, আপনি জানেন না? আমাদের প্রেসিডেন্ট এসেছেন যে। বোধ হয়—

ভারতী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে প্রেসিডেন্ট? সুমিত্রাদিদি?

শশী মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ। এই বলিয়া সে জরতপদ দ্বার খুলিতে অগ্রসর হইল। ভারতী ডাক্তারের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, এতক্ষণে যেন সে তাঁহার এখানে আসিবার হেতু বুঝিয়াছে। আজ রাত্রিটা বুঝায় যাইবেনা, প্রত্যাপন বিক্ষেপের মুখে পথের-দাবীর শেষ মীমাংসা আজ অনিবার্য। হয়ত আইয়ার আছে, তলওয়ারকর আছে, কি জানি হয়ত নিরাপদ বুঝিয়া ব্রজেন্দ্রও সহর ছাড়িয়া আসিয়া এই বনেই আশ্রয় লইয়াছে। ডাক্তার তাঁহার অভ্যাস ও প্রথামত পিস্তল গোপন করিলেন না, সেটা বা হাতে তেমনি ধরাই রহিল। তাঁহার শাস্ত মুখের উপর ভিতরের কোন কথাই পড়া গেল না সত্য, কিন্তু ভারতীর মুখ অধিকতর পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

(২৫)

একে একে ঘরের মধ্যে দাঁহার প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সকা ই সুপরিচিত। ডাক্তার মুখ তুলিয়া কহিলেন, এস। কিন্তু সে মুখের ভাবেই ভারতীর মনে হইল, অন্ততঃ আজিকার জন্ম তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

সুমিত্রার খবর তিনি জানিতেন, কিন্তু ইতিমধ্যে সকলেই যে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া এপারে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে এ সম্বাদ তাঁহার জানা ছিল না। ইহা কিছুতেই আকস্মিক ব্যাপার নহে,

সুতরাং তাহার অজ্ঞাতসারে কোন একটা গুঢ় পরামর্শ যে হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আগন্তকের দল মেঝের উপরে আসিয়া নিশেধে উপবেশন করিলেন, কাহারও আচরণে লেশমাত্র বিস্ময় বা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না; স্পষ্টই বুঝা গেল, ভারতীর সম্বন্ধে না হোক, ডাক্তারের আসার কথা তাহারা যেমন করিয়াই হোক আগে হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন। অপূর্বর ব্যাপার লইয়া দলের মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদ ঘটিবে এ আশঙ্কা ভারতীর ছিল, হয়ত, আজই ইহার একটা কঠিন বুঝ-পড়া হইয়া যাইবে, ইহাই মনে করিয়া ভারতীর বুকের ভিতরটায় যেন কাঁপুনি স্রব হইল।

সুমিত্রার মুখ শুষ্ক এবং বিষন্ন। ভারতীর সহিত সে কথা কহিল না, ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিল না। ব্রজেন্দ্র তাহার গেকুরা বড়ের মস্ত পাগড়ী খুলিয়া হাতের মোটা লাঠিটা চাপা দিয়া পাশে রাখিল, এবং নিজের বিরাট বপু কাঠের দেওয়ালে হেঙ্গান দিয়া আরাম করিয়া বসিল। তাহার গোলাকার চক্ষের হিংস্র দৃষ্টি একবার ভারতীর ও একবার ডাক্তারের মুখের পরে যেন পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রামদাস তলওয়ারকর নীরব ও স্থির, ব্যারিষ্টার কৃষ্ণ আইয়ার সিগারেট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন, এবং সকলের হইতে দূরে গিয়া বসিল নবভারা। কিছুদূর সঞ্চেই যেন তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই, আজ ভারতীকে সে চিনিতেও পারিল না। মুখে কাহারও হাসি নাই, বাক্য নাই, সর্বনাশা বাড়ের পূর্বাহ্নের মত এই নিশীথ সম্মিলন কিয়ৎকালের জন্য একান্ত শুষ্ক হইয়া রহিল।

সে দিনের ভয়ানক রাত্রির মত আজও ভারতী উঠিয়া আসিয়া ডাক্তারের অত্যন্ত সম্মিষ্টে বসিয়া বসিল। ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের সবাইকে ভারতী ভয় করতে সুরু করেছে, শুধু ভয় নেই ওর আমাকে।

এইরূপ মন্তব্যের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, ভারতী ভিন্ন বোধ হয় কেহ দেখিতেও পাইল না যে সুমিত্রা পথের ইজিতে ব্রজেন্দ্রকে নিবেদন করিতেছে। কিন্তু ফল হইল না। হয় সে ইহার অর্থ বুঝিল না, না হয় গ্রাহ্য করিল না। তাহার কবশ ভাড়াগলার স্বরে সকলকে চকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার স্বেচ্ছাচারের আমরা নিন্দা করি এবং তীব্র প্রতিবাদ করি। অপূর্বকে যদি কখনো আমি পাই ত তার—

এই অসম্পূর্ণ পদ ডাক্তার নিজেই পূর্ণ করিয়া বলিলেন, তাঁর প্রাণ নেবে। এই বলিয়া তিনি বিশেষ করিয়া সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সবাই কি এই লোকটিকে সমর্থন কর? সুমিত্রা মুখ নীচু করিয়া রহিল, এবং অগ্নি কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, ভাবে মনে হয় তোমরা সমর্থন কর। এবং ইতিমধ্যে তোমাদের আলোচনাও হয়ে গেছে—

ব্রজেন্দ্র কহিল, হাঁ হয়ে গেছে, এবং এর প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক মনে করি।

ডাক্তার তাহার প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আমিও তাই মনে করি, কিন্তু তার পূর্বে একটা প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, খুব সম্ভব অত্যন্ত জ্বোলের বশেই তোমাদের তা মনে ছিলনা। আহমেদ জুরাণী ছিল আমাদের সমস্ত উত্তর চীনের সেক্রেটারী, তিনি নিভীক, কর্মদক্ষ লোক আমাদের দলে আর ছিলনা। ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করে নেবার মাসখানেক পরেই সে মাঞ্চুরিয়ার কোন্ একটা রেলওয়ে স্টেশনে ধরা পড়ে। সাংহাইয়ে তার ফাঁসি হয়। সুমিত্রা, জুরাণীকে তুমি দেখেছিলে, না?

সুমিত্রা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

ডাক্তার কহিলেন, আমি তখন ছিতায় ভাঙা দল পুনর্গঠনে ব্যস্ত, একটা খবর পর্য্যন্ত পেলাম না যে আমার একখানা হাত ভেঙে গেল। অথচ তার বিপক্ষে আদালতে বিচারের তামাসা যখন পুরোদমে চলছিল তখন রক্ষা করা তাকে একবিন্দু কঠিন ছিলনা। আমাদের অধিকাংশ লোক তখন ঐখানেই বাস করছিল। তবুও, এত বড় দুর্ঘটনা কেন ঘটলো জানো? ফয়জাবাদের মথুরা ছবে তখন অতি তুচ্ছ অবিচার কুবিচারের পুনঃ পুনঃ অভিযোগে দলের মন একেবারে বিঘ্ন করে তুলেছিল। দুরাণীর মৃত্যুতে সবাই যেন পরিত্রাণ পেলে। আমি ফিরে আসার পরে ক্যান্টনের মিটিঙে যখন সকল ব্যাপার জানা গেল তখন দুরাণীও নেই, মথুরাও টাইফয়েড জ্বরে মরেছে। প্রতীকারের কিছুই আর ছিল না, কিন্তু ভবিষ্যতের ভয়ে সে-রাত্রের গুপ্ত-সভা অতিশয় কঠিন দুটো আইন পাশ করে। কৃষ্ণ আইয়ার তুমি ত উপস্থিত ছিলে, তুমিই বল।

কৃষ্ণ আইয়ারের মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল, কহিল, আপনি কাকে ইঙ্গিত করছেন আমিত বুঝতে পারচিনে ডাক্তার।

ডাক্তার লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, ব্রজেন্দ্রকে। একটা আইন এই ছিল, আমার আড়ালে আমার কাজের আলোচনা চলবে না,—

ব্রজেন্দ্র বিজ্ঞপের স্বরে প্রশ্ন করিল, আলোচনাও চলবে না?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, না, আড়ালে চলবে না। কিন্তু চলে তা' জানি। তার কারণ, সেদিনকার ক্যান্টনের সভায় উপস্থিত যারা ছিলেন, দুরাণীর মৃত্যুতে তারা যতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, আমি ততটা হইনি, স্তবরাং এ বস্তু চলেও আস্চে, আমিও অবহেলা করেই আস্চি। কিন্তু দ্বিতীয়টা গুরুতর অপরাধ, ব্রজেন্দ্র।

ব্রজেন্দ্র তেমনি উপেক্ষাভরে কহিল, সেটা প্রকাশ করে বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, প্রকাশ করেই বল্চি। আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা মারাত্মক অপরাধ। দুবাগীর মৃত্যুর পক্ষে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার দরকার।

ব্রজেন্দ্র কঠিন হইয়া উঠিল, বলিল, সাবধান হওয়া দরকার অপরেরও ঠিক এমনি থাকতে পারে। জগতে প্রয়োজন শুধু আপনারই একচেটে নয়। এই বলিয়া সে সকলের দিকেই চাহিল, কিন্তু সকলেই মৌন হইয়া রহিল, কেহই তাহার জবাব দিল না।

ডাক্তার নিজেও অনেকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, এর শাস্তি হচ্ছে চরম দণ্ড! ভেবেছিলাম আমার পূর্বে আর কিছু কোরব না, কিন্তু ব্রজেন্দ্র, তোমার আপনারই সবুর মইল না। পরের প্রাণ নিতে ত তুমি সদাই প্রস্তুত, কিন্তু নিজের বেলা কিরকম মনে হয়?

ব্রজেন্দ্রর মুখ কালো হইয়া উঠিল। মুহূর্তকাল সে নিঃশব্দে সম্বরণ করিয়া লইয়া দম্ভভরে কহিয়া উঠিল, আমি ত্যাকিষ্ট, আমি রেভোলিউশনারি, প্রাণ আমার কাছে কিছুই নয়,—নিতেও পারি, দিতেও পারি।

ডাক্তার শাস্তকণ্ঠে বলিলেন, তাহলে আজ রাত্রে সেটা দিতে হবে,—কিন্তু বেগ্ট থেকে ওটা টেনে বাগ করবার সময় হবে না, ব্রজেন্দ্র, আমার চোখ আছে,—তোমাকে আমি চিনি। এই বলিয়া তিনি পিস্তল সজ্জা বাঁ হাত তুলিয়া ধরিলেন; ভাদতী ব্যাকুল হইয়া সেই হাতটা ধরিয়া চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেই তিনি ডান হাত দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া শুধু বলিলেন, জি।

ঘরের মধ্যে চক্ষের নিম্নে যেম একটা বজ্রপাত ঘটিয়া গেল।

স্বমিত্রার চোঁট কাঁপিতে লাগিল, বলিল, নিজেদের মধ্যে এ সব কি বলুন ত?

তলওয়ারকর এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও কহে নাই, এখন সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার দলের সকল নিয়ম আমি জানিনে। আপনার সঙ্গে মতভেদের শাস্তি কি এখানে মৃত্যু? অপূর্ববাবু বেঁচে গেছেন এতে আমি মনে মনে খুসিই হয়েছি, কিন্তু আপনার অন্তায় তাতে কম হয়নি, এ সত্য বলতে আমি বাধ্য।

কৃষ্ণ আইয়ার ঘাড় নাড়িয়া ইহাতে সায় দিল। ব্রজেন্দ্রর কণ্ঠস্বরে আর উপহাসের স্পর্শ ছিল না, কিন্তু সে অনেকের সহানুভূতিতে বল পাইয়া বলিল, একজনের প্রাণ যাওয়া যখন চাই, তখন আমারই নাহোক যাক। আমি প্রস্তুত।

সুমিত্রা বলিল, ট্রেটরের বদলে যদি একজন ট্রায়ের কমরেডের রক্তেই তোমার প্রয়োজন, তখন আমিও ত দিতে পারি ডাক্তার।

ডাক্তার স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, এই উচ্ছ্বাসের সহসা কোন জবাব দিবার চেষ্টা করিলেন না। মিনিট দুই পরে নিজের মনেই একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, সে সব বহুকালের কথা, তখন কোথায়ই বা তোমরা? এই ট্রায়ের কমরেডটিকে তখন থেকেই আমি জানি। যাঁ যাক। টোকিওর একটা হোটেলে বসে সুনিয়াং সেন্ একদিন বলেছিলেন নৈরাগ্য সহ্য করার শক্তি যার যত কম সে যেন এ প্রান্তা থেকে ততখানি দূরে দূরেই চলে। অতএব, এ আমার সহ্যবে। কিন্তু ব্রজেন্দ্র, তোমাকে আমি মিথ্যা ভয় দেখাবার চেষ্টা করিনি। আমাকে অতীত যেতে হচ্ছে, কিন্তু ডিসিপ্রিন ভেঙে গেলে ত আমার চলবে না। সুমিত্রাকে যদি তোমার দলেই পাও, আই উটশ ইউ গুড ল্যাক। কিন্তু আমার পথ তুমি ছাড়। সুরাভায়ায় একবার এ্যাটেম্‌ট করেছ, পরশু আর একবার করেছ, কিন্তু এর পরে ইফ্‌ উই মিট—ইউ নো!

হুমিত্রা উদ্বেগে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সব কথার মানে ?
এ্যাটেম্‌ট করার অর্থ ?

ডাক্তার এ প্রশ্ন কানেও তুলিলেন না, কহিলেন, কৃষ্ণ আইয়ার, আই
অ্যাম সরি !

আইয়ার মুখ অবনত করিল, কিন্তু উত্তর দিল না। ডাক্তার পকেট
হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, ভারতীর হাত ধরিয়া একটুখানি
আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এইবার চল তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিবে
আমি যাই। ওঠ।

ভারতী স্বপ্নাবিষ্টের ছায়া বসিয়াছিল, ইঙ্গিতমাত্র নিঃশব্দে উঠিয়া
দাঁড়াইল। তাকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া
গেলেন, শুধু দ্বারের কাছে হইতে একবার সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া
বলিলেন, গুড্‌ নাইট !

এই বিদায় বাণীর কেহ প্রত্যুত্তর দিল না, অভিভূতের ছায়া সকলে
স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ভারতী নীচে নামিয়া গেল, ডাক্তার উপরের
দিকে চোখ রাখিয়া যখন ধীরে ধীরে নামিতেছিলেন, অকস্মাৎ কবাট
খুলিয়া শশী মুখ বাহির করিয়া বলিল, কিন্তু আমার যে আপনাকে
ভয়ানক প্রয়োজন ডাক্তার। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে নামিয়া তাহার
পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, রুদ্ধস্বাসে কহিল, আমি ত মানুষের মতোই নই
ডাক্তারবাবু, কোনদিন আপনার কোন কাজে লাগবার শক্তিই আমার
নেই, কিন্তু আপনার ঋণ আমি চিরদিন মনে করে রাখিবো। এ
ভুলব না।

ডাক্তার সম্মুখে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিলেন, কে বলে
তোমাকে মানুষ নয়, শশী ? তুমি কবি, তুমি গুণী, তুমি সকল মানুষের
বড়। আর আমার কাছে তোমার ঋণ যদি কিছু সত্যিই থাকে, সে তো
না ভোলাই ভাল।

শশী বলিল, না, আমি ভুলবনা। কিন্তু, যেখানেই থাকুন, যা কিছু আমার আছে সমস্তই আপনার—এ কথা কিন্তু আপনিও ভুলতে পাবেন না।

উভয়ে ভারতীর কাছে আসিয়া পৌছিতে সে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা ?

ডাক্তার সহাস্ত্রে বলিলেন, অসময়ে ওর ত কোন বিপদই ছিলনা, কিন্তু হঠাৎ সময়টা ভাল হয়ে পড়াতেই ওর মহা চিন্তা হয়েছে, পাছে কৃতজ্ঞতার স্বর্ণ আর মনে না থাকে। তাই ছুটে বলতে এসেছে, ওর যা কিছু আছে সমস্তই আমার।

ভারতী বলিল, তাই নাকি শশিবাবু ?

শশী চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার সকৌতুক স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, মনে থাকবে হে শশি, থাকবে। এ বস্তু জগতে এত স্থলভ নয় যে কেউ সহজে ভোলে।

শশী কহিল, আপনি কবে যাবেন ? তাঁর আগে কি আর দেখা হবে না ?

ডাক্তার বলিলেন, দূরে রাখে দেখা হবেই না। কিন্তু তুমি ত আমার ব্যসে ছোট, আমি আশীর্বাদ করে যাচ্ছি তুমি যেন সুখী হতে পারো।

শশী সর্বিনয়ে কহিল, আস্তে শনিবারটা পর্যন্তও কি থাকতে পারেন না ?

ভারতী কহিল, শনিবার যে ওদের বিয়ে।

ডাক্তার মুখ টিপিয়া হাসিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। সম্মুখে নদী, কাঠের মাড়ের পাশে ক্ষুদ্র তরঙ্গী শেষ ভাঁটায় কাদার উপরে কাত হইয়া পড়িয়াছে। সোজা করিয়া ভারতীকে সবত্রে তুলিয়া দিয়া তিনি নিজেও উঠিয়া বসিলেন। শশী বলিল, শনিবারটা আপনাকে থেকে যেতে হবে। জীবনে অনেক ভিক্ষে দিয়েছেন, এটিও আমাকে দিন। ভারতী, আপনাকেও সেদিন আসতে হবে।

ভারতী মৌন হইয়া রহিল। ডাক্তার বলিলেন, ও আসবে না শশি, কিন্তু আমি যদি থেকে যেতে পারি অন্ধকারে গা ঢেকে এসে তোমাদের একবার আশীর্বাদ করে যাবো, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। আর যদি না আসি, নিশ্চয় জেনো সব্যসাচীর পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যেখানেই থাকি, সেদিন তোমার জন্তে এই প্রার্থনাই কোরব, বাকি দিনগুলো যেন তোমার সুখে কাটে। এই বলিয়া তিনি হাতের লগি দিয়া কাঠের স্তূপে সজোরে ঠালা দিতেই ছোট নৌকা কাদার উপর দিয়া পিছলাইয়া নদীর জলে গিয়া পড়িল।

জোয়ার তখনও আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ভীটার টানে ঢিমা পড়িয়া আসিয়াছে। সেই মন্দীভূত স্রোতে উচ্চ তীরভূমির অন্ধকার ছায়ার নীচে দিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র তরণী ধীরে ধীরে পিছাইয়া চলিতে লাগিল। ও-পারের জল পাড়ি দিতে তখনও বিলম্ব ছিল, ডাক্তার হাতের দাঁড় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিলেন।

শ্রান্ত ভারতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর কল্লই রাখিয়া হেলান দিয়া বসিয়া বলিল, আজ একলা থাকলে আমি এমন কান্না কাঁদতাম যে নদীর জল বেড়ে যেতো। দাদা, ভবিষ্যতে সকলেরই সুখী হবার অধিকার আছে, নেই কি কেবল তোমার? শশীবাবু অতবড় বিশ্রী কাজ করতে উত্তত, তাকেও তুমি মন খুলে আশীর্বাদ করে এলে,—শুধু কেউ নেই পৃথিবীতে সুখী হও বলে তোমাকেই আশীর্বাদ করবার? তুমি গুরুজন হও আর বাই হও, তোমাকেও আজ আমি ঠিক ওই বলে আশীর্বাদ কোরব, যেন তুমিও ভবিষ্যতে সুখী হতে পারো।

ডাক্তার সহাস্তে কহিলেন, ছোটর আশীর্বাদ খাটেনা। উল্টো ফল হয়।

ভারতী বলিল, মিছে কথা। তা' ছাড়া আমি শুধু ছোট নয়, আর একদিক দিয়ে তোমার বড়। যাবার আগে তুমি সমস্ত লণ্ড ভণ্ড

করে দিয়ে স্মিত্রাদিদির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে রেখে যেতে চাও। সে আমি হতে দেব না। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিতে লাগিল, তুমি বলবে স্মিত্রাকে ত তুমি ভালবাস না। নাই বাস্লে। তোমাদের গুরুমহাশয়ের ভালবাসার কতটুকু দাম দাদা, যা আজ আছে কাল নেই? অপূর্ববাবুও আমাকে ভালবাসতে পারেন নি, কিন্তু আমি ত পেয়েছি। আমার পারাই যা কিছু সব। বোলতার মধু শঙ্করের শক্তি নেই বলে ঝগড়া করতে যাবো কার সঙ্গে? কিন্তু আজ তোমাকে বলছি দাদা, এই বিশ্ব-বিধানের প্রভু যদি কেউ থাকেন নারী-হৃদয়ের এত বড় প্রেমের ঋণ শুধতে তাঁকে আমার হাতে এনে অপূর্ববাবুকে সপে দিতে হবেই হবে। এই বলিয়া ভারতী কিছু একটা উত্তরের আশায় ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, দাদা, তুমি মনে মনে হাস্চো?

কই, না।

নিশ্চয়। নইলে তুমি জবাব দিলে না কেন? এই বলিয়া সে অন্ধকারে যতদূর পারা যায় সব্যসাচীর মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ভাস্কর হেঁট হইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া একবার হাসিলেন, বলিলেন, জবাব দেবার কিছু ছিল না ভারতী। তোমার বিশ্ব-বিধানের প্রভুটিকে যদি এই জবরদস্তিই মেনে চলতে হতো, তোমার স্মিত্রা দিদির কি হোতো জানো? ব্রজেন্দ্রের হাতেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সপে দিয়ে তবে হাঁক ছেড়ে বাঁচতে হোতো।

ভারতী বিশেষ চমকিত হইল না। আজিকার ব্যাপারের পরে এই সন্দেহই তাহার মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, ব্রজেন্দ্র কি তাঁকে তোমার চেয়ে,—আমি বলছি, এত বেশি ভাল বাসেন?

ডাক্তার সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। তারপর कहিলেন, বলা একটু কঠিন। এ যদি নিছক একটা আকর্ষণই হয় ত মাহুঘের সমাজে তার তুলনা হয় না। লজ্জা নেই, সরম নেই, সম্মম নেই,—হিতাহিত বোধলুপ্ত জানোয়ারের উন্মত্ত আবেগ যে চোখে না দেখেচে সে তার মনের পরিচয়ই পাবে না। ভারতী, তোমার দাদার এই হাত দুটো বলে কোন বস্তু যদি সংসারে না থাকতো স্মিত্রার আত্মহত্যা ছাড়া বোধ হয় আর কোন পথ খোলা থাকত না। তোমার বিশ্ব-বিধানের প্রভুটিও এতদিন এদের খাতির না করে পারেন নি। এই বলিয়া তিনি ভারতীর আনত মাথার পরে সেই হাত দুটি রাখিয়া ধীরে ধীরে চাপড়াইতে লাগিলেন।

এতক্ষণে ভারতী শব্দায় ত্রস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, দাদা, এত জেনেও তুমি এঁরই হাতে স্মিত্রাকে ফেলে রেখে যেতে চাচ্চো? এত বড় নিষ্ঠুর তুমি হতে পারো আমি ভাবতেই পারিনে।

ডাক্তার कहিলেন, তাই ত আজ যাবার আগে সমস্ত চুকিয়ে দিয়ে যেতে চেয়েছিলাম,—কিন্তু স্মিত্রাই ত হতে দিলেনা।

ভারতী সভয়ে প্রশ্ন করিল, হতে দিলেনা কি রকম? তুমি কি সত্যিই ব্রজেনকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে না কি?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ, সত্যিই চেয়েছিলাম! ইতিমধ্যে পুলিশের লোকে যদি না তাকে ছেলে পাঠায় ত ফিরে এসে আর একদিন আমাকেই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

এতক্ষণ পবাস্ত ভারতী তাঁহার ক্রোডের উপর হেলান দিয়া বসিয়া ছিল, এই কথার পরে উঠিয়া বসিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে যে অন্তরের মধ্যে একটা কঠিন আঘাত পাইল ডাক্তার তাহা বুঝিলেন, কিন্তু কোন কথা না कहিয়া পরপারের জগৎ প্রস্তুত হইয়া পার্শ্বে রক্ষিত দাঁড় দুটা দুই হাতে টানিয়া লইলেন।

অনেকক্ষণ পরে ভারতী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দাদা, আমি যদি তোমার স্হমিত্রা হোতাম এমনি করে কি আমাকেও ফেলে যেতে পারতে ?

ভাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, কিন্তু তুমি ত স্হমিত্রা নও, তুমি ভারতী। তাই তোমাকে আমি ফেলে যাবোনা, কাজের জন্তে রেখে যাবো।

ভারতী ব্যগ্র হইয়া কহিল, রক্ষে কর দাদা, তোমাদের এই সব খুনো-খুনি রক্তা-রক্তির মধ্যে আমি আর নেই। তোমার গুপ্ত-সমিতির কাজ আমাকে দিয়ে আর হবেনা।

ভাক্তার বলিলেন, তার মানে এঁদের মত তুমিও আমাকে ত্যাগ করে যেতে চাচ্চো ?

এই উক্তি শুনিয়া ভারতী ফোভে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল, এতো বড় অন্ডায় কথা তুমি আমাকে বলতে পারো দাদা ? তুমি যা-ইচ্ছা করতে পারো, কিন্তু আমি নিজে থেকে তোমাকে ত্যাগ করে দেছি, এ কথা মনে হলে কি একটা দিনের জন্তেও বাঁচতে পারি তুমি ভাবো ? আমি তোমারই কাজ করে যাবো, বত দিন না হুমি স্বেচ্ছায় আমাকে ছুটি দাও। একটুখানি ধামিয়া কহিল, কিন্তু আমিও জানি, মানুষ খুন করে বেড়ানোই তোমার আসল কাজ নয়, তোমার কাজ মানুষকে মানুষের মত করে বাঁচানো। তোমার সেই কাজেই আমি লেগে থাকবো, এবং সেই ভেবেই ত তোমাদের মধ্যে আমি এসেছিলাম।

ভাক্তার এক মুহূর্তের জন্ত দাঁড়টানা বন্ধ রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, সে কাজটা আমার কি ?

ভারতী বলিল, আমাদের পথের-দাবীর ত কোন প্রয়োজন ছিলনা গুপ্ত-সমিতি হয়ে ওঠা! কারখানার মজুর মিস্ত্রিদের অবস্থা ত আমি

নিজের চোখেই দেখে এসেছি। তাদের পাপ, তাদের কু-শিক্ষা, তাদের পশুর মত অবস্থা,—এর একমিন্দু প্রতিকারও যদি সারাজীবনে করতে পারি, তার চেয়ে বড় সার্থকতা আমার আর কি হতে পারে? সত্যি বোলো দাদা, একি তোমারই কাজ নয়?

ডাক্তার তখনই কোন জবাব দিলেন না, বহুক্ষণ নীরবে কত-কি যেন চিন্তা করিয়া সহসা দাঁড় ছুটা জল হইতে তুলিয়া লইয়া দীয়ে দীয়ে কহিলেন, কিন্তু তোমার এ কাজ নয় ভারতী, তোমার অন্য কর্তব্য আছে। এ কাজ সুমিত্রার,—তাই, তার পরেই আমি এ ভার গ্রস্ত করে রেখেছি।

তখন নদীতে ভাঁটা শেষ হইয়া মোহানায় জোয়ার আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সাগরের ক্ষীত জলবেগ এখনও এতদূরে আসিয়া পৌছে নাই,—সেই শুষ্কপ্রায় নদীবক্ষে তাঁহাদের ক্ষুদ্র তরঙ্গী মন্থর মন্দ গতিতে ভানিয়া চলিতে লাগিল, ডাক্তার তেমনি শাস্ত মুহূর্ত্তে কহিলেন, তোমাকে বলাই ভাল ভারতী, জনকতক কুলি-মজুরের ভাল করার জন্তে পথের-দাবী আমি সৃষ্টি করিনি। এর ঢের বড় লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের মুখে হত্বত একদিন এদের ভেড়া-ছাগলের মতই বলি দিতে হবে,—তার মধ্যে তুমি খেকোনা বোন, সে তুমি পারবেনা।

ভারতী চমকিয়া উঠিয়া কহিল, এসব তুমি কি বোল্চ দাদা? মাছকে বলি দেবে কি!

ডাক্তার তেমনি শাস্তস্বরে বলিলেন, মাছকে কোথায়? জানোয়ার বই ত নয়!

ভারতী ভীত হইয়া কহিল, মাছের সবন্ধে তুমি ঠাট্টা করেও অমন কথা মুখে এনোনা বল্চি। সকল সময়ে সব কথা তোমার বোঝা যায় না—বুঝতেও পারিনে, তা' মানি; কিন্তু তোমার মুখের কথার চেয়ে তোমাকে আমি ঢের বেশি বুঝি দাদা, মিথ্যে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা কোরোনা।

ডাক্তার বলিলেন, না ভারতী, মিথ্যে নয়, তোমাকে সত্যি ভয় দেখাবার চেষ্টা করছি, যেন আমার যাবার পরে আর তুমি কারখানার কুলি-মজুরদের ভাল-করার মধ্যে না থাকো। এমন করে এদের ভালো করা যায় না,—এদের ভালো করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। এবং সেই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্তেই আমার পথের-দাবীর সৃষ্টি। বিপ্লব শাস্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়,—এই তার বর, এই তার অভিধাপ। একবার ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। হংগেরিতে তাই হয়েছে, রুসিয়ায় বার বার এমনি ঘটেছে, ১৮ শালের জুন মাসের বিপ্লব ফরাসীদের ইতিহাসে আজও অক্ষর হয়ে আছে। কুলি-মজুরদের রক্তে সেদিন সহরের সমস্ত রাজপথ একেবারে জাড়া হয়ে উঠেছিল। এই ত সেদিনের জাপান,—সেদেশেও দিন-মজুরের দুঃখের ইতিহাস একবিন্দু বিভিন্ন নয়। মানুষের চলবার পথ মানুষের কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয়না ভারতী।

ভারতী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, সে আমি জানিনে, কিন্তু ভই সব ভয়ানক উৎপাত কি তুমি এদেশেও টেনে আনবে না কি? যাদের এক কৌটো ভালো করবার জন্তে আমরা অহিনিশি পরিশ্রম করছি, তাদের রক্ত দিয়ে কারখানার রাস্তায় নদী বহাতে চাও না কি?

ডাক্তার অবলীলাক্রমে কহিলেন, নিশ্চয় চাই। মহামানবের মুক্তি-মাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে সেই ত আমার স্বপ্ন। এত কালের পর্বতপ্রমাণ পাপ তবে ধুয়ে যাবে কিসে? আর সেই ঘোঁয়ার কাজে তোমার দাদার ছ'কৌটো রক্তেরও যদি প্রয়োজন হয় ত'আপত্তি কোরব না ভারতী।

ভারতী কহিল, ততটুকু তোমাকে আমি চিনি, দাদা। কিন্তু দেশের মধ্যে এই অশান্তি ঘটিলে তোলবার জন্তেই এতবড় ফাঁদ পেতে বসে আছো? এর চেয়ে বড় আদর্শ আর তোমার নেই?

ডাক্তার বলিলেন, আজও ত খুঁজে পাইনি বোন। অনেক ঘুরেছি, অনেক পড়েছি, অনেক ভেবেছি। কিন্তু তোমাকে ত আমি আগেও বলেছি, ভারতী, অশান্তি ঘটিয়ে তোলার মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যান্বয়ের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের এমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চম্কে উঠে ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল! বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করেনা। তাইত হয়েছে, তাইত আজ দীন দরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে! “তবুও তাদেরই অট্টালিকা প্রাসাদ চূর্ণ করার কাজে তাদেরি সঙ্গে কঠ মিলিয়ে যদি আমরাও আজ অশান্তি বলে কাঁদতে থাকি ত পথ পাবো কোথায়? না ভারতী, সে হাবেনা। ও প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীন, যত পবিত্র, যত সনাতনই হোক,—মানুষের চেয়ে বড় নয়,—আজ সে-সব আমাদের ভেঙে ফেলতেই হবে। ধূলো ত উড়বেই, বালি ত বরবেই, ইট পাথর খসে মানুষের মাথাতে ত পড়বেই ভারতী, এই ত স্বাভাবিক।

ভারতী বলিল, তাও যদি হয়, দাদা, শান্তির পথ ছেড়ে দিয়ে কোথেকেই অশান্তির পথে পা বাড়াবো কেন?

ডাক্তার বলিলেন, তার কারণ, শান্তির পথ ঐ সনাতন, পবিত্র ও সুপ্রাচীন সভ্যতার সংস্কার দিয়ে এঁটে বন্ধ করা আছে বলে। কেবল ঐ বিপ্লবের পথটাই আজও খোলা আছে।

ভারতী প্রশ্ন করিল, আমরা যে সেদিন কারখানার কারিগরদের

সজ্জবদ্ধ করে নিরুপদ্রব ধর্মঘট করাবার আয়োজন করেছিলাম সেও কি হবে তাদের মঙ্গলের জন্তে নয়? তুমি চলে গেলে পঙ্কথর-দাবীর সে প্রচেষ্টাও কি আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে?

ডাক্তার বলিলেন, না। কিন্তু সে কর্তব্য তোমার নয়, সুমিত্রার। তোমার কাজ আলাদা। ভারতী, ধর্মঘট বলে একটা বস্তু আছে, কিন্তু নিরুপদ্রব-ধর্মঘট বলে কোথাও কিছু নেই। সংসারে কোন ধর্মঘটই কখনো সফল হয়না, যতক্ষণ না পিছনে তার বাহুবল থাকে। শেষ পরীক্ষা তাকেই দিতে হয়।

ভারতী বিষয়ে প্রশ্ন করিল, কাকে দিতে হয়? শ্রমিককে?

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ! তুমি জানো না, কিন্তু সুমিত্রা ভাল করেই জানে যে ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। তাব উপায়হীন, কর্মহীন দিনগুলো দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্বামী পুত্র পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে,— তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে,— তখন পরের অন্ন কেড়ে খাওয়া ছাড়া জীবন ধারণের আর সে পথ খুঁজে পার না। বনী সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে। অর্থ-বল, মৈত্র-বল, অস্ত্র-বল সবই তার হাতে,—সে-ই ত রাজশক্তি। সেদিন সে আর অবহেলা করেনা,—তোমার ঐ মনোতন শাস্তি ও পবিত্র শৃঙ্খলার জয়জয়কার হোক, সেদিন নিরস্ত্র নিরস্ত্র দরিদ্রের রক্তে নদী বহে যায়।

ভারতী ক্রুদ্ধভাবে কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরে আবার একদিন সেই সব গীড়িত, পরাভূত, ক্ষুধাতুর শ্রমিকের দল এসে সেই হত্যাকারীর ঘারেই হাত পেতে দাঁড়ায়। ভিক্ষা পায়।

ভারতী কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, তারও পরে ? তার পরে আবার একদিন সে দলবদ্ধ হয়ে পূর্ব অত্যাচারের প্রতিকারের আশায় ধর্মঘট করে বসে, তখন আবার সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরভিনয় হয়।

ভারতীর মন মুহূর্তকালের জন্ত একেবারে নিরাশায় ভরিয়া গেল, ধীরে ধীরে কহিল, তবে এমন ধর্মঘটে লাভ কি দাদা ?

ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি অন্ধকারেও জলিয়া উঠিল, কহিলেন, লাভ ! এই ত পরম লাভ ভারতী ! এই ত আমার বিপ্লবের রাজপথ ! বঙ্গদীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে উঠে গঠে জগতে সে শক্তি সত্য নয় ? সেই ত আমার মূলধন। কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্তই বিপ্লব বাধানো যায় না, ভারতী, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-ই চাই। সেই ত আমার অবলম্বন। যে-মুখ এ কথা জানেনা, শুধু মজুরির কম-বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্বনাশ করে, দেশেরও করে।

ভারতী সহসা কহিল, নৌকো বোঝ হয় আমাদের অনেকখানি পিছিয়ে এসেছে দাদা।

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, সে দিকেও চোখ আছে দিদি, কোথায় যেতে হবে, তা ভুলিনি।

ভারতী কহিল, কেন যে এর মধ্যে থেকে আমাকে তুমি বিদায়িত চাও এতক্ষণে তা বুঝেচি। আমি ভারী দুর্বল। হয়ত তাঁঁ মতই দুর্বল। আমি কিছু নয়,—আজও তোমার সমস্ত ভরসা সেই স্মিত্ত্রাদিদির 'পরেই। কিন্তু এ কথা আমি কিছুতে মানবো না যে, এ ছাড়া আর পথ নেই,—মাতুষের সমস্ত খোঁজাই একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একজনের মঙ্গলের জন্ত আর একজনের অমঙ্গল করতেই হবে,—এ আমি কোনমতেই চরম সত্য বলে নেব না,—তুমি বললেও না।

সে আমি জানি বোন।

ভারতী কহিল, কিন্তু তোমার কাজ ছেড়েই বা আমি যাই কি করে? থাকুবো কি নিয়ে? ফিরে যদি আর না এসো আমি বাঁচবো কি করে?

সেও আমি জানি।

ভারতী বলিল, জান তুমি সব। তবে?

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। উত্তর না পাইয়া ভারতী ধীরে ধীরে বলিল, বিপ্লব যে কি, কেন এর এত প্রয়োজন মনের মধ্যে আমি ধারণাই করতে পারিনে। তবু, তোমার মুখ থেকে যখন শুনি বুকের ভেতরটার কেমন যেন কাঁদতে থাকে। মনে হয় মানুষের দুঃখের ইতিহাস তুমি কতই না চোখে দেখেচ। নইলে এমন করে তোমাকে পাগল করেছে কিসে? আচ্ছা, যাবার সময় কি আমাকে তুমি সঙ্গে নিতে পারোনা দাদা?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তুমি কেপেচ ভারতী?

কেপেচি? তাই হবে। একটুখানি থামিয়া বলিল, মনে হয় আমি যেন তোমার কাজের বাধা। তাই, যেন কোথায় আমাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে যাচ্চো। কিন্তু, আমি কি দেশের কোন ভাল কাজেই লাগতে পারিনে? এমন সুযোগ কি কোথাও কিছু নেই?

ডাক্তার বলিলেন, দেশে ভাল কাজ করার অসংখ্য অবকাশ আছে ভারতী, কিন্তু সুযোগ নিজে তৈরী করে নিতে হয়।

ভারতী আদর করিয়া বলিল, আমি পারিনে দাদা, তুমি তৈরী করে দিয়ে যাও।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাসিমুখ সহসা যে গভীর হইয়া উঠিল, অন্ধকারে ভারতী তাহা দেখিতে পাইল না। কহিলেন, দেশের মধ্যে ছোটবড় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা

দেশের চের ভাল কাজে করে। আত্মের সেবা, নরনারীর পুণ্যসঙ্ঘে প্রবৃত্তি দান করা, লোকের জর ও পেটের অমুখে ঔষধ যোগানো, জল-প্লাবনে সাহায্য ও সাহুনা দেওয়া—তঁরাই তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন, ভারতী, কিন্তু আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই,—পাপ পুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। এই-সব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলেখেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ,—এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নাই। ভারতী, আমাকে আর তুমি টেনোনা।

ভারতী অন্ধকারে একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়াছিল, রুদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

(২৬)

আজ শনিবার, শশী ও নবতারার বিবাহের দিন। শশীর সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই ছিল যে, রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া কোন এক সময়ে যেন ডাক্তার ভারতীকে সঙ্গ করিয়া আনিয়া আজ তাহাদের আশীর্বাদ করিয়া যান। পঞ্চমীর খণ্ডচন্দ্র সেইমাত্র গাছের আড়ালে ঢলিয়া পড়িয়াছে, ভারতী একখানা কালো ব্যাপারে সর্বাপ্র আচ্ছাদিত করিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাহার সেই জনশূন্য ঘাটের একধারে আনিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভারতী আবেগে করিয়া বলিল, কত-কি যে ভাবতে ভাবতে আসছিলাম তার ঠিকানা নেই। আমি, আমাকে না বলে তুমি কিছুতেই চলে যাবেনা, তবুত ভয় ঘোচেনা। কদিনই বা, কিন্তু, মনে হচ্ছিল যেন কত দূর তোমাকে দেখতে পাইনি, দাদা। আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে চীনেদের দেশে চলে যাবো তা' বলে রাখছি।

ডাক্তার সহাস্তে কহিলেন, আমিও বলে রাখছি তুমি নিশ্চয়ই গুরুত্ব

কিছু করবার চেষ্টা করবে না। এই বলিয়া তিনি ভাঁটার টানে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, এইটুকু ত, বেশ যাওয়া যাবে, কিন্তু বড় নদীতে পড়ে উণ্টো স্রোত ঠেলে পৌছতে আজ আমাদের ঢের দেরি হবে। !

ভারতী কহিল, হ'লই বা। এমনি কি শুভকর্মে যোগ দিতে চলেচ যে সময় বয়ে গেলে ক্ষতি হবে? আমার ত যাবার ইচ্ছেই ছিল না,—শুধু তুমি যাচ্ছা বলেই যাওয়া। কি বিশ্রী নোঙরা কাণ্ড বলত!

ভাস্কর অশকল মৌন থাকিয়া বলিলেন, শশীর নবতারার সঙ্গে বিয়ে অনেকের সংসারে বাধে, হৃদয় বা দেশের আইনেও বাধে। কিন্তু সে দোষ ত শশীর নয়, আইন করা না-করা'র জগৎ দায়ী ব্যাধি, অপরাধ তাদের। আমার একমাত্র স্নেহ শশী আর কাউকে যদি ভালবাসতো ভারতী।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, শশীবাবু না-হয় আর কাউকে ভালবাসলেন, কিন্তু সে বাসবে কেন? ওর মত মানুষকে সজ্ঞানে কোন মেয়েমানুষ ভালবাসতে পারে এ ভো আমি ভাবতেই পারিনে। আচ্ছা তুমিই বল, পারে দাদা?

ভাস্কর মুচকিয়া হাসিলেন, বলিলেন, ওকে ভালবাসা শক্ত বই কি। তাই ত রয়ে গেলাম তাকে আশীর্বাদ করব বলে। মনে হল, সত্যকার শুভসামান্য যদি কোন শক্তি থাকে শশী যেন তার ফল পায়।

ভাস্কর কণ্ঠস্বরের আকস্মিক গভীরতায় ভারতী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শশীবাবুকে তুমি বাস্তবিক ভালোবাসা, না, দাদা?

ভাস্কর বলিলেন, হাঁ।

কেন?

তোমাকেই বা কেন এত ভালবাসি তারই কি কারণ দিতে পারি দিদি? বোধ হয় এমনিই।

ভারতী আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দাদা, তোমার কাছে কি তবে আমরা ছুঁতে এক? কিন্তু পরক্ষণেই সহাস্তে বলিল, তবু ত নিজের দামটা এতদিনে টের পেলাম। চল, আমরা তোমার সঙ্গে গিয়ে এখন খুশী হয়ে তাদের আশীর্বাদ—না না, আমরা করে আসি গে।

ডাক্তারও হাসিলেন, বলিলেন, চল।

জোয়ারের আশায় নদীর এপারে কোথাও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা নিরাপদ নহে, তাই ভাঁটা ঠেলিয়া কষ্ট করিয়াই চলিতে হইল। খাড়ির মুখে একখানা জাপানী জাহাজ কিছুদিন হইতে বাধা ছিল, সেই স্থানটা নিঃশব্দে পার হইয়া ভারতী কথা কহিল। বলিল, এই কয়দিন থেকে থেকে কেবলি মনে হতো, দাদা সমুদ্রের যেমন তল নেই, তোমারও তেমন তল নেই। স্নেহ বল, ভালবাসা বল, কিছুই তোমাকে ভর দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সবই যেন কোথায় ভলিয়ে চলে যায়।

ডাক্তার বলিলেন, প্রথমতঃ সমুদ্রের তল আছে, স্মৃতির, উপমা তোমার এ ক্ষেত্রে অচল।

ভারতী কহিল, এই নিয়ে বোধ হয় তোমাকে একশ বার বোঝাবে যে, তুমি ছাড়া ছনিয়ার আমার আর আপনার কেউ নেই,—তুমি চলে গেলে আমি দাঁড়াবো কোথায়? কিন্তু এ কথা তোমার কানেই পৌঁছল না। আর পৌঁছবে কি করে দাদা, জন্ম ত নেই। আমি ঠিক জানি একবার চোখের আড়াল হ'লে তুমি নিশ্চয় আমাকে ভুলে যাবে।

ডাক্তার বলিলেন, না। তোমাকে নিশ্চয় মনে থাকবে।

ভারতী প্রশ্ন করিল, কি আশ্রয় করে আমি সংসারে থাকবো?

ডাক্তার বলিলেন, ভাগ্যবতী মেয়েরা যা আশ্রয় করে থাকে। স্বামী ছেলেপুলে, বিষয় আশ্রয়, ঘোরদোর—

ভারতী রাগ করিয়া বলিল, আমি যে অপূর্ববাবুকে একান্তভাবেই ভালবেসেছিলাম এ সত্য তোমার কাছে গোপন করিনি; তাঁকে পেলে একদিন যে আমার সমস্ত জীবন ধরা হয়ে যেতো এ কথাও তুমি জানো,—তোমার কাছে কিছু লুকানোও যায় না,—কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি অপমান করবে কিসের জন্তে?

ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, অপমান! অপমান ত তোমাকে আমি এতটুকু করিনি ভারতী।

সহসা অশ্রু-আভাসে ভারতীর কণ্ঠ ভারি হইয়া উঠিল, কহিল, না করনি বই কি! তুমি জানো কত শত-সহস্র বাবা, তুমি জানো তিনি আমাকে গ্রহণ করতেই পারেন না,—তবুও তুমি এই সব বলবে!

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এই ত মেয়েদের দোষ। তারা নিজেরা একদিন যা বলে, অপরে তাই আর একদিন উচ্চারণ করলেই তারা তেড়ে মারতে আসে। সেদিন স্মিত্রার কথায় বললে সে কাকে যেন একদিন পায়ের তলায় টেনে এনে ফেলবে, আর আজ আমি তারই পুনরাবৃত্তি করায় কান্নায় গলা তোমার বুঁছে এলো!

ভারতী চোপ মুছিয়া বলিল, না, তুমি কথখনো এসব কথা আমাকে বলতে পারবেনা।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, বোলবনা। কিন্তু এ খাত্রা পেচে যদি ফিরে আসি বোন, এই আমারই পায়ের কাছে গলায় আঁচল দিয়ে প্রীকার করতে হবে,—দাদা, আমার কোটী কোটী অপরাধ হয়েছে,—নিশ্চয় তুমি হাত গুণতে জানো, নইলে সৌভাগ্যের এতবড় সত্যি কথা তখন বলেছিলে কি করে!

ভারতী ইহার উত্তর দিলনা। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া তিনি

পুনশ্চ কথা कहিলেন। এবার কোথা দিয়া যেন কণ্ঠস্বরে তাঁহার অপরাধ স্বর মিশিল, বলিলেন, সে-রাত্রে স্মিত্রার কথা যখন বলছিলে, ভারতী, আমি জবাব দিতে পারিনি। এ পথের পথিক নই আমি, তবু তোমার মুখে স্মিত্রার কাহিনীতে গায়ে আমার বার বার কাটা দিয়ে উঠেছিলো! ছনিয়া ঘুরে অনেক বস্তুরই হৃদিস পেয়েছি, পেলাম না শুধু এই নর-নারীর প্রেমের তত্ত্ব! দিদি, অসম্ভব বলে শব্দটা বোধ হয় সংসারে কেবল এদের অভিধানে লেখে না।

এ কথায় ভারতী লেশমাত্র ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলনা। উদাস নিঃস্পৃহ-স্বরে বলিল, তোমার বাক্যই সত্য হোক, দাদা, ও শব্দটা তোমাদের অভিধান থেকে যেন মুছে যায়। স্মিত্রাদিদির অদৃষ্ট যেন একদিন প্রসন্ন হয়। একটুখানি থামিয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমার নিজের কিন্তু ওতে আর আনন্দ নেই, ও আমি আর কামনাও করিনে। এই বলিয়া সে 'পুনরায় ফণকাল যৌন' থাকিয়া কহিল, অপূর্ণবাবুকে আমি যথার্থই ভালবাসি। ভাল হোক, মন্দ হোক, তাঁকে আর আমি ভুলতে পারবোনা! কিন্তু তাই বলে ঈশ্বর স্ত্রী হয়ে তাঁর ঘর-সংসার না করতে পেলেন! জীবন আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে নিশ্চয় জন্মে? এ আমার শোকের কথা নয় দাদা, তোমাকে একপাটে যথার্থই বলছি আমাকে তুমি শাস্ত মনে আশীর্বাদ করে পথ দেখিয়ে দিয়ে যাও—তোমার মত আমিও পরের কাছেই এ জন্মটা অর্থহীন সার্থক করে তুলব! নাওনা দাদা, তোমার নিরাশ্রয় ছোট্ট বোনকে সাধী করে!

ডাক্তার নিঃশব্দে তরী বাহিয়া চলিলেন, এতবড় অনির্জন অনুরোধের উত্তর দিলেন না। অন্ধকারে তাঁহার মুখের চেহারা ভারতী দেখিতে পাইল না, সে এই নীরবতায় আশাবিত্ত হইয়া উঠিল। এবার তাহার কণ্ঠস্বরে সন্মেল অতনয়ের নিবিড় বেদনা যেন উপচিয়া পড়িল, বলিল,

নেবে দাদা সঙ্গে ? তুমি ছাড়া এ আধারে যে এক ফোঁটা আলোও আর কোথাও দেখতে পাইনে !

ডাক্তার ঘরে ঘরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, অসম্ভব ভারতী। তোমার ক্ষথায় আজ আমার জোয়াকে মনে পড়ে ; তোমারই মত তার অমূল্য জীবন অকারণে নষ্ট হয়ে গেছে ! ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই, কিন্তু মানবজীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর কাম্য আর নেই এমন ভুলও আমার কোন দিন হয়নি। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ—এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্তই ত স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথা ? এর জন্তে তোমাকে আমি হত্যা করতে পারবনা, বোন, তোমার মধ্যে যে-হৃদয় স্নেহে, প্রেমে, ককণায়, মাধুর্যে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সে আমার প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বহু উর্দ্ধে চলে গেছে,—তার নাগাল আমি হাত বাড়িয়ে পাবোনা।

ভারতীর সর্বদা পুলকে কঁটকিত হইয়া উঠিল। সবাদাচীর গভীর অগ্নির একটা অপরূপ মূর্তি সে যেন সহসা চক্ষে দেখিতে পাইল। ভক্তি ও আনন্দে বিগলিত হইয়া কহিল, আমিও ত তাই ভাবি দাদা, তোমার অজানা সংসারে কি আছে ! আর তাই যদি হোলো, কি হেতু তুমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আছো ? দেশ-বিদেশে গুপ্ত-সমিতি খুঁটি বরে বেড়ানো তোমার কিসের জন্তে ? মানবের চরম কল্যাণ ত কোন দিনই এর মধ্যে থেকে হতে পারবেনা।

ডাক্তার বলিলেন, ঠিক তাই। কিন্তু চরম কল্যাণের ভার আমরা বিবাতার হাতে ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদ্র মানবের সাধের মধ্যে যে সামান্য কল্যাণ তারই চোপাতে নিযুক্ত আছি। নিজের দেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে কথা কওয়া, স্বাধীনভাবে চলে-ফিরে বেড়ানোর অতি তুচ্ছ অধিকার,—এর অধিক সম্প্রতি আর আমরা কিছুই চাই নে, ভারতী।

ভারতী কহিল, সে তো সবাই চায়, দাদা। কিন্তু তার জন্তে নরহত্যার ষড়যন্ত্র কিসের জন্তে বল ত? কি তার প্রয়োজন? কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কারণ, এ অভিযোগ শুধু রূঢ় নয়, অসত্য!

তৎক্ষণাৎ অন্ততপ্তচিত্তে কহিল, আমাকে মাপ কর দাদা, এ মিথ্যে আমি শুধু রাগের ওপরেই বলে ফেলেছি। আমাকে তুমি ফেলে চলে যাবে—এ যেন আমি ভাবতেই পারচিনে।

ভাজার হাসিয়া বলিলেন, তা' আমি জানি।

ইহার পরে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন কথাবার্তা হইল না। এই সময়ে কিছুদিন হইতে 'স্বদেশী' আন্দোলন ভারতব্যাপী হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তিভাজন নেতৃবৃন্দ দেশোদ্ধারকল্পে অর্থনৈতিক বাটাইয়া যে সকল জালাময়ী বক্তৃতা অবকাশ মত দিয়া বেড়াইতেছিলেন তাহারই সারাংশ সংবাদপত্র-স্থলে মাঝে মাঝে পাঠ করিয়া ভারতী মন্ত্রকবিস্ময়ে আপ্ত হইয়া উঠিত। বিগত রাত্রে এমনি ধারা কি একটা রোমাঞ্চকর রচনা খবরের কাগজে পাঠ করিয়া অবধি তাহার মনের মধ্যে ভিত্তিহীন তপ্ত বাতাস সারাদিন ধরিয়া আজ বহিয়া ফিরিতেছিল। তাহাই শ্রবণ করিয়া কহিল, আমি জানি ইংরাজ রাজত্বে তোমার স্থান নেই। কিন্তু সমস্ত ছুনিয়াই ত তাদের নয়। দেখানে গিয়ে তোমরা ত সরল, প্রকাশ্যভাবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করতে পারো।

প্রশ্ন করিয়া ভারতী উত্তরের আশায় কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা রয়া বলিল, অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্চিনে বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি মনে মনে তুমি হাস্‌চো। কিন্তু, তুমি এবং তোমার বিভিন্ন দলগুলিই ত শুধু নয়, আরও যারা দেশের কাজে,—তারা প্রবীণ, বিজ্ঞ, রাজনীতিতে যারা,—আচ্ছা দাদা, কালকের বাঙলা খবরের কাগজটা—

বক্তব্য শেষ হইল না, ডাক্তার হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, রক্ষে কর ভারতী, আমাদের সঙ্গে তুলনা করে পূজনীয়গণের অমর্যাদা কোরো না।

ভারতী কহিল, বরঞ্চ, তুমিই তাঁদের বিজ্ঞপ্তি কোরচ।

ডাক্তার সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, মোটে না। তাঁদের আমি ভক্তি করি, এবং তাঁদের দেশোদ্ধারের বক্তৃতা আমাদের চেয়ে সংসারে কেউ বেশি উপভোগ করে না।

ভারতী ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, পথ তোমাদের এক না হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য ত একই।

ডাক্তার কণকাল স্থির থাকিয়া বলিলেন, এতক্ষণ হাস্খিলাম সত্যি, এবার কিন্তু রাগ কোরব ভারতী। পথ আমাদের এক নয় এটা জানা কথা, কিন্তু লক্ষ্য যে আমাদের তার চেয়েও অধিক স্বতন্ত্র এ কি তুমিও এতদিন বোঝনি? পৃথিবীর বহুভাষিই স্বাধীন,—তার চেয়ে বড় গৌরব মানব জন্মের আর নেই, এই স্বাধীনতার দাবী করা, চেষ্টা করা ত জের দুবের কথা, তার কামনা করা, বল্লনা করাও ইংরাজের আইনে ভাণ্ডারবাসীর রাজদোহ। আমি নেই অপরাধেই অপরাধী! চিরদিন পরাধীন থাকটাই এ দেশের আইন। সুতরাং, আইনের বাইরে এই সব প্রবীণ পুণ্ড্র ব্যক্তিরা ত কোন দিন কোন কিছুই দাবী করেন না। চীনাদের দেশে মাগু রাজাদের মত এদেশেও যদি ইংরাজ আইন করে দিত—সবাইকে আড়াই হাত টিকি রাখতে হবে, তবে টিকির বিরুদ্ধে এঁরা কোনমতেই বে-আইনি প্রার্থনা করতেন না। এঁরা এই বলে আন্দোলন করতেন যে, আড়াই হাত আইনের দ্বারা দেশের প্রতি অতান্ত অবিচার করা হয়েছে, এতে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে, অতএব, একে সওয়া দু'হাত করে দেওয়া হোক! এই বলিয়া তিনি নিজের বদিকতায় উৎফুল্ল হইয়া অকস্মাৎ অট্টহাস্তে নদীর অন্ধকার নীরবতা বিস্তর করিয়া তুলিলেন।

হাসি খামিলে ভারতী কহিল, তুমি যাই কেন না বল, তীরাও দেশের নমস্তা ন'ন এ কথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। আমি সকলের কথাই বল্চিনে, কিন্তু সত্য সত্যই ধারা রাষ্ট্রনীতিবিদ—যথার্থই ধারা দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের সকল শ্রমই ব্যর্থশ্রম, এ কথা নিঃসন্দোহে স্বীকার করা কঠিন। মত এবং পথ বিভিন্ন বলেই কাউকে ব্যঙ্গ করা সাজে না।

তাঁহার কণ্ঠস্বরের গাভীয়া উপলব্ধি করিয়া ডাক্তার চূপ করিলেন। পিছন হঠাতে একটা ষ্টিম লঞ্চ যথেষ্ট শব্দ-নাড়া করিয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্র তরঙ্গীকে দ্রুতিমত দোল দিয়া বাহির হইয়া গেলে সব্যসাচী ধীরে ধীরে বলিলেন, ভারতী, তোমাকে ব্যথা দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নয়, তোমার নমস্তাগণকে উপহাস করাও আমার অভিপ্রায় নয়। তাঁদের রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞান পাণ্ডিত্য সংক্ষেপে আমার ভক্তি কম নেই, কিন্তু কি জানো দিদি, গৃহস্থ গুরুকে যখন খাটো করে বাঁধে, তখন তার সেই ছোট্ট দড়িটুকুর মধ্যে নীতি একটি মাত্রই থাকে। আমি সেইটুকু মাত্রই জানি। গুরু একান্ত নাগালের বাইরে খাটবস্তুর প্রতি প্রাণপণে গলা এবং জিভ বাড়িয়ে লেহন করার চেষ্টার মধ্যে অবৈদ্যতা কিছুমাত্র নেই, এমন কি অত্যন্ত আইনঙ্গত। উৎসাহ দেবার মত হৃদয় থাকলে দিতেও পারো, রাজার নিবেদ নেই, কিন্তু বুকের এই আন্তরিক প্রবল উত্তম বাইরে থেকে ধারা দেখে, তাদের পক্ষে হাঙ্গ্র সম্বরণ করা কঠিন।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দাদা, তুমি ভারি ছুট্ট। বলি এই আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, কিন্তু এ আমি ভেবে পাইনে, প্রাণ বার অহনিশি নরু স্ততোয় ঝুলুচে, সে কি করে হাসি-তামাসা করে পরের কথা নিয়ে।

ডাক্তার সহজকণ্ঠে বলিলেন, তার কারণ, এ সমস্তার মীমাংসা পূর্বেই হয়ে গেছে, ভারতী, যেদিন বিপ্লবের কাজে যোগ দিয়েছি। আর

আমার ভাববারও নেই, নালিশ করবারও নেই। আমি জানি, আমাকে হাতে পেয়েও যে-রাজশক্তি ছেড়ে দেয়, হয় সে অক্ষম উন্মাদ, নয় তার ফাঁসি দেবার দড়িটুকু পর্য্যাপ্ত নেই।

ভারতী বলিল, তাইত আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই দাদা। আমি উপস্থিত থাকতে তোমার প্রাণ নিতে পারে সংসারে এমন কেউ নেই। এ আমি কোন মতেই হতে দেব না। বলিতে বলিতেই গলা তাহার চাকের পলকে ভারি হইয়া আসিল।

ডাক্তার টের পাইলেন। নিঃশব্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, নৌকায় জোয়ার লেগেছে ভারতী, পৌছতে আর আমাদের দেরি হবে না।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু কহিল, মরুকগে। কিছুই আমার ভাল লাগে না। মিনিট দুই পরে জিজ্ঞাসা করিল, এত বড় রাজশক্তিকে তোমরা গায়ের জোরে টলাতে পারো একি তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর দাদা?

দ্বিধাহীন উত্তর আসিল, করি, এবং সমস্ত মন দিয়ে করি। এতবড় বিশ্বাস না থাকলে এতবড় ব্রত আমার অনেকদিন পূর্বেই ভেঙে যেত।

ভারতী বলিল, তাই বোধ হয় দীর্ঘে দীর্ঘে তোমার কাজ থেকে আমাকে বার করে দিলে,—না দাদা?

ডাক্তার স্মিতহাস্তে বলিলেন, না, তা নয় ভারতী। কিন্তু, বিশ্বাসই ত শক্তি, বিশ্বাস না থাকলে সংশয়ে যে কর্তব্য তোমার পদে পদে অপ্রভুর হয়ে উঠবে। সংসারে তোমার অজ্ঞ কাজ আছে বোন—কলাপকর, শাস্তিময় পথ, যা তুমি সর্পীভাষ্যকরণে বিশ্বাস কর,—তাই তুমি করগে।

অপরিসীম স্নেহবশেই যে এই লোকটি তাহার একান্ত বিপদসঙ্কুল বিপদ-পন্থা হইতে তাহাকে দূরে অপসারিত করিতে চাহিতেছে তাহা

নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া ভারতীর সজল চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। অলক্ষ্যে, অন্ধকারে ধীরে ধীরে মুছিয়া বলিল, দাদা, আমার কথায় কিন্তু রাগ করতে পাবে না। এতবড় রাজশক্তি, কত সৈন্যবল, কত উপকরণ, যুদ্ধের কত বিচিত্র ভয়ানক আয়োজন, তার কাছে তোমার বিপ্লববিদল কতটুকু? সমুদ্রের কাছে গোপ্পদের চেয়েও ত তোমরা ছোট। এর সঙ্গে তোমরা শক্তি পরীক্ষা করতে চাও কোন্ যুক্তিতে? প্রাণ দিতে চাও দাও গে—কিন্তু এতবড় পাগলামি আমি ত সংসারে আর দ্বিতীয় দেখতে পাইনে। তুমি বলবে তবে কি দেশের উদ্ধার হবেনা? প্রাণের ভয়ে সরে দাঁড়াবো? কিন্তু তা আমি বলিনে। তোমার কাছে থেকে, তোমার চরিত্রে হতে জননী জন্মভূমি যে কি নে আমি চিনেছি। তাঁর পদতলে সর্কণ দিতে পারাব চেয়ে বড় সার্থকতা মাহুষের যে আর নেই তোমাকে দেখে এ কথা যদি না আজও শিখতে পেরে থাকি ত আমার চেয়ে অধম নারী জন্মে কেউ জন্মানি। কিন্তু, নিছক আত্মহত্যা করেই কোন্ দেশ কবে স্বাধীন হয়েছে? কোন মতে তোমার ভারতী যে কেবল বেঁচে থাকতেই চায় এতবড় ভুল ধারণা করেও আমার সম্বন্ধে তুমি রেখোনা দাদা।

ডাক্তার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই ত!

তাইত কি?

তোমার সম্বন্ধে ভুলই হয়েছে বটে। এই বলিয়া ডাক্তার বিমুগ্ধমৌন থাকিয়া কহিলেন, বিপ্লব মানেই, ভারতী, কাটা-কাটি দক্তারজি নয়। বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন! সৈন্যবল, বিপ্লবী যুদ্ধোপকরণ, এ সবই আমি জানি। কিন্তু শক্তি পরীক্ষা ত আমাদের লক্ষ্য নয়। আজ বাবা শত্রু, কাল তারা বন্ধু হতেও ত পারে। নীলকান্ত শক্তি পরীক্ষা করতে যায়নি, তাদের মিশ্র করতে গিয়েই প্রাণ দিয়েছিল। হায়রে নীলকান্ত! কেবা তার নাম জানে!

অন্ধকারেও ভারতী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল দেশের বাহিরে, দেশের কাজে, যে ছেলেটি লোকচক্ষুর অগোচরে নিঃশব্দে প্রাণ দিয়াছে তাকে স্মরণ করিয়া এই নির্বিকার পরমসংযত মানুষটির গভীর হৃদয় ক্ষণিকের জন্য আনোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ যেন তিনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, কি বলছিলে ভারতী, গোপদ ? তাই হবে হয়ত। কিন্তু যে অগ্নিস্কুলিঙ্গ জনপদ ভ্রমসাৎ করে ফেলে, আয়তনে সে কতটুকু জানো ? সহর যখন পোড়ে সে আপনার ইন্ধন আপনি সংগ্রহ করে দক্ষ হয়। তার ছাই হবার উপকরণ তারই মধ্যে সঞ্চিত থাকে, বিশ্ববিধানের এ নিয়ম কোন রাজশক্তিই কোন দিন ব্যত্যয় করতে পারে না।

ভারতী বলিল, দাদা, তোমার কথা শুনলে গা কাঁপে। রাজশক্তিকে যে তুমি দক্ষ করতে চাও, তার ইন্ধন ত আমাদেরই দেশের লোক। এতকড় লস্কাকাণ্ডের কলনায় কি তোমার মনে করণাও জাগেনা ?

প্রত্যুত্তরে লেশমাত্র দ্বিধা নাই, ডাক্তার স্বছন্দে কহিলেন, না। প্রায়শ্চিত্ত কথাটা কি শুধু মুখেরই কথা ? পূর্ব পিতামহগণের যুগান্ত-দক্ষিত পাপের অপরিমেয় স্তূপ নিঃশেষ হবে কিসে বলতে পারো ? করুণার চেয়ে ক্রায়দর্ম্য ঢের বড় বস্তু ভারতী।

ভারতী বাথা পাইয়া বলিল, এ তোমার সেই পুরাণো কথা দাদা। ভারতের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তুমি যে কত নিষ্ঠুর হতে পারো তা যেন আমি ভাবতেই পারিনে। রক্তপাত ছাড়া আর কিছু যেন মনে তোমার জাগতেই পায় না। রক্তপাতের জবাব যদি রক্তপাতই হয়, তা হলে তারও ত জবাব রক্তপাত ? এবং তারও ত জবাবে এই একই রক্তপাত ছাড়া আর কিছু মেলেনা। এ প্রশ্নোত্তর ত সেই আদিম কাল থেকে হয়ে আস্চে। তবে কি মানবের সভ্যতা এর চেয়ে বড় উত্তর কোন দিন দিতে পারবে না ? দেশ গেছে, কিন্তু তার চেয়েও যে বড় সেই

মানুষ ত আজও আছে। মানুষে মানুষে কি হানা-হানি না ক'রে কোন মতেই পাশাপাশি বাস করতে পারে না ?

ডাক্তার কহিলেন, ইংরাজের একজন বড় কবি বলেছেন, পশ্চিম ও পূর্ব কোন দিনই মিলতে মিশতে পারেনা।

ভারতী কষ্ট হইয়া কহিল, ছাই কবি। বলুকগে সে। তুমি পরম জ্ঞানী, তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞেসা করেছি, আজও জিজ্ঞেসা করছি, হোক তারা পশ্চিমের, হোক তারা ইয়োরোপের মানুষ, কিন্তু তবু ত মানুষ ? মানুষের সঙ্গে মানুষে কি কিছুতেই বন্ধুত্ব করতে পারেনা ? দাদা, আমি ক্রীশ্চান, ইংরাজের কাছে আমি বড় ঋণে ঋণী, তাদের অনেক সদৃশ আমি নিজের চোখে দেখেছি,—তাদের এত মন্দ ভাবতে আমার বুকে শূল বেঁধে। কিন্তু আমাকে তুমি ভুল বুঝানো দাদা, আমি বাঙালী ঘরেরই মেয়ে,—তোমারই বোন। বাঙলায় মাটি, বাঙলায় মানুষকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি। কে জানে, যে জীবন তুমি বেছে নিয়েছ, হয়ত আজই আমাদের শেষ দেখা। আজ আমাকে তুমি শান্ত মনে এই জবাবটি দিয়ে যাও, যেন এরই দিকে চোখ রেখে আমি সারা জীবন মুখ তুলে দোজা চলে যেতে পারি। বলিতে বলিতে শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর কান্নার ভাবে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

ডাক্তার নীরবে তরী বাহিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া ভারতীর মনে হইল, বোধ হয় তিনি ইহার উত্তর দিতে চান না। সে এত বাড়াইয়া নদীর জলে চোখ মুখ ধুইয়া ফেলিল, অঞ্চল দিয়া বার-বার ভাল করিয়া মুছিয়া পুনরায় কি একটা প্রহ্ন করিতেছিল, ডাক্তার কণ্ঠ কহিলেন। স্নিগ্ধ মুহূ কণ্ঠ, কোথাও লেশমাত্র উত্তেজনা বা বিদ্বেষের আভাস নাই,—যেন কাহার কথা কে বলিতেছে এমনি শান্ত সহজ। ভারতীর সেই প্রথম পরিচয় দিনের স্কুলের নিরীহ নিকোঁধ মাষ্টার মহাশয়টিকে মনে পড়িল। অশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণ, ব্যাকরণও তেমনি

—ভারতী কষ্টে হাসি চাপিয়া আলাপ করিয়াছিল। পরে তাই লইয়া রাগ করিয়া সে ডাক্তারকে অনেক দিন অনেক তিরস্কার করিয়াছে। সেই নিকৃৎস্বক নিঃস্পৃহকণ্ঠে কহিলেন, এক রকমের সাপ আছে ভারতী, তারা সাপ গেয়েই জীবন ধারণ করে। দেখেচ ?

ভারতী বলিল, না, দেখিনি, শুনেচি।

ডাক্তার বলিলেন, পশুশালায় আছে। এবার কলকাতায় গিয়ে অপূর্বকে হুকুম কোরো, সে দেখিয়ে আনবে।

বার বার ঠাট্টা কোরো না দাদা, ভাল হবে না বল্চি।

না, ভাল হবে না আমিও তাই বল্চি। পাশাপাশি বাস করাটা ঠিক ঘটে ওঠে না বটে, কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠভাবে একজনের ঝঠরের মধ্যে আসে একজন বেশ নিরাপদেই স্থান পায়। বিশ্বাস না হয় জুর অধ্যক্ষকে ছিঙ্কানি করে দেখো।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার বলিলেন, তুমি তাদের সমদম্ভাবলখী, তাদের কাছে অশেষ অশেষ পুণে পুণী, তাদের অনেক সদৃশ্য চোখে দেখেচ,—দেখেচ তাদের বিংশগ্রামী বিরাট ক্ষুণ্ণ পরিমাণ ? এদেশের মালিক তারা,—মালিকানার তারিখ মনে আছে ত ? আজ ব্রিটিশ-সম্পদের তুলনা হয় না। কত জাহাজ, কত কল-কারখানা, কত শত সহস্র ইয়ারত। মাছুষ নারবার উপকরণ আয়োজনের আর অন্ত নেই। তার সমস্ত অভাব, সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটিয়েও ইংরেজ ১৮১০ সাল থেকে সত্তর বছরের মধ্যে কেবল বাইরে দিয়েছিল পান তিন হাজার কোটি টাকা! জানো এই বিরাট ঐশ্বর্যের উৎস কোথায় ? আপনাকে তুমি বাংলাদেশের মেয়ে বল্ছিলে না ? বাংলার মাটি, বাংলার জল-বায়ু, বাংলার মাছুষ তোমার প্রাণাধিক প্রিয় না ? এই বাংলার দশ লক্ষ নর-নারী প্রতিবৎসরে শুধু ম্যালেরিয়া জরে মরে। এক একটা বুদ্ধ জাহাজের দাম জানো ? এর একটার

থরচে কেবল দশ লক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়। ভেবেছ কখনো এ কথা? দেখেচ কখনো বুকের মধ্যে মায়ের মূর্তি? শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম গেল, জ্ঞান গেল,—নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠে, চাষা পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশীয় ছুয়ারে মজুরি করে,—দেশে জল নেই, অন্ন নেই, গৃহস্থের সর্বোত্তম সম্পদ সে গোধান নেই,—দুধের অভাবে শিশুদের শুকিয়ে মরতে দেখে ভারতী?

ভারতী চীৎকার করিয়া থামাইতে চাহিল, কিন্তু গলা দিয়া তাহার শুধু একটা অক্ষুট শব্দ বাহির হইল মাত্র।

সব্যসাচীর সেই বীর সংযত কর্ণস্বর কোন্ এক সময়ে অন্তর্হিত হইয়াছিল, বলিলেন, তুমি ক্রীস্টান, মনে পড়ে একদিন কৌতূহলবশে ইয়োরোপের ক্রীস্টান সভ্যতার স্বরূপ জানতে চেয়েছিলে? সেদিন বাথা দেবার ভয়ে বলিনি, কিন্তু আজ তার উত্তর দেব। তোমাদের কেতাবে কি আছে জানিনে, শুনেচি ভাল কথা ঢের আছে, কিন্তু বহুদিন এক সঙ্গে বসবাস করে এর সত্যকার চেহারা আর আমার এতটুকু অগোচর নেই। লজ্জাহীন উলঙ্গ স্বার্থ এবং পশু-শক্তির একান্ত প্রাধান্যই এর মূল মন্ত্র। সভ্যতার নাম দিয়ে দুর্বল, অক্ষমের বিরুদ্ধে এতবড় মূল্য মাহুষের বুদ্ধি আর ইতিপূর্বে আবিষ্কার করেনি। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখ, ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুদ্র পোক-এমন দুর্বল জাতিই আজ আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি। দেশে বাট, দেশের সম্পদ থেকে দেশের ছেলেরা বঞ্চিত হয়েছে কোন্ অপরাধে জানো ভারতী? একমাত্র শক্তিহীনতার অপরাধে। পথচ ত্রায়দশই সকলের বড়, এবং বিজিতের অশেষ কল্যাণের জন্তেই এই অধীনতার শৃঙ্খল তার পায়ে পরিয়ে সেই পজুর সর্বপ্রকার দায়িত্ব বহন করাই ইয়োরোপীয় সভ্যতার চরম কর্তব্য,—এই পরম অসত্য লেখায়, বক্তৃতায়

মিশনারির ধর্ম প্রচারে, ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে অবিশ্রান্ত প্রচার করাই তোমাদের ক্রীশ্চান সভ্যতার রাজনীতি।

ভারতী মিশনারির হাতে মানুষ, অনেকের মহৎ চরিত্র সে বথার্থই চোখে দেখিয়াছে; বিশেষতঃ তাহার ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি এইরূপ অহেতুক আক্রমণে সে ব্যথা পাইয়া বলিল, দাদা, যে জগ্নেই হোক তোমার শাস্ত বুদ্ধি আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ক্রীশ্চান-ধর্ম প্রচার করতে যারা এদেশে এসেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি। তাঁদের প্রতি তুমি আজ নিরপেক্ষ সুবিচার করতে পারছ না। ইউরোপীয় সভ্যতা কি তোমাদের কোন ভাল করেনি? সন্তীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, চড়কের সময়ে পিঠ ফোঁড়া, সম্মাসীদের খাঁড়ার ওপর লাফানো, ডাকাতি, ঠগি, বর্গির হাঙ্গামা, পৌড় ও খাসিয়ারদের আঘাতের নরবলি,—আর যে মনে পড়ছেন ভারতী—

ভারতী কথা কহিল না।

ডাক্তার বলিলেন, রোসো, আরও দুটো স্মরণ হয়েছে। বাদশাদের আমলে গৃহস্থের বৌ কি ঘরে রাখা যেত না,—নবাবেরা মেয়েদের পেট চিরে ছেলে-মেয়ে দেখতো,—হায় রে হায়, এমনি করেই বিদেশীর লেখা ইতিহাস সামান্য এবং তুচ্ছ বস্তুকে বিপুল, বিরাট তৈরী করে দেশের প্রতি দৈশের লোকের চিত্ত বিমুগ্ধ করে দিয়েছে! মনে আছে আমার ছেলেবেলায় স্কুলের পড়ার বইয়ে একবার পড়েছিলাম, বিলেতে বসে আমাদের কল্যাণ ভেবে ভেবেই কেবল রাজমন্ত্রী চোখের নিদ্রা এবং মুখের অন্ন বিষাদ হয়ে গেছে! এই সভ্য ছেলেদের কণ্ঠস্থ করতে হয়, এবং উদরাম্বের দায়ে শিক্ষকদের কণ্ঠস্থ করাতে হয়! সভ্য রাজ্যতন্ত্রের এই রাজনীতি ভারতী। আজ অপূর্বকে দোষ দেওয়া বৃথা! •

অপূর্বের লাজনায় মনে মনে ভারতী লজ্জিত হইল, কষ্ট হইল। কহিল, তুমি যা বল্চো তা' সত্য হতে পারে, হয়ত, কোথাও কেউ অতিভক্ত রাজকর্মচারী এমনিই করেছে, কিন্তু এতবড় সাম্রাজ্যের অসত্যই কখনো মূলনীতি হতে পারেনা। এর ওপরে ভিত্তি করে এই বিপুল প্রতিষ্ঠান একটা দিনের তরেও স্থির থাকতে পারেনা। তুমি বল্বে কালের পরিমাণে এ কটা দিন? এমনি সাম্রাজ্য ত ইতিপূর্বেও ছিল, সে কি চিরস্থায়ী হয়েছে? তোমার কথা যদি সত্য হয়, এও চিরস্থায়ী হবেনা। কিন্তু, এই শঙ্কলাবদ্ধ, স্তূনিয়ন্ত্রিত রাজ্য,—যত নিষেই করনা কেন,—এর ঐক্য, এর শান্তি থেকে কি কোন শুভ লাভই হয়নি? প্রতীচ্যের সভ্যতার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কি কোন হেতুই পাওনি? স্বাধীনতা তোমরা ত বহুদিন হারিয়েছ, ইতিমধ্যে রাজশক্তির পরিবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ত হয়নি। ক্রীষ্টান বলে আমাকে তুমি উঁচু বুঝোনা দাদা, কিন্তু নিজেদের সমস্ত অপরাধ বিদেশীর মাথায় তুলে দিয়ে গ্লানি করাই যদি তোমার স্বদেশপ্রেমের আদর্শ হয়, সে আদর্শ তোমার হাত থেকেও আমি নিতে পারবনা। এত বিদেহ হৃদয়ের মধ্যে পুরে তুঁতের পত্রের ক্ষতি হয়ত করতেও পারো, কিন্তু তাতে ভারতবাসীর কল হবেনা এ সত্য নিশ্চয় জেনো।

তাহার সহসা উচ্ছ্বসিত তীক্ষ্ণ স্বর নিশ্চক নদীবক্ষে আঘাত হইয়া সবাসাচারী কানে পশিয়া তাহাকে চমকিত করিয়া দিল। তাঁর এই রূপ অপরিচিত, এ মনোভাব অপ্রত্যাশিত। তথাপি যে ধর্ম-বিশ্বাস ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ প্রভাবের মধ্যে সে বালিকা বদস হইতে মাছুষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই আঘাতে চঞ্চল ও অসহিবু হইয়া সে এই যে নিভীক প্রতিবাদ করিয়া বসিল, তাহা যত কঠিন ও প্রতিকূল হোক, সবাসাচারী চক্ষে তাহাকে ঘেন নব মধ্যাদা দান করিল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভারতী বলিল, কই জবাব দিলেনা দাদা ?
এতবড় হিংসের আগুন বুকের মধ্যে জালিয়ে তুমি আর যাই কর
দেশের ভালো করতে পারবেনা।

ভাত্তর কহিলেন, তোমাকে ত অনেকবার বলেছি দেশের ভালো
করা করবেন তাঁরা চাঁদা তুলে দিকে দিকে অনাথ-আশ্রম, ব্রহ্মচর্যাশ্রম,
বেদান্ত-আশ্রম, দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য করছেন,
মহৎ লোক তাঁরা, আমি তাঁদের ভক্তি করি,—কিন্তু, দেশের ভালো
করার ভার আমি নিইনি, আমি স্বাধীন করার ভার নিয়েছি।
একটুখানি থামিয়া বলিলেন, আমার বুকের আগুন নেভে শুধু ছোটো
জিনিস দিয়ে। এক নিজের চিত্তভঞ্জে আর নেভে যে দিন গুনবো
ইয়োরোপের ধর্ম, সভ্যতা, নীতি, সমুদ্রের অতল গর্ভে ডুবেছে।

ভারতী শুক হইয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই
বিবকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সওদা নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে ইয়োরোপ যখন প্রথম
ব্যাসাত করতে এসেছিল, তখন চিন্তে পেরেছিল কেবল জাপান।
তাই আজ আর এত সৌভাগ্য, তাই আজ সে ইয়োরোপের সমকক্ষ
সদ্বাস্ত মিতা। কিন্তু চিন্তে পারেনি ভারত, চিন্তে পারেনি চীন।
তখন স্পেনের রাজ্য পৃথিবীময়, ক্ষুদ্র জাপান স্পেনের এক নাবিককে
জিজ্ঞাসা করে, এত রাজ্য হল তোমাদের কি করে? নাবিক বললে,
অতি সহজে, যে দেশ আক্রমণ করতে চাই, সেখানে নিয়ে যাই প্রথমে
নাহু, হাতে পাঁয়ে পড়ে ব্যবসার জন্তে দেশের রাজার কক্ষ চেয়ে নিই
এক ফোটা জমি। তার পরে আমি মিশানারি, তারা যত না করে
ক্ষীণতান, তার বেশি করে সে দেশের ধর্মকে গালিগালাজ। লোকে
ফেপে উঠে হঠাৎ ফেলে ছ একটাকে মেরে। তখন আসে আমাদের
কামান বন্দুক, আসে আমাদের সৈন্য-সামন্ত। আমাদের সভ্য
দেশের মাহুষ-মারা কল যে অসভ্য দেশের চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ তা অচিরে

প্রমাণিত করে দিই। শুনে জাপান বললে, প্রভু! আপনারা তা'হলে গা তুলুন, আমাদের আর ব্যবসাতে কাজ নেই। এই বলে তাদের বিদায় দিয়ে নিজেদের দেশের মধ্যে আইন জারি করে দিলে,— চন্দ্র-সূর্য্য যতদিন উদয় হবে ক্রীষ্টান যেন না আর আমাদের দেশে পদ দেয়। দিলে তার প্রাণদণ্ড।

তাহার ধর্ম ও ধর্মযাজকের প্রতি এই তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে ভারতী বিষম হইয়া বলিল, এ কথা তোমার কাছে আমি পূর্বেও শুনেছি, কিন্তু যে জাপানীদের তুমি ভক্তি কর, তারা কি?

ডাক্তার কহিলেন, ভক্তি করি? মিছে কথা। ওদের আমি ঘৃণা করি। কোরিয়ানদের বার বার প্রতিশ্রুতি এবং অভয় দিয়েও বিনা দোষে, মিথ্যা অজুহাতে তাদের রাজাকে বন্দী করে ১৯১০ সালে যখন কোরিয়া রাজা আত্মসং করে নিলে তখন আমি সাংহাইয়ে। সে দিনের সে সব অমানুষিক অত্যাচার ভোলবার নয়, ভারতী। আর অভয় কি শুধু একা জাপানই দিয়েছিল? ইয়োৰোপও দিয়েছিল। শক্তিমানের বিরুদ্ধে ইংরাজ কথা কইলে না, বললে এ্যাঙ্লো-জাপানী-সন্ধি-সূত্রে আমরা আবদ্ধ। এবং সেই কথাই আমেরিকা-যুক্তরাজ্যের সভাপতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বল্লেন, প্রতিশ্রুতি তা কি। যে অক্ষম, শক্তিহীন জাতি আত্মরক্ষা করতে পারেনা তাদের রাজা যাবেনা ত যাবে কাদের? ঠিকই হয়েছে। এখন আমরা যাবো ভারত উদ্ধার করতে? অসম্ভব! পাগলামি! এই বলিয়া সর্বাসাচী ভারত মোন থাকিয়া কহিলেন, আমিও বলি ভারতী,—অসম্ভব, অসঙ্গত, পাগলামি। প্রবল ছুর্কলের সম্পদ কেন ছিনিয়ে নেবেনা, এ কথা যে সভ্য ইয়োৰোপের নৈতিক-বুদ্ধি ভাবতেই পারেনা।

ভারতী নির্বাক হইয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আঠারো শতাব্দের শেষের দিকে ব্রিটিশদূত লর্ড ম্যাকাটনি এলেন চৈনিক দরবারে

কিঞ্চিৎ ব্যবসার সুবিধে করে নিতে। মাধুরাজ শিনলুঙ ছিলেন তখন সমস্ত চীনের সম্রাট, অত্যন্ত দয়ালু, দুতের বিনীত আবেদনে খুসি হয়ে আশীর্বাদ করে বল্লেন, দেখ বাপু, আমাদের স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে অভাব কিছুই নেই, কিন্তু তুমি এসেছ অনেক দূর থেকে, অনেক দুঃখ নিয়ে। আচ্ছা, ক্যান্টন সহরে ব্যবসা কর, স্থান দিচ্ছি, তোমাদের ভাল হবে। রাজ-আশীর্বাদ নিফল হোলোনা, ভালই হোলো। পঞ্চাশ বছর পেরুলনা, চীনের সঙ্গে ইংরাজের প্রথম যুদ্ধ বাধলো।

ভারতী বিস্মিত হইয়া কহিল, কেন দাদা ?

ডাক্তার কহিলেন, চীনেরই অত্যাচার। বেঘাদপ হঠাৎ বলে বোসলো আফিঙ খেয়ে খেয়ে চোখ কান আমাদের বুজে গেল, বুদ্ধিশুদ্ধি আর নেই, দয়া করে গু-জিনিমটার আমদানি বন্ধ কর।

তারপরে ?

তার পরের ইতিহাস খুব ছোট। বছর দুয়ের মধ্যে পুনশ্চ আফিঙ খেতে রাজি হয়ে, আরও পাঁচখানা বন্দরে শতকরা পাঁচটাকা মাত্র শুষ্ক বাণিজ্যের মঞ্জুরি পরোয়ানা দিয়ে, এবং সর্বশেষে হডকঙ বন্দর দক্ষিণা প্রদান করে বেয়াজিশ সালে যজ্ঞ সমাপ্ত হল। ঠিকই হয়েছে। এত সস্তায় আফিঙ পেয়েও যে মুখ খেতে আপত্তি করে তার এমনি প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই উচিত।

—ভারতী বলিল, এ তোমার গল্প।

ডাক্তার কহিলেন, তা হোক, গল্পটা শুনতে ভালো। আর এই না দেখে ফ্রান্সের ফরাসী সভ্যতা বল্লে, আমার ত আফিঙ নেই, কিন্তু, বাসা মাছুষ-মারা কল আছে। অতএব, যুদ্ধং দেহি। হল যুদ্ধ। ফরাসী চীন সাম্রাজ্যের আনাম প্রদেশটা কেড়ে নিলে। আর যুদ্ধের খরচা, অধিকতর বাণিজ্যের সুবিধে, টিটিপোর্ট ইত্যাদি ইত্যাদি—এসব তুচ্ছ কাহিনী থাক।

ভারতী কহিল, কিন্তু দাদা তালি কি একহাতে বাজে ? চীনের অগ্নায় কি কিছু ছিলনা ?

ডাক্তার বলিলেন, থাকতে পারে। তবে তামাসা এই ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নায় বোধটা অপরের ঘর চড়াও হয়েই হইবে। এদের নিজেদের দেশের মধ্যে ঘটতে দেখা যায় না।

তারপরে ?

বল্চি। জার্মান সভ্যতা দেখলেন, বা রে বাঃ, এটা জারি মজা। আমি যে কাকে পড়ি। তিনি এক জাহাজ মিশানারি করে লেনিয়ে দিলেন। ৯৭ সালে তাঁরা যখন তোমাদের প্রভু যিশুর মহিমা শাস্তি এবং গ্রায়দর্শ প্রচারে ব্যাপৃত, তখন একদল চীনে ক্ষেপে উঠে পরম ধার্মিক জন দুই প্রচারকের মুণ্ড ফেললে কেটে। অগ্নায় ! চীনেরই অগ্নায়। অতঃপর গেল স্তানটঙ্ক প্রদেশ জার্মানির উদয়-বিবরে। তখনও এল বন্ধার-বিহ্বোল। ইয়োরোপের সমস্ত সভ্যতা এক হয়ে তার যে প্রতিশোধ নিলে, হয়ত, কোথাও তার আর তুলনা নেই। তার অপরিমেয় ধোয়াপতের স্বপ্ন কতকালে যে চীনেরা শোধ দেবে তা যিশুখৃষ্টই জানেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ দিংহ, জাপানের ভালুক, জাপানের সুম্যাদেব,—কিন্তু আর না বোন, গলা আমার শুকিয়ে আস্চে। দুঃখের তুলনায় একা আমরা ছাড়া বোধ হয় এদের আর সঙ্গী নেই ! সম্রাট শিন্‌লুঙের নিষ্ঠুর লাভ হোক, তাঁর আশীর্বাদের বহর আছে !

ভারতী মস্ত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ভারতী !

কি দাদা ?

চুপ্‌চাপ্‌থে ?

তোমার গল্পের কথাটাই ভাব্চি। আচ্ছা দাদা, এই জগেই কি চীনেদের দেশে তোমার কার্যক্ষেত্র বেছে নিয়েছ ? যারা শত অত্যাচারে

জরুরিত, তাদের উত্তেজিত করে তোলা কঠিন নয়, কিন্তু একটা কথা কি ভেবেচ ? এইসব নিরীহ, অজ্ঞান চাষাভূষার দুঃখ এমনিই ত যথেষ্ট, তার ওপর আবার কাটাকাটি রক্তরক্তি বাধিয়ে দিলে ত সে দুঃখের আর অবধি থাকবে না !

ডাক্তার কহিলেন, নিরীহ চাষাভূষার জন্তে তোমার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই, ভারতী, কোন দেশেই তারা স্বাধীনতার কাজে যোগ দেয়না। বরঞ্চ, বাধা দেয়। তাদের উত্তেজিত করার মত পণ্ডশ্রমের সময় নেই আমার। আমার কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র সন্তানদের নিয়ে। কোনদিন যদি আমার কাজে যোগ দিতে চাও ভারতী, একথাটা ভুলোনা। আইডিয়ার জন্তে প্রাণ দিতে পারার মত প্রাণ, শান্তিপ্রিয়, নিবিরোধী, নিরীহ কৃষকের কাছে আশা করা বুধা। তারা স্বাধীনতা চায়না, শান্তি চায়। যে শান্তি অক্ষম, অশক্তের,—সেই পদুর জড়ত্বই তাদের চের বেশি কামনার বস্তু।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, আমিও তাই চাই দাদা, আমাকে বরঞ্চ এই জড়ত্বের কাছেই তুমি নিযুক্ত করে দাও, তোমার পথের-দাবীর সত্যত্বের বাপ্পে নিঃশ্বাস আমার ক্লান্ত হয়ে আস্চে।

নর্যাসাচী হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা।

ভারতী থামিত পারিল না, তেমনি ব্যগ্র উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, ও একটা আচ্ছার বেশি যার কি তোমার কিছুই বলবার নেই দাদা ?

কিন্তু আমরা যে এসে পড়েছি ভারতী, একটুখানি সাবধানে বোমো দিদি, যেন আঘাত না লাগে—এই বলিয়া ডাক্তার ফিঙ্গারহস্তে হাতের দাঁড় দিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহার ছোট নৌকাখানিকে অন্ধকার তীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া হাত বরিয়া তাকে নামাইতে নামাইতে বলিলেন, জলকাদা নেই বোন, কাঠ পাতা আছে, পা দাও।

অন্ধকারে অজানা ভূপৃষ্ঠে হঠাৎ পা ফেলিতে ভারতীর দ্বিধা হইল, কিন্তু পা দিয়া সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, দাদা, তোমার হাতে আত্ম-সমর্পণ করার মত নিবিয় স্বস্তি আর নেই,—

কিন্তু অপর পক্ষ হইতে এ মন্তব্যের উত্তর আসিল না। উভয়ে অন্ধকারে কিছুদূর অগ্রসর হইলে ডাক্তার বিস্ময়ের কণ্ঠে কহিলেন, কিন্তু ব্যাপার কি বলত? এ কি বিয়ে বাড়ী? না আছে আলো, না আছে চীৎকার—না শোনা যায় বেহালার স্বর,—কোথাও গেল নাকি এরা?

আরও কিছুদূর আসিয়া চোখে পড়িল, সিঁড়ির উপরের সেই চিত্র-বিচিত্র কাগজের লণ্ঠন। ভারতী আশ্বস্ত হইয়া কহিল, ঐ যে সেই চীনে-আলো। এর মধ্যেই খরচের হুঁসিয়ারিটা শশি-তারার দেখবার বস্তু, দাদা। এই বলিয়া সে হাসিল।

দুজনে সিঁড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিতেই খোলা দরজার সম্মুখে প্রথমেই চোখে পড়িল,—শশী মন দিয়া কি একখানা কাগজ পড়িতেছে। ভারতী আনন্দিত কলকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, শশিবাবু, এই যে আমরা এসে পড়েছি,—খাবার বন্দোবস্ত করুন, নবতারা কই? নবতারা! নবতারা!

শশী মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আসুন। নবতারা এখানে নেই।

ডাক্তার স্নিতমুখে কহিলেন, গৃহিণী-শূণ্য গৃহ কি রকম কবি? ডাক্তার তাকে, আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাক, নইলে দাঁড়িয়ে থান। হত খাবোও না।

শশী বিষন্নমুখে বলিল, নবতারা এখানে নেই ডাক্তার। তারা সব বেড়াতে গেছে।

সহসা তাহার মুখের চেহারা ভীত হইয়া ভারতী প্রশ্ন করিল, কোথায় বেড়াতে গেলো? আজকের দিনে? কি চমৎকার বিবেচনা!

শশী বলিল, তারা বিয়ের পরে রেঙ্গুনে বেড়াতে গেছে। না না, আমার সঙ্গে নয়,—সেই যে আহমেদ,—ফর্সা মতন,—চমৎকার দেখতে,—কুট নাহেবের মিলের টাইম-কিপার,—দেখেছেন না? আজ দুপুরবেলা তারই সঙ্গে নবতারার বিয়ে হয়েছে। সমস্তই তাদের ঠিক ছিল আমাকে বলেনি।

আগন্তুক দুইজনে বিষয়-বিস্তারিতচক্ষে চাহিয়া রহিলেন,—বল কি শশী?

শশী উঠিয়া গিয়া ঘরের একটা নিভৃত স্থান হইতে একটা ছাকড়ার থলি আনিয়া ডাক্তারের পায়ে কাছের রাখিয়া দিয়া কহিল, টাকা পেয়েছি ডাক্তার। নবতারাকে পাঁচ হাজার দেব বলেছিলাম, দিবে দিয়েছি। বাকি আছে সাড়ে চার হাজার, পঞ্চাশ টাকা আমি নিলাম কিন্তু—

ডাক্তার কহিলেন, এই টাকা কি আমাকে দিচ্ছ?

শশী কহিল, হাঁ। আমার আর কি হবে? আপনি নিম্ন। কাজে লাগবে।

ভারতী ত্রিভাসা করিল, কিন্তু তাকে কবে টাকা দিলেন?

শশী কহিল, কাল টাকা পেয়েই তাকে দিয়ে এসেছি।

মিলে?

শশী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ। আমেদ ত মোটে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। তারা একটা বাড়ী কিনবে।

নিশ্চয়ই কিনবে! এই বলিয়া ডাক্তার সহাস্তে ফিরিয়া দেখিলেন, চোখে আঁচল দিয়া ভারতী বারান্দার একদিকে নিঃশব্দে সরিয়া বাইতেছে।

শশী কহিল, প্রেসিডেন্ট আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছেন।

তিনি স্বরাবায়ায় চলে যাচ্ছেন।

ডাক্তার বিষয় প্রকাশ করিলেন না, তবু প্রশ্ন করিলেন, কবে যাবেন ? শশী কহিল, বললেন ত শীঘ্রই । তাঁকে লোক এসেছে নিতে ।

কথা ভারতীর কানে গেল, সে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সুমিত্রাদিদি কি সত্যিই চলে যাবেন বলেছেন শশীবাবু ?

শশী বলিল, হাঁ সত্যি । তাঁর মায়ের খুড়োর অগাধ সম্প্রতি । সম্প্রতি মারা গেছেন,—ইনি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর কেউ নেই । তাঁর না গেলেই নয় ।

ডাক্তার কহিলেন, না গেলেই যখন নয়, তখন যাবেন বই কি ।

শশী ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, অনেক খাবার আছে, খাবেন কিছু ? কিন্তু ভারতীর ইতস্ততঃ করিবার পূর্বেই ডাক্তার সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়,—চল, কি আছে দেখিগে । এই বলিয়া তিনি শশীর হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তাহাকে ঘরের ভিতরে টানিয়া লইয়া গেলেন । যাবার পথে শশী আস্তে আস্তে বলিল, আর একটা খবর আছে ডাক্তার, অপূর্ববাবু ফিরে এসেছেন ।

ডাক্তার বিষয়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সে কি শশি, কে বলল তোমাকে ?

শশী কহিল, কাল বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একেবারে মুখোমুখি দেখা । তাঁর মা নাকি বড় পীড়িত ।

(২৭)

শশী অতিশয়োক্তি করে নাই । ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখা গেল খাজ-বস্তুর অত্যন্ত বাহুল্যে ঘরের দক্ষিণ ধারটা একেবারে ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে । ছোট বড় ডেকুচি, থেট, কাগজের ঠোঙা, মাটির বাসন পরিপূর্ণ করিয়া নানাবিধ আখ্যা প্রখ্যস্তার লোকানদার ও গোটেলওয়ালার দল নিজেদের রুচি ও মজি মত গুপার হইতে এপারে অবিশ্রাম সরবরাহ করিয়া গুপাকার করিয়াছে,—অভাব বা ক্রটি

কিছুরই ঘটে নাই, ঘট যাচ্ছে কেবল সেগুলি উদরসাৎ করিবার লোকের! ডাক্তার স্বর্ণকালমাত্র নিরীক্ষণ করিয়াই সোলাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তোফা! তোফা! চমৎকার! শশী কি হিসেবী লোক দেখেচ ভারতী, কে কি থাকে না-থাকে সমস্ত চিন্তা করে দেখেচে! বহুং আচ্ছা!

ভারতী অগ্র দিকে চাহিয়া রহিল, এবং শশী হাসিবার একটুখানি বিকল চেষ্টা করিল মাত্র। কোন দিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়াও ডাক্তারের উল্লাস অকস্মাৎ অটহাস্তে ফাটিয়া পড়িল, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গৃহস্থের জয়জয়কার হোক,—শশী! কবি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ভারতী আর সহিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া সজলচক্ষে রুষ্ট দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, তোমার মনের মধ্যে কি একটু দয়া-মায়াও নেই দাদা? কি কোব্চ বলত?

বাঃ! যাদের কল্যাণে আর ভাল ভাল জিনিস পেট পুরে খাবো,— তাদের একটু আশীর্বাদ—বাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ভারতী রাগ করিয়া বাহান্দায় চলিয়া গেল। মিনিট দুই তিন পরে শশী গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিলে সে প্রেটে করিয়া মাংস, পোলাও, ফল-মূল, মিষ্টান্নাদি সমস্তে সাজাইয়া ডাক্তারের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কৃত্রিম কুণ্ঠিত্ববে কহিল, নাও, এবার দশ হাত বার করে বাফসের মত খাও। হাসি বন্ধ হোক, পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে যাবে।

ডাক্তার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আহা! উপাদেয় খাদ্য! এর স্বাদ গন্ধও ভুলে গেছি।

কথাটা ভারতীর বুক গিয়া বিঁধিল। তাহার সে রাগের শুক্ল ভাস ও পোড়া-মাছের কথা মনে পড়িল।

ডাক্তার আহারে নিযুক্ত হইয়া কহিলেন, কবিকে দিলেনা ভারতী?

এই যে দিচ্চি, এই বলিয়া সে প্রেট সাজাইয়া আনিয়া শশীর কাছে

রাখিয়া দিয়া ডাক্তারের সম্মুখে বসিয়া বলিল, কিন্তু সমস্ত খেতে হবে দাদা, ফেলতে পারবে না।

নাঃ—কিন্তু, তুমি খাবেনা?

আমি? কোন মেয়েমানুষ এ সব খেতে পারে? তুমিই বল?

কিন্তু রোঁধেছে খেন অমৃত!

ভারতী কহিল, এর চেয়ে ভাল অমৃত রোঁধে আমি রোজ রোজ তোমাকে খাওয়াতে পারি দাদা।

ডাক্তার বাঁ হাতটা নিজের কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, কি করবে দিদি, অদৃষ্ট! যাকে খাওয়াবার কথা, সে এসব খাবেনা, যে খাবে, তাকে একদিনের ওপর দুদিন খাওয়াবার চেষ্টা করলেই স্থখ্যাতিতে তোমার দেশ ভরে যাবে। ভগবানের এমনি উল্টো বিচার! কি বল কবি, ঠিক না? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

এবার ভারতী নিজেও হাসিয়া ফেলিল; কিন্তু তৎক্ষণাত্ আপনাকে সম্বরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, তোমার ছুটুমির জ্বালায় না হেসে পারা যায় না, কিন্তু এ তোমার ভারি অগাধ। তার পরে পেট পূরে খেয়ে দেয়ে টাকার খলিটিও নিয়ে চলে যাবে না কি?

ডাক্তার মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া কহিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়,—অন্ধেকটা ত গেছে নবতারার বাডী তৈরির খাতায়, বাকিটা কি রেখে যাবো আহমেদ-আবদুল্লা সাহেবের গাড়ি-জুড়ি কিমতে? তামাসা সাহেব-জন্মের করুতে নেহাৎ মন্দ পরামর্শ দাওনি ভারতী। কি বলি? হাঃ হাঃ হাঃ—

ভারতী বলিল, দাদা, তোমাকে হাসি-ঠাট্টা করতে আগেও দেখেছি বটে, কিন্তু, এমন ক্ষাপার মত হাসিতে আর কখনো দেখিনি।

ডাক্তার জবাব দিতে বাইতেছিলেন, কিন্তু ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা কিছু বলিতে পারিলেন না। ভারতী পুনশ্চ কহিল,

নর-নারীর ভালবাসা কি তোমারি মত সকলের উপহাসের বস্তু যে, তাদের ছক্কা পঞ্জা হারার মত এর হার-জিতে অটুহাসি করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই? স্বাধীনতা পরাধীনতা ছাড়া মানুষের ব্যথা পাবার কি দুনিয়ায় কিছুই তুমি ভাবতে পারবে না? দেখ ত একবার শশীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। একটা বেলার মধ্যে উনি কি হয়ে গেছেন। অপূর্ববাবু যখন চলে গেলেন, সেদিন আমাকে উপলক্ষ করেও হয়ত তুমি এমনি করেই হেসেছ।

না, না, সে হল—

ভারতী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না বলছো কিসের জগ্গে দাদা? শশীবাবু তোমার স্নেহের পাত্র, তুমি এই ভেবেই খুঁদি হয়ে উঠেছ যে, নির্দোষ তাঁকে ফাঁদের মধ্যে ফেলে নবতারা অনেক দুঃখ দিত। ভবিষ্যতের সেই দুঃখের হাত থেকে তিনি এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎই কি মানুষের সব? আজকের এই একটিমাত্র দিন যে ব্যথার ভায়ে তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎকে ডিঙিয়ে গেল এ তুমি কি করে জানবে বল? তুমি ত কখনো ভালোবাসোনি।

শশী অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে কোন মতে বলিতে চাহিল যে তাহারই অগাধ, তাহারই ভুল, সাংসারিক সাধারণ বুদ্ধি না থাকার জন্যই—

ভারতী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, লজ্জা কিসের শশীবাবু? এ ভুল কি সংসারে একা আপনিই করেছেন? আপনার শতগুণ ভুল আমি করিনি? তারও সহস্রগুণ বেশি ভুল করে যে ছুঁভাগিনী নিঃশব্দে এ দেশ ছেড়ে চিরদিনের জগ্গে চলে যেতে উগত হয়েছে, তাকে কি ডাক্তার চেবেন না? নবতারা ঠিকিয়েছে?, ঠিকাক্ না। তবু ত আমাদেরই বঞ্চনার গান গেয়ে জগতের অর্দ্ধেক কাব্য অমর হয়ে আছে।

ডাক্তার বিস্মিতচক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন, কিন্তু ভারতী গ্রাহ

করিল না। বলিতে লাগিল, শশিবাবু, সাংসারিক বুদ্ধি আপনার কম? কিন্তু আমার ত কম ছিলনা? স্মিত্রাদিদির বুদ্ধির তুলনাই হয়না! অথচ, কিছুই ত কারও কাছে লাগেনি। এ শুধু পরাভূত হল, দাদা, তোমার বুদ্ধির কাছে। যে চিরদিন অজেয়, পথ যার কখনো বাধা পায়নি, সেও তোমারই পাষণ-দ্বারে কেবল আছাড় খেয়ে থান্ থান্ হয়ে পড়ে গেল,—প্রবেশ করবার এতটুকু পথ পেলেন না!

ডাক্তার এ অভিযোগের উত্তর দিলেন না, শুধু তাহার মুখপানে চাহিয়া একটুখানি হাসিলেন। ভারতী বলিল, শশিবাবু, আমি আপনার প্রতি মহা অপরাধ করেছি, আজ তার ক্ষমা চাই—

শশী বুঝিতে পারিলনা, কিন্তু কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ভারতী নিমেষ-মাত্র মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, একদিন দাদার কাছে বলেছিলাম, কোন মেয়েমানুষেই কোনদিন আপনাকে ভালবাসতে পারেনা। সেদিন আপনাকে আমি চিনিনি। আজ মনে হচ্ছে অপূর্ববাবু! যে ভালবেসেছিল সে আপনাকে পেলে দত্ত হয়ে যেতো। সবাই আপনাকে উপেক্ষা করে এসেছে, শুধু একটি লোক করেনি, সে এই ডাক্তার।

ডাক্তার অধোমুখে এক টুকরা মাংস হইতে হাড় পৃথক করিবার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, মুখ তুলিবার অবকাশ পাইলেন না। ভারতী তাঁহাকে সন্ধান করিয়া কহিল, দাদা, মানুষকে চিনে নিতে তোমার ভুল হয়না, তাই সেদিন দুঃখ করে আমার কাছে বলেছিলে, শশী! আর কাউকে ভালবাসত! কিন্তু একটা দিনও কি তুমি আমাকে সাবধান করে বলে দিতে পারতে না, ভারতী, এতবড় ভুল তুমি কোরোনা! পুরুষের হুই আদর্শ তোমরা দুজনে আমার সন্মুখে বসে, —আজ আমার বিতৃষ্ণার আর অবধি নেই!

ডাক্তার মাংসখণ্ড মুখে পুরিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অপূর্ব কি বললে শশী?

জবাব দিল ভারতী। কহিল, মা পীড়িত। চিকিৎসার প্রয়োজন, অতএব, টাকা চাই। ফিরে এসে লুকিয়ে গোলামি করলে কেউ জানতে পারবেনা! ভয় তলওয়ারকরকে, ভয় ব্রজেন্দ্রকে। কিন্তু, কাকা পুলিশ কর্মচারী,—সে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে দাদা। তুমি আমিও বোধ হয় এখন আর বাদ যাবো না। ক্ষুদ্র! লোভী! সন্দীর্ণ-চিত্ত ভীক! ছি!

ভাস্কর মুচকিয়া হাসিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, বথার্থ ভাল না বাসলে এমন প্রাণ খুলে যশোগান করা যায়না। কবি এবার তোমার পালা। বাগ্‌দেবীকে স্মরণ করে তুমি এবার নবতারার গুণকীর্তন শুরু কর,—আমরা অবহিত হই!

ভারতী চকিত হইয়া কহিল, দাদা, তুমি আমাকে তিরস্কার করলে?

ভাস্কর ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে হয়ত।

অভিমানে, ব্যথায়, ক্রোধে ভারতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি কখনো আমাকে বক্তে পাবে না। ভেবেছ, সবাই শশীবাবুর মত মুখ বুজে সইতে পারে? তুমি কি জানো কি হয় মাল্‌য়ের! উচ্ছৃঙ্খিত বেদনায় কণ্ঠস্বর তাহার অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, তিনি ফিরে এসেছেন, এবার আমাকে তুমি কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাও দাদা,—আমি এ কোন্‌ দুর্ভাগ্যের পায়ে আমার সমস্ত বিসর্জন দিয়ে বসে আছি! বলিতে বলিতেই মেঝের উপর মাথা রাখিয়া ভারতী ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

ভাস্কর স্থিতমুখে নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। তাহার নিবিকার ভাব দেখিয়া মনে হয়না যে, এই সকল প্রণয় উচ্ছ্বাস তাহাকে লেশমাত্র বিচলিত করিয়াছে। মিনিট পাঁচ সাত পরে ভারতী উদ্ভিয়া পাশের ঘরে গিয়া চোয় মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া বথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আর তোমাদের কিছু দেব?

ডাক্তার পকেট হইতে ক্রমাল বাহির করিয়া বলিলেন, বামুনের ছেলে, কিছু ছাঁদা বেঁধে দাও, দিন দুই যেন নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ময়লা রুমালটা ফিরাইয়া দিয়া ভারতী খোঁজ করিয়া একখানা দেয়া তোয়ালে বাহির করিল, এবং রকমারি খাচবস্ত্রর একটি পুটলি বাহিয়া ডাক্তারের পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এই ত হল বামুনের ছেলের জাঁদা। আর ঐ টাকার ছোট থলিটি ?

ডাক্তার সহজে কহিলেন, এটি হল বামুনের ছেলের ভোজন দক্ষিণা।

ভারতী বলিল, অর্থাৎ তুচ্ছ বিবাহ ব্যাপারটা ছাড়া আসল দরকারি কাজগুলো সমস্তই নিবিঘ্নে সমাপ্ত হল।

অকস্মাৎ, হাঃ হাঃ—করিয়া আরম্ভ করিয়াই ডাক্তার সজোরে হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া হাসি থামাইতে শরীর হইয়া কহিলেন, কি যে ভগবানের অভিশাপ, ভারতী, হামুতে এই মুখ দিয়ে আমার অটুহাসি ছাড়া আর কিছু বার হতেই চায়না। উকাল কাঁদবার জন্তে তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে এলে আজ মুখ দেখ নাই ভার হোতো।

দাদা, আবার জ্বালাতন কোরচ ?

জ্বালাতন কর্চি ? আমি ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা কর্চি

ভারতী রাগ করিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইল, জবাব দিল

শশী বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এতক্ষণে কথা কহিল। অকস্মাৎ অতিশয় গাঙ্গীখ্যের সহিত বলিল, আপনি যদি রাগ না করেন ত একটা কথা বলতে পারি। কেউ কেউ ভয়ানক সন্দেহ করে যে, আপনার সঙ্গেই একদিন ভারতীর বিবাহ হবে।

ডাক্তার মুহূর্তের জন্ত চমকিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসমরণ করিয়া উল্লানভরে বলিয়া উঠিলেন, বল কি হে শশি, তোমার মুখে

কুল-চন্দন পড়ুক, এমন সুদিন কি কখনো এতবড় দুর্ভাগ্য অদৃষ্টে হবে ? এ যে স্বপ্নের অতীত, কবি !

শশী কহিল, কিন্তু অনেকে ত তাই ভাবেন।

ভক্তার কহিলেন, হায় ! হায় ! অনেকে না ভেবে যদি একটি মাত্র লোক একটি পলকের জগৎ ভাবতেন !

ভারতী হাসিয়া ফেলিল। মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দুর্ভাগ্য ভাগ্য ত একটি পলকেই বদলাতে পারে দাদা। তুমি ছকুম করে যদি বল, ভারতী, কালই আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে, আমি তোমার দিবা করে বল্চি, বোলব না যে আর একটা দিন সবুজ কর।

ভক্তার কহিলেন, কিন্তু অপূৰ্ণ বেচারী যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ফিরে এল, তার উপায়টা কি হবে ?

ভারতী বলিল, তার কনে বৌ দেশে মজুদ আছে, তার জগ্নে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তিনি বুক ফেটে মারা যাবেন না।

ভক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাও, তোমার ভরসা ত কম নয় ভারতী !

ভারতী কহিল, তোমার হাতে পোড়ব তার আর ভয়টা কিসের ?

ভক্তার শশীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, শুনে রেখো কবি। ভবিষ্যতে যদি অস্বীকার করে তোমাকে দাফী দিতে হবে।

ভারতী বলিল কাউকে দাফী দিতে হবে না দাদা, আমি তোমার নানি নিয়ে এত বড় শপথ কখনো অস্বীকার কোরব না। শুধু তুমি স্বীকার করলেই হয়।

ভক্তার কহিলেন, আচ্ছা দেখে নেবো তখন।

দেখো। এই বলিয়া ভারতী হাসিয়া কহিল, দাদা, আমিই বা কি আর সুমিত্রাই বা কি,—স্বর্গের ইন্দ্রদেব যদি উর্ধ্বশী মেনকা রত্নাকে ডেকে বলতেন, সেকালের মুনি-ঋষিদের বদলে তোমাদের একালের—

সবাসাচীর তপস্যা ভঙ্গ করতে হবে ত আমি নিশ্চয় বল্টি দাদা, মুখে কালি মেখে তাঁদের ফিরে যেতে হতো। রক্ত-মাংসের হৃদয় জয় করা যায়, কিন্তু পাথরের সঙ্গে কি লড়াই চলে! পরাবীনতার আগুনে পুড়ে সমস্ত বুক তোমার একেবারে পাষণ হয়ে গেছে!

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন। ভারতীর দুই চক্ষু শ্রদ্ধা ও স্নেহে অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, কহিল, এ বিশ্বাস না থাকলে কি এমন কোরে তোমাকে আত্মসমর্পণ করতে পারতাম? আমি ত নবতারা নই। আমি জানি, আমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে,—কিন্তু এ জীবনে সংশোধনের পথও আর নেই। একদিনের জন্তেও যাকে মনে মনে—

ভারতীর চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দাদা, ফেরবার সময় হয়নি? তাঁটার দেয়ী কত?

ডাক্তার দেওয়ালের গড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, এখনো দেয়ী আছে বোন। তাহার পরে ধীরে ধীরে ডান হাত বাড়াইয়া ভারতীর মাথার উপরে রাখিয়া কহিলেন, আশ্চর্য! এত দুর্দশাতেও এ অমূল্য রত্নটি আজও বাঙলার থোয়া যারনি। থাকনা নবতারা, তবু ত ভারতীও আমাদের আছে। শশি, সমস্ত পৃথিবীতে এর আর জোড়া মেলে না! এখানে সংগ্রহ সবাসাচীরও সাধ্য নেই তুচ্ছ অপূর্বকে আড়াল করে দাঁড়ায়! ভাল কথা শশি, মদের বোতল কই?

প্রশ্ন শুনিয়া শশী যেন কিছু লজ্জিত হইল, বলিল, কির্নিনি ডাক্তার! ও আমি আর থাকো না।

ভারতী বলিল, তোমার মনে নেই দাদা, নবতারা ওঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন?

শশী তাহারই সাথ দিয়া কহিল, সত্যিই নবতারার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মদ আর থাকোনা। এ সত্য আমি ভাঙবোনা ডাক্তার।

ডাক্তার সহাস্ত্রী বলিলেন, কিন্তু বাচবে কি করে শশি? মদ গেল, নবতারা গেল, বখাসদর্শন-বিক্রি-করা টাকা গেল, একসঙ্গে এত সহিবে কেন?

শশীর মুখের দিকে চাহিয়া ভারতী বাথা পাইল, কহিল, তামাসা করা সজ্জ দাদা, কিন্তু সত্যি সত্যি একবার ভেবে দেখ দিকি?

ডাক্তার বলিলেন, ভেবে দেখেই বল্চি ভারতী! এই টাকাটার ওপরে যে শশীর কতখানি আশা ভরসা ছিল তা' আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না! ওর পরিচিত এমন একটা লোকও নেই যে, এ বিবরণ শোনেনি। তার পরে এলো নবতারা। ছ' সাতমাস ধরে সেই ছিল ওর ধ্যান-জ্ঞান। আর মদ? সে তো শশীর সুখ-দুঃখের একমাত্র সাথী। কাল সবই ছিল, আজ ওর জীবনের যা-কিছু আনন্দ, যা-কিছু দাবনা একদিনে একসঙ্গে চক্রান্ত করে যেন ওকে ত্যাগ করে গেল। তবু, কারও বিকক্ষে ওর বিদ্রোহ নেই, নালিশ নেই,—এমন কি আকাশের পানে চেয়ে একবার সজল চক্ষে বলতে পারলে না যে, ভগবান! আমি কারও মন্দ চাইনে, কিন্তু তুমি সত্যির যদি হও ত এর বিচার কোরো!

ভারতীর মুখ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কহিল, তাই তোমার এত স্নেহ।

ডাক্তার বলিলেন, শুধু স্নেহ নয়, শ্রদ্ধা। শশী সাধু লোক, সমস্ত অন্তর-ধানি যেন গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ, নির্মল। ভারতী, আমি চলে গেলে বোন, একে একটু দেখো। তোমার হাতেই শশীকে আমি দিয়ে গেলাম, ও জীব পাবে, কিন্তু দুঃখ কখনো কাউকে দেবেনা।

শশী লজ্জা ও কুণ্ঠায় আরক্ত হইয়া উঠিল। ইহার পরে কিছুক্ষণ পরস্পর বোধ করি কথার অভাবেই তিন জনে নীরব হইয়া রহিলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু এখন থেকে কি করবে কবি?

তোমার বাকি রইল ত কেবল ওই বেহালাখানি। আগে মত আবার দেশে দেশে বাজিয়ে বেড়াবে ?

এবার শশী হাসিমুখেই বলিল, আপনার কাজে আমাকে ভক্তি করে নিন,—বাস্তবিকই আমি আর মদ খাবো না।

তাহার কথা এবং কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া ভারতী হাসিল। ডাক্তার নিজেও হাসিলেন, স্নেহাৰ্জকণ্ঠে কহিলেন, না, কবি, ওতে তোমার আর ভক্তি হয়ে কাজ নেই। তুমি আমার এই বোন্টির কাছে থেকো, তাতেই আমার চের বড় কাজ হবে।

শশী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া সন্দোচের সহিত কহিল, আগে আমি কবিতা লিখতে পারতাম ডাক্তার,—হয়ত এখনও পারি।

ডাক্তার খুসী হইয়া কহিলেন, তাও ত বটে। আর তাতেই যে আমার মস্ত কাজ হবে কবি।

শশী কহিল, আমি আবার আরম্ভ কোরব। চাষাভুষা কুলি-মজুরদের জন্তেই এবার শুধু লিখব।

কিন্তু তারা ত পড়তে জানেনা কবি ?

শশী কহিল, নাই জান্লে, তবু তাদের জন্তেই আমি লিখবো।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, সেটা অস্বাভাবিক হবে, এবং অস্বাভাবিক জিনিষ টিকবেনা। অশিক্ষিতের জন্তে অল্পমাত্র গোলা বেটা পাঠের কারণ, তাহাদের ক্ষুদ্র-বোধ আছে, কিন্তু সাহিত্য পরিবেশন করা যাবেনা। তাদের সুখ দুঃখের বর্ণনা করার মানেই তাদের সাহিত্য নহে। কোন দিন যদি সম্ভব হয়, তাদের সাহিত্য ত্যারাই করে নেবে,—নইলে তোমার গলায় লাঙ্গলের গান লাঙ্গল-ধারীর গীতিকায়া হয়ে উঠবে। এ অসম্ভব প্রয়াস তুমি কোরোনা কবি।

শশী ঠিক বুঝিতে পারিলনা, সন্দিক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তবে আমি কি ফোরব ?

ডাক্তার বলিলেন, তুমি আমার বিপ্লবের গান কোরো। যেখানে জন্মেছ, যেখানে মানুষ হয়েছ, শুধু তাদেরই—সেই শিক্ষিত ভদ্র জাতের জন্তেই।

ভারতী বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল, কহিল, দাদা, তুমিও জাত মানো ? তোমার লক্ষ্যও সেই কেবল ভদ্র জাতির দিকে ?

ডাক্তার বলিলেন, আমি ত বর্ণাশ্রমের কথা বলিনি, ভারতী, সেই জোর-করা জাতিভেদের ইঙ্গিত ত আমি করিনি ! সে বৈষম্য আমার নেই,—কিন্তু শিক্ষিতে অশিক্ষিতে জাতিভেদ, সে ত আমি না মেনে পারিনে ! এইত সত্যকীর জাতি,—এইত ভগবানের হাতে-গড়া সৃষ্টি ! ক্রীষ্টান বলে কি তোমাকে ঠেলে রাখতে পেরেছি দিদি ? তোমার মত আপনার জন আমার কে আছে ?

ভারতী শ্রদ্ধা-বিগলিত-চক্ষে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কিন্তু তোমার বিপ্লবের গান ত শশীবাবুর মুখে সাজ্জবনা দাদা ! তোমার বিদ্রোহের গান, তোমার গুপ্ত সমিতির—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, না, আমার গুপ্ত সমিতির ভার আমার পেরেই থাক বোন,—ও বোঝা বইবার মত জোর,—না না, সে থাক—সে শুধু আমার ! এই বলিয়া তিনি দৃশকাল যেন আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। কহিলেন, তোমাকে ত বলেছি ভারতী, বিপ্লব মানেই শুধু হস্তাধিকার কাণ্ড নয়,—বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আগুল পরিবর্তন ! রাজনৈতিক বিপ্লব নয়,—সে আমার ! কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান সুর করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন,—ধর্ম, সমাজ, সংস্কার,—সমস্ত ভেঙ্গে চূরে ধ্বংস হয়ে যাক,—আর কিছু না পারো, শশী, কেবল এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে

প্রচার করে দাও—এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই—তারপরে থাক্ দেশের স্বাধীনতার বোঝা আমার এই মাথায় ! কে ?

শশী কান খাড়া করিয়া বলিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ যেন—

ভাত্যার চক্ষের পলকে পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া নিশেদ দ্রুত-পদে অন্ধকার বারান্দায় বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু ক্ষণেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ভারতী, সুমিত্রা আসছেন।

(২৮)

এই নিশীথ রাত্রে সুমিত্রার আগমন সম্বাদ যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অপ্রীতিকর। ভারতী কুণ্ঠিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে সে প্রবেশ করিতে ভাত্যার সহজকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, বোস। তুমি কি একলা এলে নাকি ?

সুমিত্রা বলিল, হাঁ। ভারতীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছে ভারতী ?

এই মিনিটখানেক সময়ের মধ্যেই ভারতী কত কি যে ভাবিতেছিল তাহার সীমা নাই। সেদিনকার মত আজিও যে সুমিত্রা তাহাকে গ্রাহ্য করিবেনা ইহাই সে নিশ্চিত জানিত, কিন্তু শুধু এই কুশল প্রশ্নে নয়, তাহার কর্তব্যের দ্বন্দ্ব কোমলতায় ভারতী সহসা যেন চাঁদ হাতে পাইল। অতেরূক কৃতজ্ঞতার অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া বলিল, ভালো আছি দি। আপনি ভাল আছেন ? আজ আর তাহাকে তুমি বলিয়া ডাকিতে ভয় হয় না।

হাঁ, আছি,—বলিয়া জবাব দিয়া সুমিত্রা একধারে উপবেশন করিল। কথোপকথন বেশি করা তাহার প্রকৃতি নয়,—একটা স্বাভাবিক ও শান্ত গাভীরোর দ্বারা চিরদিনই সে ব্যবধান রাখিয়া চলিত, আজও সে প্রীতির ব্যত্যয় হইল না। ইহা প্রচ্ছন্ন ক্রোধ বা বিরক্তির পরিচায়ক নহে তাহা

জানিয়াও কিন্তু ভারতীর নিজে হইতে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভরসা হইল না।

ডাক্তার কথা কহিলেন। বলিলেন, শশীর মুখে শুন্লাম, তুমি প্রচুর বিবদ-দম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে জাভায় ফিরে যাচ্ছ।

সুমিত্রা কহিল, হাঁ, আমাকে নিয়ে যাবার জন্তে লোক এসেছে।

কবে যাবে ?

প্রথম ষ্টিমারেই—শনিবারে।

ডাক্তার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, যাক, এবারে তা'হলে তুমি বড়লোক হলে।

সুমিত্রা ঘাড় নাড়িয়া মাথ দিল, কহিল, হাঁ, সমস্ত পেলে তাই বটে।

ডাক্তার বলিলেন, পাবে। এটাবির পরামর্শ ছাড়া কাজ কোরোনা। আর, একটু সাবধানে থেকো। যারা তোমাকে নিতে এসেছেন, তাঁরা পরিচিত লোক ত ?

সুমিত্রা বলিল, হাঁ, তাঁরা বিশ্বাসী লোক, সকলকেই আমি চিনি।

তা'হলে ত কথাই নেই, এই বলিয়া ডাক্তার মুখ কিরাইয়া ভারতীকে লক্ষ করিয়া কি একটা বলিতে বাইতেছিলেন, হঠাৎ শশী কথা কহিল; বলিল, এ হল মন্দ নয় ডাক্তার। যে তিনজন বাঙালী মহিলাকে আপনি নিলেন—নবতারা গেলেন, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট যেতে উদ্বৃত্ত, শুধু ভারতী—

ডাক্তার সহজে বলিলেন, তোমার ছুশ্চিন্তায় হেতু নেই, কবি, ভারতীও মহাজনের পত্তা অনুসরণ করবেন তা' এক প্রকার স্থির হয়ে গেছে।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু ত্রুষ্ক কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করিল, কিন্তু জবাব দিল না।

ডাক্তারের পরিধাসের মধ্যে যে ব্যথা আছে শশী ইহাই অনুমান করিয়া কহিল, আপনাকেও শীঘ্র চলে যেতে হচ্ছে। তাহলেই দেখুন,

আপনার পথের-দাবীর এ্যাক্টিভিটি বর্ষায় অন্ততঃ শেষ হয়ে গেল। কে আর চালাবে! এই বলিয়া শশী গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিল। তাহার এই দীর্ঘশ্বাস অকৃত্রিম এবং যথার্থই বেদনায় পূর্ণ, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ডাক্তারের মুখের পরে ইহার বেশমাত্র প্রতিবিম্ব পড়িল না। তেমনি হানিমুখে কহিলেন, ও কি কথা কবি? এতকাল এত দেখে শুনে শেষে তোমারই মুখে সব্যাসাচীর এই সার্টিফিকেট! তিনজন মহিলা চলে যাবেন বলে পথের-দাবী শেষ হয়ে যাবে? মদ ছেড়ে দিয়ে কি এই হল নাকি? তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি আবার ধরো।

কথাটা তামাসার মত শুনাইলেও যে তামাসা নয় তাহা বুঝিয়াও ভারতী ঠিকমত বুঝিতে পারিল না। কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, সুমিত্রা নতনেত্রে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। তখন সে মুখ তুলিয়া ডাক্তারের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, দাদা, আমার ত আর বোঝবার জ্ঞান মদ ধরবার আবশ্যিক নেই, কিন্তু তবু বুঝতে পারলাম না। নবতারা কিছুই নয়, আর আমি তার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সুমিত্রা দিদি—বাক্যে তুমি নিজে থেকে প্রেসিডেন্টের আসন দিয়েছ,—তিনি চলে গেলেও কি তোমার পথের-দাবীতে আঘাত লাগবে না? সত্যি কথা বোলো দাদা, হৃদ্ধমাত্র কাউকে লাঞ্ছনা করবার জ্ঞানই রাগ করে দেন বোলোনা! এই বলিয়া সে চোখোচোখি হইবার নিঃশব্দে ভরসায় পলকমাত্র সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু জোড় অপসারিত করিল। চোখে চোখে মিলিলনা, সুমিত্রা সেই মুখ নীচু করিয়া বসিয়া ছিল, তেমনি নির্বাক নতমুখে মৃষ্টির মত বসিয়া রহিল।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার পরে দীর্ঘে দীর্ঘে কহিলেন, আমি রাগ করে বলিনি ভারতী, সুমিত্রা অবহেলার বস্তু নয়। কিন্তু তুমি হয়ত জানো না, কিন্তু নিজে সুমিত্রা ভালরূপেই জানেন যে

এ সকল ব্যাপারে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ গণনা করতে নেই। ভা'ছাড়া প্রাণ বাদে এমন অনিশ্চিত তাদের মূল্য স্থির হবে কি দিয়ে বলত? মানুষ ত বাবেই। যত বড়ই হোক, কারও অভাবকেই যেন না আমরা সর্বনাশ বলে ভাবি, একজনের স্থান যেন জলস্রোতের মত আর একজন স্বচ্ছন্দে এবং অত্যন্ত অনায়াসেই পূর্ণ করে নিতে পারে। এই শিক্ষাই ত আমাদের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষা ভারতী।

ভারতী কহিল, কিন্তু এ তো আর সংসারে সত্যই ঘটেনা। এই যেমন তুমি। তোমার অভাব কেউ কোনদিন পূর্ণ করিতে পারে এ কথা তো আমি ভাবতেই পারিনে দাদা।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার চিন্তার ধারা স্বতন্ত্র ভারতী। আর, এই যেদিন টের পেয়েছিলাম, সেই দিন থেকেই তোমাকে আর আমি দলের মধ্যে টানতে পারিনি। কেবলি মনে হয়েছে, জগতে তোমার অল্প কাজ আছে।

ভারতী বলিল, আর কেবলই আমার মনে হয়েছে আমাকে অবোগ্য জানে তুমি দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্চো। যদি আমার অল্প কাজ থাকে, আমি তারই জন্তে এখন থেকে সংসারে বার হবো, কিন্তু আমার প্রণের ত জবাব হোলনা দাদা। আসলে কথাটা তুচ্ছ। তোমার অভাব জলস্রোতের মতই পূর্ণ হতে পারে কি না? তুমি বোলছ পারে,— আমি বলছি, পারেনা। আমি জানি পারে না, আমি জানি, মানুষ শুধু জলস্রোত নয়—তুমি ত নও-ই।

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ কহিল, কেবল এই কথাটাই জানবার জন্তে তোমাকে আমি পীড়াপীড়ি কোরতাম না। কিন্তু যা নয়, বা নিজে জানো তুমি সত্য নয়, তাই দিয়ে আমাকে ভোলাতে চাও কেন?

ডাক্তার হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলেন না, উত্তরের জন্ত ভারতী অপেক্ষাও করিল না। কহিল, এদেশে আর তোমার থাকা চলেনা,—

তুমিও যাবার জন্তে পা তুলে আছো। আবার তোমাকে ফিরে পাওয়া যে কত অনিশ্চিত এ কথা ভাবতেও বুকের মধ্যে জলতে থাকে, তাই ও আমি ভাবিনে, তবুও এ সত্য ত প্রতি মুহূর্তেই অনুভব না করে পারিনে। এ ব্যথার সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও আমার বড় ব্যথা তোমাকে এমন করে পেয়েও পেলাম না! আজ আমার কত দিনের কত প্রশ্নই মনে হচ্ছে দাদা, কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করেছি তুমি সত্য বলেছ, মিথ্যা বলেছ, সত্যে-মিথ্যায় জড়িয়ে দিয়ে বলেছ,—কিন্তু কিছুতেই সত্য জানতে দাওনি। তোমার পথের-দাবীর সেক্রেটারি আমি, তবু যে তোমার কাজের পদ্ধতিতে আমার হাতটুকু আঁহা ছিল না, একথা তোমাকে ত আমি একটা দিনও লুকোইনি। তুমি রাগ করেনি, অবিশ্বাস করেনি,—হৃদিমুখে শুধু বারবার স্মরণে দিতে চেয়েছ। অপূর্ণবাবুর জীবন দানের কথা আমি ভুলিনি। মনে হয়, আমার ছোট জীবনের কল্যাণ কেবল তুমিই নির্দেশ করে দিতে পারো। দোহাই দাদা, যাবার পূর্বে আর নিজেকে গোপন করে ঘেঁষোনা,—তোমার, আমার, সকলের বা পরম সত্য তাই আজ অকপটে প্রকাশ কর।

এই অদ্ভুত অহুনের অর্থ না বুঝিয়া শশী ও সুমিত্রা উভয়েই বিষয়ে চাহিয়া রহিল, এবং তাদেরই উৎসুক চোখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভারতী নিজের ব্যাকুলতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। এই লজ্জা ভাস্কর্যের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সহাস্ত্রে কহিলেন, সত্য, মিথ্যা, এবং সত্য মিথ্যায় জড়িয়ে ত সবাই বলে ভারতী, আমার আর বিশেষ দোষ হ'ল কি? তা ছাড়া লজ্জা যদি পাবার থাকে ত দে আমার, কিন্তু লজ্জা পেলে যে তুমি!

ভারতী নতমুখে নীরব হইয়া রহিল। সুমিত্রা ইহার জবাব দিয়া কহিল, লজ্জা যদি তোমার না-ই থাকে ভাস্কর! কিন্তু মেয়েরা সত্যি

কথাটাও মুখের ঠিপের স্পষ্ট করে বলতে লজ্জা বোধ করে। কেউ কেউ বলতেই পারেনা।

এই মন্তব্যটি যে কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিসের জ্ঞান বলা হইল তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিলনা, কিন্তু যে শ্রদ্ধা ও সম্মান তাহার প্রাপ্য বোধ হয় তাহাই অপর সকলকে নিরুত্তর করিয়া রাখিল। মিনিট দুই তিন এমনি নিঃশব্দে কাটিলে ডাক্তার ভারতীকে পুনরায় লক্ষ করিয়া কহিলেন, ভারতী, স্মিত্রা বল্লেন, আমার লজ্জা নেই, তুমি দোষ দিলে আমি স্থবিধামত সত্য ও মিথ্যা দুই-ই বলি। আজও তেম্নি কিছু বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করে দিতে পারতাম, যদি না এর সঙ্গে আমার পথের-দাবীর সম্বন্ধ থাকতো। এর ভাল-মন্দ দিয়েই আমার সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারিত হয়। এই আমার নীতিশাস্ত্র, এই আমার অকপট মূর্তি!

ভারতী অবাক হইয়া কহিল, বল কি দাদা, এই তোমার নীতি, এই তোমার অকপট মূর্তি?

স্মিত্রা বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, ঠিক এই! এই ঠিক যথার্থ স্বরূপ। দয়া নেই, মায়া নেই,—এই পাষণ্ড মূর্তি আমি চিনি ভারতী।

তাঁহার কথাগুলো যে ভারতী বিশ্বাস করিল তাহা নয়, কিন্তু সে শুক হইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য;—এই অর্পহীন নিফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যবান। মূর্থ ভোলাবার এতবড় যাজ্ঞমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাবো মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য শাস্ত, সনাতন, অপৌকষেয়? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানব-জাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাস্ত, সনাতন নয়,—এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। আমি মিথ্যা বলিনে, আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।

এ পরিহাস নয়, সবাসাচীর অন্তরের উক্তি। ভারতী যেন ক্যাকাশে হইয়া গেল, অক্ষুটস্থরে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, এই কি তোমার পথের-দাবীর নীতি ?

ডাক্তার জবাব দিলেন, ভারতী, পথের-দাবী আমার তর্কশাস্ত্রের টোল নয়—এ আমার পথ চলার অধিকারের জোর। কে কবে কোন্ অজানা প্রয়োজনে নীতিবাক্য রচনা করে গেল পথের-দাবীর সেই হবে সত্য, আর এর তরে যার গলা ফাঁসির দড়িতে বাঁধা, তার জপয়ের বাক্য হবে মিথ্যা ? তোমার পরম সত্য কি আছে জানিনে, কিন্তু পরম মিথ্যা যদি কোথাও থাকে ত সে এই !

উত্তেজনার স্রমিহ্রার চোখের দৃষ্টি প্রথর হইয়া উঠিল, কিন্তু এই ভয়ানক কথা শুনিয়া ভারতী শব্দায় ও সংশয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল।

কবি !

আজ্ঞে।

শশী কি ভক্তি দেখেছে ? এই বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন, কিন্তু এ হাসিতে কেহ যোগ দিলনা। ডাক্তার দেয়ালের ঘড়ির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, জোয়ার শেষ হতে আর দেৱী নেই, আমার যাবার সময় হয়ে এল ! তোমার তারা-বিহীন শশি-তারা লক্ষে আর আসার সময় পাবো না।

শশী কহিল, কানই আমি এ বাসা ছেড়ে দেব।

কোথায় যাবে ?

শশী কহিল, আপনার আদেশমত ভারতীর কাছে গিয়ে থাকবো।

ডাক্তার সহাস্ত্রে কহিলেন, দেখেচ ভারতী, শশী আমার আদেশ অমান্য করেন। ও বাসাটার নাম কি দেবে কবি ? শশী-ভারতী লজ ? বার

তিনেক কক্ষাতে ত আমিই দেখলাম, এবারে হয়ত লাগতেও পারে।
ভারতী লোক ভাল। ওর শরীরে দয়া-মায়া আছে।

এত কষ্টেও ভারতী হাসিয়া ফেলিল। স্বমিত্রা হাসি-মুখে নাথা
নত করিল।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার টাকার খলিট কিন্তু সঙ্গে নিলাম।
ভারতীর কাছে রেখে যাবো, ও একটা বাড়ী কিনবে।

ভারতী বলিল, দাদা, কাটা ঘায়ে হৃনের ছিটে দেওয়া কি তোমার
খাম্বের না ?

শশী বলিল, টাকা আপনি নিন ডাক্তার, আপনাকে আমি দিলাম।
আমার দেশের বাড়ী ঘর সর্বস্ব বেচা টাকা যেন দেশের কাজেই
নাগে।

ডাক্তার হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ ছল্‌ছল করিয়া আসিল।
বলিলেন, টাকা আমার আছে, শশি, এখন আর দরকার নেই। তা
ছাড়া, আর বোধ হয় টাকার অভাব হবে না। এই বলিয়া তিনি
স্মিতমুখে স্বমিত্রার প্রতি চাহিলেন।

স্বমিত্রার দুই চক্ষে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মুখে সে কিছুই
কহিলনা, কিন্তু তাহার সর্বাপ দিয়া এই কথাটাই কুটিয়া বাহির হইল,
নব্বই ত তোমার, কিন্তু সে কি তুমি ছোবে ?

ডাক্তার দৃষ্টি অপসারিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া
ডাকিলেন, কবি !

বলুন।

ব্রাহ্মণ ভোজনটা একটু আগাম সেরে নিলাম বলে তুমি দুঃখ
কোরোনা। কারণ, শুভক্ষণ যখন সত্যি এসে পৌছবে তখন দ্বিতীয়বার
আর আমি ফুরসৎ পাবো না। কিন্তু সেদিন আসবে। নানাবিধ স্থখাচ্ছে
পরিহৃত্ত হয়ে আজ তোমাকে বর দিলাম, তুমি স্বখী হবে। কিন্তু দুটি

কাজ তুমি কখনো করেনা। মদ খেয়োনা, আর রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে ঘেয়োনা। তুমি কবি, তুমি দেশের বড় শিল্পী—রাজনৈতিক চেয়ে তুমি বড় এ কথা ভুলোনা।

শশী ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আপনি যাতে আছেন, আমি তাঁর মধ্যে থাকুলে দোষ হবে,—আমি কি আপনার চেয়েও বড় ?

ডাক্তার কহিলেন, বড় বই কি। তোমার পরিচয়ই ত জাতির সত্যকার পরিচয়। তোমরা ছাড়া এর শুদ্ধন হবে কি দিয়ে ? একদিন এই স্বাধীনতা-বাণীবীরা-সমজার মীমাংসা হবেই,—এর দুঃখ-দৈতোর কাহিনী সেদিন জনশ্রুতির অধিক মূল্য পাবেনা, কিন্তু তোমার কাজের মূল্য নিরূপণ করবে কে ? তুমিই ত দিয়ে যাবে দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ধারাকে মালার মত গেঁথে।

স্মিত্রা মুহূর্ত্তে বলিল, কবে গাঁথবেন সে উনিই জানেন, কিন্তু তুমি কথা গেঁথে-গেঁথে সে মূল্য ঐর এখনি বাড়িয়ে দিলে, ভারতীয় সাম্রাজ্যে কি কোরে ?

ভনিয়া সবাই হাসিল, ডাক্তার কহিলেন, শশী হবে আমাদের জাতীয় কবি। হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খৃষ্টানের নয়,—শুধু আমার বাঙলা দেশের কবি। সহস্র মদ-নদী-প্রবাহিত আমার বাঙলা দেশ, আমার সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা মাঠের পরে মাঠে-ভরা বাঙলা দেশ। মিথ্যা রোগের দুঃখ নেই, মিথ্যা ছুভিক্ষের ক্ষুধা নেই, বিদেশী শাসনের অপমানের জ্বালা নেই, মন্তব্য-হীনতার লাঞ্ছনা নেই,—তুমি শশী, তারই চারণ কবি। পারবেনা ভাই ?

ভারতীয় সর্বাঙ্গ কটকিত হইয়া উঠিল, শশী লাতু-সম্ভাবনের মাধুর্য্যে বিগলিত হইয়া বলিল, ডাক্তার, চেষ্টা করলে আমি ইংরাজিতেও কবিতা লিখতে পারি। এমন কি—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, ইংরাজি নয়, ইংরাজি নয়

—শুধু বাঙলা, শুধু এই সাত কোটি লোকের মাতৃভাষা! শশি, পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাই আমি জানি, কিন্তু সহস্র দলে বিকশিত এমন মধু দিয়ে ভরা ভাষা আর নেই! আমি অনেক সময়ে ভাবি ভারতী, এমন অমৃত এদেশে কবে কে এনেছিল?

ভারতীর চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল, সে কহিল, আর আমি ভাবি দাদা, দেশকে এতখানি ভালবাসতে তোমাকে কে শিখিয়েছিল। কোথাও যেন এর আর সীমা নেই!

ইহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া শশী উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিল, এই বিগত গৌরবের গানই হবে আমার গান, এই ভালবাসার সুরই হবে আমার সুর। নিজের দেশকে বাঙলা দেশের লোকে যেন আবার তেমনি করে ভালবাসতে পারে—এই শিক্ষাই হবে আমার শিক্ষা দেওয়া।

ডাক্তার বিস্মিত চোখে মুহূর্তকাল শশীর প্রতি চাহিয়া স্মিত্ত্বের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে উভয়েই হাসিলেন। কিন্তু এই হাসির মর্ম্ম অপর দুইজনে উপলব্ধি না করিতে পারিয়া দুইজনেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। ডাক্তার কহিলেন, আবার তেমনি কোরে ভালবাসবে কি? তুমি যে ভালবাসার ইঙ্গিত কোরছ শশি, সে ভালবাসা বাঙালী কস্মিনকালেও বাঙলা দেশকে বাদেনি। তার তিলাঙ্ক থাকলেও কি বাঙালী বিদেশীর সঙ্গে ঘড়ঘড় করে এই সাত কোটি ভাই-বোনকে অবলীলাক্রমে পরের হাতে সঁপে দিতে পারতো? জননী হুন্সভূমি ছিল শুধু কথার কথা! মুসলমান বাদশার পায়ে তলার অঞ্জলি দেবার জন্তে হিন্দু মানসিংহ হিন্দু প্রতাপাদিত্যকে জানোয়ারের মত কোরে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। আর তাকে রসদ যুগিয়ে পথ দেখিয়ে এনেছিল বাঙালী! বগীরা দেশ লুট করতে আস্ত, বাঙালী লড়াই করত না, মাথায় হাঁড়ি দিয়ে জলে বসে থাকতো। মুসলমান দস্যুরা মন্দির ধ্বংস করে দেবতাদের নাক কান কেটে দিয়ে

যেতো, বাঙালী ছুটে পালাত, ধর্মের জগে গলা দিত না। সে বাঙালী আমাদের কেউ নয়, কবি, গৌরব করবার মত তাদের কিছু ছিলনা। তাদের আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চলবো,—তাদের ধর্ম, তাদের অনুশাসন, তাদের ভীকতা, তাদের দেশজোহিতা, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি,—তাদের যা কিছু সমস্ত। সেই ত হবে তোমার বিপ্লবের গান, সেই ত হবে তোমার সত্যকার দেশ-প্রেম।

শশী বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল, এই উত্তির মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলনা।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, তাদের কাপুরুষতায় আমরা বিশ্বের কাছে হেয়, স্বার্থপরতার ভারে দায়গ্রস্ত, পঙ্গু। শুধু কি কেবল দেশ? যে ধর্ম তারা আপনাবা মানতোনা, যে দেবতাদের পরে তাদের নিজেদের আস্তা ছিলনা, তাদেরই দোহাই দিয়ে সমস্ত জাতির আপাদ-মস্তক যুক্তিহীন বিধি-নিষেধের সহস্র পাকে বেঁধে দিয়ে গেছে। এ অধীনতা অনেক দুঃখের মূল।

শশী ধীরে ধীরে কহিল, এসব আপনি কি বলছেন?

ভারতীর ফোভের অবদি রহিলনা, বলিল, দাদা আজ আমি ক্রীশ্চান, কিন্তু তাঁরা আমারও পূর্বপিতামহ। তাঁদের আর যা দোষ থাক, ধর্ম-বিশ্বাসে প্রবন্ধনা ছিল,—এরকম অগ্নায় কটুক্তি তুমি করোনা।

সুমিত্রা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, এখন কথা কহিল। ডাক্তার প্রতি চাহিয়া বলিল, কারও সমক্ষেই কটুক্তি করা অগ্নায়, কিন্তু অন্ধকে শ্রদ্ধা করাও অগ্নায়, এমন কি তিনি পূর্বপিতামহ হলেও। এতে মিষ্টতা থাকতে পারে কিন্তু যুক্তি নেই ভারতী, যা কুসংস্কার তাকে পরিত্যাগ করতে শেখো।

ভারতী নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তার শশীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, কোন বস্তু কেবলমাত্র প্রাচীনতার জোরেই সত্য হয়ে ওঠেনা,

কবি। পুরাতনের গুণগান করতে পারাই বড় গুণ নয়। তা'ছাড়া, আমরা বিপ্লবী, পুরাতনের মোহ আমাদের জন্মে নয়। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের গতি, আমাদের লক্ষ্য শুধু স্বমুখের দিকে। পুরাতনের ধ্বংস করেই ত শুধু আমাদের পথ করতে হয়! এর মধ্যে মায়া-মমতার অবকাশ কই? জীর্ণ, মৃত পথ জুড়ে থাকলে আমরা পথের-দাবীর পথ পাবো কোথায়?

ভারতী কহিল, আমি কেবল তর্কের জগ্রেই তর্ক করছি, আমি সত্যই তোমার কাছ থেকে আমার জীবনের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি পুরাতনের শত্রু, কিন্তু কোন একটা সংস্কার বা রীতিনীতি কেবলমাত্র প্রাচীন হয়েছে বলেই কি তা নিষ্ফল, বৃথা এবং পরিত্যজ্য হয়ে যাবে? মাহুবে তা'হলে অসংশয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে কার পরে দাদা?

ডাক্তার বলিলেন, এতখানি ভারসহ বস্তু ছুনিয়ায় কি আছে তা জানিনে। তবে এ কথা জানি, ভারতী, বয়সের সঙ্গে একদিন সমস্ত জিনিসই প্রাচীন, জীর্ণ এবং অকেজো, স্বতরাং পরিত্যজ্য হয়ে ওঠে। প্রত্যহ মাহুবেই এগিয়ে যাবে, আর তার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সহস্র বর্ষের প্রাচীন রীতিনীতি একই স্থানে অচল হয়ে থাকবে, এমন হলে হয়ত ভাল হয়, কিন্তু তা হয়না। শুধু একটা বিপদ হয়েছে এই যে, কেবলমাত্র বছরের সংখ্যা দিয়েই কোন একটা সংস্কারের প্রাচীনতা নিরূপণ করা যায় না। না হলে তুমিও আজ আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফুলতে, দাদা, যা কিছু পুরাতন বা কিছু জীর্ণ সমস্ত মিলিচারে নির্ধম হয়ে ধ্বংস করে ফেলো, আবার নতুন মাহুস, নতুন জগতের প্রতিষ্ঠা হোক।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, নিজে তুমি পারো?

কি পারি, বোন?

যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু পবিত্র, সমস্ত নির্ধম-চিন্তে ধ্বংস করে ফেলতে?

ডাক্তার বলিলেন, পারি। সেইত আমাদের ব্রত। পুরাতন মানেই পবিত্র নয় ভারতী। মানুষ সত্তর বছরের প্রাচীন হয়েছে বলেই সে দশ বছরের শিশুর চেয়ে বেশি পবিত্র হয়ে ওঠেনা। তোমার নিজের দিকেই চেয়ে দেখ, মানুষের অবিশ্রাম চলার পথে ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম ত সকল দিকেই মিথ্যে হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কেউ ত আর সে আশ্রম অবলম্বন করে নেই। থাকলে তাকে মরতে হবে। সে যুগের সে বন্ধন আজ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। তবুও তাকেই পবিত্র মনে করে কে জানো ভারতী? ব্রাহ্মণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরন্তর পবিত্র জানে কাবা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা ত শক্ত নয় বোন! যে সংস্কারের মোহে অপূর্ব আজ তোমার মত নারীকেও ফেলে দিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে বড় অসত্য আর আছে কি? আর শুধু কি অপূর্বের বর্ণাশ্রম? তোমার ক্রীষ্টান ধর্মও আজ তেমনি অসত্য হয়ে গেছে, ভারতী, এর প্রাচীন মোহ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

ভারতী ভীত হইয়া বলিল, যে ধর্মকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি তাকেই তুমি ত্যাগ করতে বল দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, বলি। কারণ সমস্ত ধর্মই মিথ্যা,—আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্ব-মানবতার এতবড় পরম শত্রু আর নেই।

ভারতী বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে তারে ধীরে বলিল, দাদা যেখানেই থাকো, তোমাকে আমি চিরদিন ভালবাসবো, কিন্তু এই যদি তোমার সত্যকার মত হয়, আজ থেকে তোমার আমার পথ একেবারে বিভিন্ন। একটা দিনও আমি ভাবিনি, এত বড় পাপের পথই তোমার পথের-দাবীর পথ।

ডাক্তার মুচকিয়া একটুখানি হাসিলেন।

ভারতী কহিল, আমি নিশ্চয় জানি তোমার এই দয়াহীন নিষ্ঠুর

ধ্বংসের পথে কিছুতেই কল্যাণ নেই। আমার স্নেহের পথ, করুণার পথ, বিশ্বাসের পথ,—সেই পথই আমার শ্রেয়ঃ, সেই পথই আমার সত্য।

তাই, ত তোমাকে আমি টানতে চাইনি ভারতী। তোমার সন্ধকে ভুল করেছিলেন স্মিত্রা, কিন্তু আমার ভুল একটা দিনও হয়নি। তোমার পথেই তুমি চলগে। স্নেহের আয়োজন, করুণার প্রতিষ্ঠান জগতে অনেক খুঁজে পাবে, পাবেনা শুধু পথের-দাবী,—পাবেনা শুধু—বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের দৃষ্টি পলকের জন্ত জলিয়াই যেন নিবিয়া গেল। কর্ণস্বর স্থির, গভীর। ভারতী ও স্মিত্রা উভয়েই বুকিল, সব্যসাচীর এই শাস্ত মুখশ্রী, এই সংযত, অচঞ্চল ভাষাই সবচেয়ে ভীষণ। তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাকে ত বহুবার বলেছি, ভারতী, কল্যাণ আমার কাম্য নয়, আমার কাম্য স্বাধীনতা। প্রতাপ চিতোরকে বগন জনহীন অরণ্যে পরিণত করেছিলেন, তখন, সমস্ত মাড়বারে তার চেয়ে অকল্যাণের মূর্তি আর কোথাও ছিলনা—সে আজ কত শতাব্দের কথা,—তবু সেই অকল্যাণই আজও সহস্র কল্যাণের চেয়ে বড় হয়ে আছে! কিন্তু থাক এ সব নিষ্ফল তর্ক, যা আমার ব্রত তার কাছে কিছুই আমার অসত্য, অকল্যাণ নেই।

ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তর্ক এবং মতভেদ অনেকদিন ত অনেকবারই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন ধারা নয়। আজ তাহার দুঃখ মন যেন বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার ঘড়ির দিকে চাহিলেন, তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, ভাণ্ডার পরে সেই স্নিগ্ধ, সহজ হাসিমুখে কহিলেন, কিন্তু এদিকে যে নদীতে ফের ছোয়ার এসে পড়বার সময় হয়ে এল ভারতী, ওঠো।

ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল।

ডাক্তার খাবারের পুটুলি হাতে করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, স্মিত্রা, বজ্রের কোথায়?

বাসায় আসিয়া ভারতী চাবি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, আলো জালিয়া চারিদিক সাবধানে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পরে কোনমতে একটা শয়্যা পাতিয়া বইয়া শুইয়া পড়িল। দেহ অবশ, মন অবসন্ন, তন্দ্রাতুর দুই চক্ষু শান্তিতে মুদ্রিতা রহিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিলনা। ঘুরিয়া ফিরিয়া সবাসাচীর এই কথাই তাহার বারবার মনে হইতে লাগিল যে, এই পরিবর্তনশীল জগতে মতো্যপলন্ধি বলিয়া কোন নিত্যবস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে;—যুগে যুগে কালে কালে মানবের প্রয়োজনে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে এ বিশ্বাস ভাস্ত, এ দাবী কুসংস্কার।

ভারতী মনে মনে বলিল, মানবের প্রয়োজনে, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজনে নূতন সত্য সৃষ্টি করিয়া তোলাই ভারতবাসীর সব চেয়ে বড় সত্য। অর্থাৎ, ইহার কাছে কোন পন্থাই অসত্য নয়; কোন উপায় কোন অভিসন্ধিই ভেদ নয়। এই যে কারখানার কদাচারী কুলি-মজুরদের সংপথে আনিবার উদ্ভয়, এই যে তাহাদের সন্তানদের বিজ্ঞানশিক্ষা দিবার আয়োজন, এই যে তাহাদের নৈশ বিদ্যালয়,—ইহার সমস্ত লক্ষ্যই আর কিছু—এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিয়া লইতে সবাসাচীর কোন দ্বিধা, কোন লজ্জা নাই! পরাধীন দেশের মুক্তি-যাত্রার ভাবার পথের বাচ-বিচার কি? একদিন সবাসাচী বলিয়াছিলেন, পরাধীন দেশে শাসক এবং শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যখন এক হইয়া দাঁড়ায় তাহার চেয়ে বড় দুর্ভাগা আর দেশের নাই, ভারতী! সেইদিন একবার তাৎপর্য সে বুঝিতে পারে নাই, আজ সে অর্থ তাহার কাণ্ড পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল।

ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। ইহার পরে কখন যে তাহার চৈতন্য নিদ্রায় ও তন্দ্রায় আবিষ্ট হইয়া পড়িল তাহার মনে নাই, কিন্তু

মনে পড়িল নিদ্রার ঘোরে সে বারবার আবৃত্তি করিয়াছে, দাদা, অতি-মাহুষ তুমি, তোমার 'পরে ভক্তি-শ্রদ্ধা স্নেহ আমার চিরদিনই অচল হয়ে থাকবে, কিন্তু, তোমার এ বিচার-বুদ্ধি আমি কোনমতেই গ্রহণ করতে পারব না। জগদীশ্বর করুন, তোমার হাত দিয়েই যেন তিনি স্বদেশের মুক্তি দান করেন, কিন্তু, অত্যায়ে কখনও ত্রাণের মূর্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ে না। তুমি পরম পণ্ডিত, তোমার বুদ্ধির সীমা নেই, তর্কে তোমাকে এঁটে ওঠা যায়না,—তুমি সব পারো। বিদেশীর হাতে পরাধীনের লাঞ্ছনা যে কত, ছুঃখের সমুদ্রে কত যে আমাদের প্রয়োজন, দেশের মেয়ে হয়ে সে কি আমি জানিনে দাদা? কিন্তু তাই বলে প্রয়োজনকেই যদি সকলের শীর্ষে স্থান দিয়ে দুর্বলচিত্ত মানবের কাছে অধর্মকেই ধর্ম বলে সৃষ্টি কর, এ ছুঃখের আর কখনো তুমি অন্ত পাবেনা।

পরদিন ভারতীর যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা হইয়াছে। ছেলেটা ঘারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ভাকাডাকি করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি হাতমাথু ধুইয়া নীচে আসিয়া কপাট খুলিতেই জনকয়েক ছাত্র ও ছাত্রী বই-শ্রেণী লইয়া ভিতরে ঢুকিল। তাহাদের বসিতে বলিয়া ভারতী কাপড় ছাড়িতে উপরে যাইতেছিল, হোটেলের মালিক সরকার ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, অপূর্ববাবু তোমাকে কাল রাত থেকে খুঁজছেন দিদি।

ভারতী কিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাতে এসেছিলেন?

ঠাকুরমহাশয় কহিল, হাঁ। আজও সকাল থেকে বসে আছেন, গিয়ে পাঠিয়ে দিগে?

ভারতীর মুখ পলকের ছন্দ শুক হইয়া উঠিল, কহিল, আমাকে তাঁর কি দরকার?

ব্রাহ্মণ বলিল, সে তো জানিনে দিদি। বোধ হয় তাঁর মাঝে অপ্রশ্নের সম্বন্ধেই কিছু বলতে চান।

ভারতী হঠাৎ কষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় তাঁর মায়ের কি অসুখ হয়েছে তার আমি কি কোরব ?

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইল ! অপূর্ববাবুকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি পদস্থ ব্যক্তি, আগেকার দিনে এই গৃহে তাঁহার বহু এবং সমাদরের ক্রটি ছিলনা, সময়ে ও অসময়ে তাহার অনেক মাল মশলা হোটেল হইতে তাহাকেই যোগাইয়া দিত হইয়াছে। আজ অকস্মাৎ এই উত্তাপের সে হেতু বুকিলনা। কহিল, আমি ত সে-সব কিছু জানিনে নিদি, গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্বৃত্ত হইতেই, ভারতী ডাকিয়া বলিল, সকালে আমার অনেক কাজ, ছেলে-মেয়েরা এসেছে তাদের পড়া বলে দিতে হবে, বলে দাঙগে দেখা করবার এখন সময় হবেনা।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, তবে দুপুরে কি বৈকালে আসতে বলে দেব ?

ভারতী কহিল, না, আমার সময় নেই। এই বলিয়া এ প্রস্তাব এইগানেই বন্ধ করিয়া দিয়া দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া প্রস্তুত হইয়া যখন সে ঘণ্টাখানেক পরে নীচে নামিয়া আসিল, তখন ছেলে-মেয়েতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে ও তাহাদের বিছালাভের ঐকান্তিক উত্তমে সমস্ত পাড়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে ছ'বেলাই পাঠশালা বসিত, এখন লোকের অভাবে নৈশ বিছালগুটা প্রায় বন্ধ হইয়াই গিয়াছে ; স্মিত্রা নাই, ডাক্তার আত্মগোপন করিয়াছেন, নবতারা অকৃত গিয়াছে, শুধু নিজের বাসা বলিয়া সকালবেলাটার কাজ ভারতী চালাইয়া লইতেছিল। প্রাত্যহিক নিয়মে আজও সে পড়াইতে বসিল, কিন্তু কিছুতেই মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। পড়া দেওয়া এবং লেখা আজ শুধু নিষ্ফল নয়, তাহার আত্ম-বঞ্চনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তবুও কোনমতে এমনি করিয়া ঘণ্টা দুই কাটিলে পুড়ুয়ারা

যখন গৃহে চলিয়া গেল, তখন কি করিয়া যে সে আজিকার সমস্ত দিন কাটাইবে তাহা কোন মতেই ভাবিয়া পাইল না। আর সকল ভাবনার মাঝে মাঝে আসিয়া অবিশ্রাম বাধা দিয়া যাইতে লাগিল অপূর্বর চিন্তা। তাহাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে অশোভনতা বতই থাক, তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া যে টের মন্দ হইত এ বিষয়ে ভারতীর সন্দেহ ছিল না। কোন একটা অজুহাতে দেখা করিয়া সে পুত্রের অস্বাভাবিক সহকৃতাকে আরও বিকৃত করিয়া তুলিতে চায়, না হইলে মায়ের অস্থি যদি, তবে সে এখানে বসিয়া করিতেছে কি? না তাহার, ভারতীর নয়। তাহারই সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদে শয্যাপাশে ফিরিয়া যাওয়া যে পুত্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য তাহা কি পরের সহিত বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে? তাহার মনে পড়িল রোগের সময়ে অপূর্বর নিদারুণ ভয়। তাহার কোমল চিত্ত বাহিরে হইতে ব্যাঘাত ব্যাকুল হইয়া বত ছট্‌কছুট করুক, ক্রয়ের সেবা করিবার তাহার না আছে শক্তি, না আছে সাহস। এ ভার তাহার প্রতি দ্রষ্ট করার মত সর্বনাশ আর নাই। এ সমস্তই ভারতী জানিত,—সে ইহাও জানিত জননীকে অপূর্বর কতখানি ভালবাসে। মায়ের দৃষ্টি করিতে পারেনা পৃথিবীতে এমন তাহার কিছু নাই। তাহারই কাছে না যাইতে পারার দুঃখ অপূর্বর কত, ইহাই বলনা করিয়া একদিকে গেল তাহার কক্ষের উদর হইল, অগ্গদিকে এই অসহ্য ভীকতার মধ্যে তাহার সর্বদ্বন্দ্ব জলিতে লাগিল। ভারতী মনে মনে বলি, প্রশ্রয় করিতে পারেনা বলিয়াই কি পীড়িতা মায়ের কাছে গিয়া কোন লাভ নাই? এই উপদেশ আমার কাছে অপূর্ব প্রত্যাশা করে নাকি?

এমনি করিয়া এই দিক দিয়াই তাহার চিন্তার দ্বারা অবিশ্রাম প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাতার অস্থিরের সময়ে অপূর্বর আর কিছু যে জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে, এ ছাড়া অগ্গ কিছু যে ঘটিতে পারে

যদি তাহার প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে ইহার আভাস পর্যন্ত তাহার মাথায় প্রবেশ করিল না।

ক্ষুধার লেশমাত্র ছিলনা বলিয়া আজ ভারতী রাঁধিবার চেষ্টা করিল না। বেলা যখন তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া তাহার দ্বারে লাগিল। ভারতী উপরের জানালা দিয়া যুব বাড়াইয়া দেখিয়া বিশ্বয় ও শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মোট ঘটি গাড়ীর ছাদে চাপাইয়া শশী আসিয়া উপস্থিত। গত রাত্রের হাদি-তামাসাকে জগতে যে কোন মাতৃযই এমন বাস্তবে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে, ভারতী বোধ হয় তাহা কল্পনা করিতেও পারিত না। কিন্তু ইহার কাছে অসম্ভবীয় কিছু নাই। রহস্য একেবারে মুহূর্ত্তন সত্যরূপে সশরীরে আসিয়া হাজির হইল।

ভারতী ক্রতপদে নীচে নামিয়া গিয়া কহিল, একি ব্যাপার শশিবাবু? শশী স্তম্ভমুখে কহিল, বাসা তুলে দিয়ে এলাম। এবং তৎক্ষণাৎ গাড়োয়ানকে ছুঁম করিয়া দিল, সমান সব কুছ উপরমে লে যাও—

ভারতী বিরক্তি দমন করিয়া কহিল, উপরে জায়গা কোথায় শশি বাবু?

শশী কহিল, ঘাচ্ছা বেশ, তাহলে নীচের ঘরেই রাখুক।

ভারতী বলিল, নীচের ঘরে পাঠশালা, সেখানেও স্থবিধে হবে না।

শশী চিন্তিত হইয়া উঠিল। ভারতী তাহাকে ভরসা দিয়া কহিল, একি কাজ করা যাক শশিবাবু। হোটেলে ডাক্তারের ঘরটা ত আজও খালি পড়ে আছে, আপনি সেখানেই বেশ থাকবেন। খাওয়া-দাওয়ারও কষ্ট হবে না, চলুন।

কিন্তু ঘরের ভাড়া লাগবে ত?

ভারতী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, না, তাও লাগবেনা, ছমাসের ভাড়া দাদা দিয়ে গেছেন।

শশী খুদি না হইলেও এই ব্যবস্থায় রাজি হইল। সমস্ত জিনিস-পত্র সমেত দাদাঠাকুরের হোটেলের মধ্যে কবিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতী যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি হইয়াছে। আজ সকল দিক দিয়া তাহার শ্রান্তি ও চিন্তার আর অবধি ছিলনা, পাছে শশী কিদা আর কেহ আসিয়া তাহার নিঃসঙ্গ স্তব্ধতায় বিগ্ন ঘটায় এই আশঙ্কায় সে নীচের ও উপরের সমস্ত দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া দিয়া নিজের শোবার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করিল।

অভ্যাস মত পরদিন প্রত্যুষে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনাহারের দুর্বলতায় সমস্ত শরীর এমনি অবসন্ন যে শয্যাভ্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তৃষ্ণায় বুকের মধ্যেটা শুকাইয়া মক্কাভূমি হইয়া উঠিয়াছে, স্তব্ধতাং দেহ ধারণের এ দিকটায় অবহেলা করিলে আর চলিবে না, তাহা সে বুঝিল।

ধুইদর্শ অবলম্বন করিয়াও যে ভারতী খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সত্যই বাচ-বিচার করিয়া চলিত, এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। তথাপি, মনে হয় সে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হইতেও পারে নাই। যে ব্যক্তিকে তাহার জননী বিবাহ করিয়াছিলেন, সে অত্যন্ত অনাচারী ছিল, তাহার সহিত একত্রে বসিয়াই ভারতীকে ভোজন করিতে হইত, তাই বলিয়া পূর্বের দিনের অখাদ্য বস্তু কোনদিনও তাহার খাদ্য হইয়া উঠে নাই। ছোওয়া-ছুইর বিড়ম্বনা তাহার ছিল না কিংবা যেখানে-সেখানে যাহার-তাহার হাতে খাইতেও তাহার সন্তোষ বোধ হইত। মায়ের মৃত্যুর পরে হইতে সে খরচের দোহাই দিয়া বরাবর নিজে রাঁদিয়াই খাইত। শুধু অসুস্থ হইয়া পড়িলে, বাঁ কাজের ভিড়ে অতিশয় ক্লান্তি বা একান্ত সময়ভাব ঘটিলেই, কদাচিৎ কখনও ঠাকুর মহাশয়ের হোটেল হইতে সাগু বালি বা কটি আনাইয়া খাইত। বিছানা হইতে উঠিয়া সে হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া

অত্যন্ত দিনের তায় প্রস্তুত হইল, কিন্তু রান্না করিয়া লইবার মত জোর বা প্রবৃত্তি আজ তাহার ছিল না, তাই হোটেল হইতে কুটি ও কিছু ভরকারী তৈরি করিয়া দিবার জন্ত ঠাকুর মহাশয়কে খবর পাঠাইল। দোমবারে তাহাদের পাঠশালা বন্ধ থাকিত বলিয়া আজ এ দিকের পরিশ্রম তাহার ছিল না।

অনেক বেলায় কি থাবারের খালা হাতে করিয়া আনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, বড় বেলা হয়ে গেল দিদিমণি—

ভারতী তাহার নিজের খালা ও বাটি আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল। হিন্দু হোটেলের শুচিতা রক্ষা করিয়া কি দূর হইতে সেই পাত্রে কুটি ও ভরকারি এবং বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল, নাও বোসো, যা পারো দুটো মুখে দাও।

ভারতী তাহার মুখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। কির বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতে লাগিল, ওখান থেকে কিরে এসে শুনি তোমার অস্থপ। একলা হাতে তখন থেকে পড়কড় করে মরচি দিদিমণি, কিন্তু এমন কেউ নেই যে দুখানা কুটি বেলে দেয়। আর দেরি করোনা দিদি, বোসো।

ভারতী মুহূর্তে কহিল, তুমি যাও কি, আমি বস্চি।

কি কহিল, দাই। চাকরটা ত সঙ্গে গেল, একলা সমস্ত দোয়া মাজা, —বাহোক্, কিরে এসে কুড়িটি টাকা আমার হাতে দিয়ে বাবু কৈঁদে কেলো বহলেন, কি, শেষ সময়ে তুমি যা করলে মার মেয়ে কাছে থাকলে এমন করতে পারতো না। তিনিও বত কাদেন আমিও তত কাদি, দিদিমণি! আল, কি কষ্ট! বিদেশে যিভুই কেউ নেই আপনার লোক কাছে,—সমুদ্রের পথ, টেলিগ্রাফ, কবুলেই ত আর বউ ব্যাটা উড়ে আসতে পারে না—তাদেরই বা দোব কি?

ভারতীর বুকের ভিতরটা উদ্বেগ ও অজানা আশঙ্কায় হিম হইয়া

উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া শুধু স্থির হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঝি বলিতে লাগিল, ঠাণ্ডাশাই ডেকে বল্লেন, বাবুর মায়ের বড় ব্যামো, তোমাকে যেতে হবে ক্ষান্ত। আমি আর না বলতে পারবু না। একে নিমোনিয়া রুগী, তাতে দর্শশালার ভিড়, জানালা কবাটি সব ভাঙা, একটাও বন্ধ হয় না—কি আতঙ্ক! মারা গেলেন বেলা পাঁচটার সময়, কিন্তু মেসের বাবুদের সব খবর দিতে, ডাক্তারে ইকুতে মড়া উঠলো সেই দুটো আড়াইটে রাতে। ফিরে আসতে তাঁদের বেলা হল,—একলাটি সমস্ত ধোয়া মোছা—

এইবার ভারতীর বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, অপূর্ববাবুর মা মারা গেলেন বুঝি?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ দিদিমনি, তাঁর বর্ষায় যেন নাটি কেনা ছিল। সেই যে কথায় কি বলে, লা ভাড়া করে বায় সেখানে—এ ঠিক তাই। অপূর্ববাবুও এখান থেকে বেরিয়েছেন, তিনিও ব্যাটার সঙ্গে বগড়া করে সেখানে জাহাজে উঠেছেন, সঙ্গে কেবল একজন চাকর। জাহাজেই জ্বর, দর্শশালায় নেমে একেবারে অজ্ঞান অচেতন। বাড়ীতে পা দিয়েই বাবু ফিরতি জাহাজে ফিরে এসে দেখেন মা যায়-যায়। গেলেনও তাই,—কিন্তু দাঁড়িয়ে এক দণ্ড কথা কবার যো নেই দিদিমনি, এখনি সবাই আবার বার হবে। আসবো তখন সন্ধ্যা লাগে,—এই বলিয়া সে গল্প করার প্রলোভন সম্বরণ করিয়া ক্রতবেগে প্রস্থান করিল।

কুটির খালা তেমনি পড়িয়া রহিল, প্রথমে হুই চক্ষু তাহার বাপমা হইয়া উঠিল, তাহার পরে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গণ্ড বাহিয়া ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অপূর্বর মাকে সে দেখেও নাই, এবং স্বামী পুত্র লইয়া এ জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছেন—এ ছাড়া

তাহার সম্বন্ধে সে-বিশেষ কিছু জানিতও না, কিন্তু কতদিন নিজের মিয়াল ঘরের মধ্যে সে রাত্রি জাগিয়া এই বয়সী বিনবা রমণীর সম্বন্ধে কৃত কল্পনাই না করিয়াছে! স্বপ্নের মাঝে নয়, দুঃখের দিনে কখনো যদি দেখা হয়, যখন সে ছাড়া আর কেহ তাহার কাছে নাই, তখন ক্রীশ্চান বলিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি দূরে সরাইয়া দিতে পারেন—এ কথা জানিবার তাহার ভারি সাধ ছিল। বড় সাধ ছিল দুদিনের সেই অগ্নি-পরীক্ষায় আপন-পর-সমজার সে শেষ সমাধান করিয়া লইবে। ধর্মমত-ভেদই এ জগতে মানুষের চরম বিচ্ছেদ কি না, এই সত্য যাচাই করিবার সেই পরম দুঃসময়ই ভাগ্যে তাহার আসিয়াছিল, কিন্তু সে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এ রহস্য এ জীবনে অমীমাংসিতই রহিয়া গেল!

আর অপূর্ব! সে যে আজ কত বড় নিঃসহায়, কতখানি একা, ভারতীর অপেক্ষা তাহা কে বেশি জানে? হয়ত, মাতার একান্ত মনের আশীষাদই তাহাকে কবচের মত অজাবদি রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহা অন্তহিত হইল। ভারতী মনে মনে বলিল, এ সকল তাহার আকাশ-কুহুম, তাহার নিগূঢ় হৃদয়ের স্বপ্ন-রচনা বই আর কিছু নয়, তবু যে সেই স্বপ্ন তাহার নিদ্রেশহীন ভবিষ্যতের কতখানি স্নিগ্ধ-শাম শোভায় অপরূপ করিয়া রাখিত সে ছাড়া এ কথাই বা আর কে জানে? কে জানে তাহার চেয়ে বেশি, ঘরে-বাহিরে অপূর্ব আজ কিরূপ নিকৃষ্ট, কতখানি সঙ্গিনী!

এই প্রবাসভূমে হয়ত অপূর্বের কর্ম্য নাই, হয়ত, আত্মীয়-স্বজন তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, ভীক, লোভী, নীচাশয় বলিয়া বন্ধুজন মধ্যে সে নিন্দিত,—আর সকল দুঃখের বড় দুঃখ মা আজ তাহার লোকান্তরিত। ভারতীর মনে হইল, পরিচিত কাহারও কাছে অপূর্ব লজ্জায় যাইতে পারে নাই বলিয়াই বোধ হয় সকল লজ্জা বিসর্জন দিয়া

সে বারবার তাহারই কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল। উত্তমের পটুতা, ব্যবহার শৃঙ্খলা, কাব্যের তৎপরতা কিছুই তাহার নাই, অথচ, অতিশিখার অসহ জনতা ও কোলাহল, এবং সর্ববিধ অুভাব ও অসুবিধার মধ্যে সেই মায়ের মুখ যখন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন একাকী কি করিয়া যে তাহার মুহূর্তগুলি কাটিয়াছে এই কথা বলিয়া করিয়া চোখের জল তাহার যেন খামিতে চাহিল না। চোখ মুছিতে মুছিতে যে কথা তাহার বহুবার মনে হইয়াছে, সেই কথাই আর হইল, যেন সকল দুঃখের স্রবপাত অপূর্বর তাহার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম লইয়াছে। না হইলে পিতা ও অগ্রজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিকূলে যখন সে মাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া শতক দুঃখ সহিয়াছে তখন স্বার্থবুদ্ধি তাহাকে সত্য-পথভ্রষ্ট করে নাই কেন? দুর্বলতা তখন ছিল কোথায়? স্বস্বীচরণে আস্থা ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা,—সমস্তই তাহার মায়ের মুখ চাহিয়া, সে কি সত্যই এমনি ক্ষুদ্রাশয়? তাহার পূজা-অর্চনা, তাহার গন্ধাস্ত্রান, তাহার টিকি রাখা,—তাহার সকল কাব্য, সকল অহুষ্ঠান—হোকনা ভ্রাতৃ, হোকনা মিথ্যা, তবু ত সে সকল বিজ্ঞপ, সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া অটল হইয়া ছিল! একি অপূর্বর অস্তিরচিত্ততার এত বড়ই নিদর্শন? আজ তবে সেই লোক বর্ষায় আসিয়া এমন হইয়া গেল কিরূপে? এবং এত কাল এতখানি দুর্বলতা তাহার লুপ্তমনে ছিল কোন্‌খানে? সন্ধ্যাচীর কাছে উত্তর জানিতে গিয়া যদি এই প্রশ্নই তাহার মুখে বাধিয়া গিয়াছে। শুধু ত কৌতূহলবশেই নহি, হৃদয়ের ব্যথার মধ্যে দিয়াই সে কতবার 'ভাবিয়া'ছে, এ সংসারে যাহা কিছু জানা যায় দাদা ত সমস্তই জানেন, তবে এ সমস্তারও উত্তর তিনিই করিয়া দিবেন। কেবল সন্ধ্যাচ ও সরমেই সে অপূর্বর প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেনাই।

ভাবিতে ভাবিতে সহসা নূতন প্রশ্ন তাহার মনে আসিল। কর্মদোষ

যখন সবাই অপূর্বর প্রতি বিরূপ তখনও শুদ্ধমাত্র যে লোকটির সহানুভূতি হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই,—সে সব্যসাচী। কিন্তু, কিসের জগৎ? শুধু কি কেবল ভগিনী বলিয়া তাহারই সমবেদনায়? তাহার স্নেহ পাইবার মত নিজস্ব কি অপূর্বর কিছুই ছিল না? সত্যসত্যই কি ভারতী এত ক্ষুদ্রই এত বৃহৎ ভালবাসা সমর্পণ করিয়া বসিয়াছে! সে ছদ্মবেশে সতর্ক করিবার মত পুঁজি কি কিছুই তাহার ছিল না? স্বয়ং কি তাহার এমনি কাঙাল, এমনি দেউলিয়া হইয়াই ছিল!

এমনি করিয়া একভাবে বসিয়া ঘণ্টা দুই সময় যখন কোথা দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, বি কিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন হোটেলের জরুরি কাজের মধ্যে সমস্ত আলোচনা নিঃশেষ করিয়া বাইবার তাহার অবসর ছিল না, এখন একটুখানি ছুটি পাইয়াছে। অপূর্ব ও ভারতীর নান্যথানে যে একটি রহস্যময় মধুর সম্বন্ধ আছে তাহা আভাসে-ইন্দ্রিতে অনেকেই জানিত, নিরপেক্ষ অবদিত ছিল না। তবে সহসা এমন কি ঘটিল যাহাতে অপূর্বর এতবড় বিপদের দিনেও ভারতী তাহার ছায়া-স্পর্শ করিল না? স্বীকৃত হইয়া এত বড় সমস্যাটো না জানা পর্যন্ত ক্ষান্তর মধ্যে অন্ন-জল কচিতেছিল না। তাই সে কোন একটা অজিনাথ উপস্থিত হইয়া প্রথমে অবাক হইল, পরে কহিল, কিছুই ত ছোঁওনি দেখি।

ভারতী লজ্জা পাইয়া তালতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, না!

বি মাথা নাড়িয়া, কণ্ঠস্বর ক্রম করিয়া কহিল, খাওয়া যায় না, দিদিমণি, যে কাণ্ড চোখে দেখে এলুম। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখে বে চল, ভাতের খালা আমার যেমন তেমন পড়ে রয়েছে,—মুখ দিয়েছি কি না দিয়েছি।

ইহার অবাস্তব সমবেদনায় ভারতীর সঙ্কোচের অববি রহিল না। জোর করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাউকে দিয়ে একখানা গাড়ী ডাকিয়ে দাও না বি।

যাবে বুঝি ?

হাঁ, একবার দেখি গিয়ে কি হল।

ক্ষান্ত বলিল, আজ সকালে ঠাকুরমশায়কে কি সাব্বি-সাদনা। আমি শুনে বলি সে কি কথা! মাতৃয়ের আপদে-বিপদে কোরব না তো আর কোরব কবে? হাতের কাজ পড়ে রইল, যেমন ছিলুম, তেমনি বেরিয়ে পড়লুম। ভাগ্যি তবু—

সেই সমস্ত পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় ভারতী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বাদ্য দিয়া কহিল, তুমি অসময়ে যা করেছ তার তুলনা নেই। কিন্তু, আর দেরি কোরোনা কি, গাড়ী একখানা আনিয়ে দাও। আমার যেতে হলে একটু বেলা-বেলি যাওয়াই ভাল। ঘরের কাজ-কর্ম ততক্ষণ সেরে রাখি।

কি লোক মন্দ নয়। স্কোটাডী ডাকিতে গেল, এবং দ্রুতমধ্যে সাহায্য করিবার আগ্রহে এমন কথাও জানাইল যে ঘরের কাজকর্ম আজ না হয় সে-ই করিয়া দিবে। এমন কি খাবার জিনিসগুলো যখন ছোঁয়া যায় নাই, তখন তাহাও পরিচার করিয়া দিতে তাহার বাদ্য নাই। শেষে কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিলেই চলিবে। বিদেশে বিভূষিত এমন করিতেই হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিনিট পনেরো পরে গাড়ী আসিয়া পৌছিলে ভারতী সঙ্গে কিছু টাকা লইয়া ঘরে-দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। শালায় আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখনও বেলা আছে। রাতনের একখানা উত্তর ঘরের ঘর দেখাইয়া দিয়া হিন্দুস্থানী দরওয়ান জানাইয়া দিল যে, বাঙালী বাবু ভিতরেই আছেন; এবং বাঙালী রমণীর কাছে বাঙলা ভাষাতেই প্রকাশ করিয়া জানাইল যে, যেহেতু তিন দিনের বেশি থাকার রুজু নাই, অথচ ছয় দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন ম্যানিজর সাবের লুটীশ হইলে তাহার নোক্রিতে বহুত গুলমাল হইয়া যাইবে।

ভারতী ইঙ্গিত বুঝিল। অঞ্চল খুলিয়া গুটি দুই টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া তাহারই নির্দেশমত উপরের ঘরে আসিয়া দেখিল সমস্ত মেঝেটা তখনও জলে থৈ থৈ করিতেছে, জিনিস-পত্র চারিদিকে ছড়ানো, এবং তাহারই একধারে একখানা কয়লের উপরে অপূর্ণ উপুড় হইয়া পড়িয়া। নূতন উত্তরীয় বস্ত্রখানা মুখের উপর চাপা দেওয়া,—সে জাগিয়া আছে কিম্বা ঘুমাইতেছে তাহা বুঝা গেল না। ভারতী শুনিয়াছিল সঙ্গে চাকর আসিয়াছে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও সে ছিল না, কারণ, অপরিচিত তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কেহ নিষেধ করিল না। মিনিট পাঁচ-ছয় স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভারতী দীর্ঘে দীর্ঘে ডাকিল, অপূর্ণবাবু!

অপূর্ণ উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের প্রতি একবার চাহিল, তারপরে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দ স্থিরভাবে থাকিয়া চোখ তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল। সন্ত মাতৃ-বিয়োগের দীর্ঘাঙ্গীন বেদনা তাহার মুখের উপরে জমাট হইয়া বসিয়াছে, কিন্তু, আবেগের চাক্ষু্য নাই,—শোকাক্ষুর গভীর দৃষ্টির সম্মুখে এ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই যেন তাহার একেবারে মিথ্যা হইয়া গেছে। মাতার পক্ষ-পুটছায়া-বাসী যে-অপূর্ণকে একদিন সে চিনিয়াছিল এ-সে-মানুষ নয়। আজ তাহাকে মুখোমুখি দেখিয়া ভারতী বিষ্ময়ে এমনি অবাচ্ হইয়া রহিল যে, কোন্ কথা বলিবে, কি বলিয়া ডাকিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু ইহার মীমাংসা করিয়া দিল অপূর্ণ নিজে। সে-ই কথা কহিল, বলিল, এখানে বসবার কিছু নেই, ভারতী, সমস্তই ভিজে, তুমি বরঞ্চ ঐ তোয়ঙ্গটার উপরে বোস।

ভারতী উত্তর দিল না, কবাটের চৌকাট ধরিয়া নতুনেত্র যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি স্থির হইয়া রহিল। তাহার পরে বহুক্ষণ অবধি দুজনের কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না।

হিন্দুস্থানী চাকরটা তেল কিনিতে দোকানে গিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে হারিকেন লঠনটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপূর্ব কহিল, ভারতী, বোস।

ভারতী বলিল, বেলা নেই, বসলে সকলো হয়ে যাবে যে!

এখুনি যাবে? একটুও বসতে পারবে না?

ভারতী ধীরে ধীরে গিয়া সেই তোবড়টার উপরে বসিয়া এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, মা যে এখানে এসেছিলেন আমি জানতাম না। তাঁকে দেখিনি, কিন্তু বৃকের ভেতরটা আমার পুড়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে তুমি আমাকে আর দুঃখ দিও না। বলিতে বলিতে চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল।

অপূর্ব স্তব্ধ হইয়া রহিল। ভারতী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, সময় হয়েছিল, মা স্বর্গে গেছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, এজন্মে তোমাকে আর আমি মুখ দেখাতে পারবো না, কিন্তু এমন কোরে তোমাকে ফেলে রেখেই বা আমি থাকবো কি করে? সঙ্গে গাড়ী আছে, ওঠো, আমার বাসায় চল। আবার তাহার চক্ষু অশ্রুপ্রাবিত হইয়া উঠিল।

ভারতীর ভয় ছিল অপূর্ব হয়ত শেষ পর্যন্ত ভাঙিয়া পড়িবে, কিন্তু তাহার শুষ্ক চক্ষে জলের আভাস পর্যাস্ত দেখা দিল না, শান্তস্বরে বলিল, অশৌচের অনেক হাঙ্গামা ভারতী, ওখানে স্নানও হবে না। তাড়াতাড়ি এই শনিবারের ঠিমায়েই আমি বাড়ী ফিরে যাবো।

ভারতী বলিল, শনিবারের এখনো চার দিন দেরি। মায়ের মৃত্যুর পরে হাঙ্গামা যে একটু থাকে সে আমি জানি, কিন্তু সহিতে পারবোনা আমি, আর পারবে এই অতিথি-শালার লোকে? চল।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ভারতী কহিল, না বললেই যদি এই অবস্থায় ফেলে রেখে তোমাকে তেঁতে পারতাম, আমি আস্তাম না, অপূর্ণবাবু। এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত্ত নিশ্চিন্দে থাকিয়া কহিল, এতদিনের পরে তোমাকে ঢেকে বলবার, রজ্জ কয়ে বলবার আর আমার কিছুই নেই। মায়ে'র শেষ কাজ বাকি — শনিবারের জাহাজে তোমাকে বাড়ী ফিরে যেতেই হবে এবং তার পরে যে কি হবে সেও আমি জানি। তোমার কোন ব্যবস্থাতেই আমি বাধ দেব না, কিন্তু এ সময়ে এ ক'টা দিনও যদি তোমাকে চোখের ওপর না রাখতে পারি, ত তোমারই দিবা করে বল্চি, বাসায় ফিরে গিরে আছ আমি বিষ খেয়ে মরবো। মায়ে'র শোক তাতে বাড়বে বই কমবে না, অপূর্ণবাবু।

অপূর্ণ অধোমুখে মিনিট দুই চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চাকরটাকে তা'হলে ডাকো, জিনিস-পত্রগুলো সব পেরে কেলুক।

জিনিসপত্র নামানুই ছিল, গুছাইয়া বাঁধিয়া গাড়ীতে তুলিতে আপ-কটার অধিক সময় লাগিল না। পথের মধ্যে ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, হাদা আস্তে পারলেন না ?

অপূর্ণ কহিল, না, তাঁর ছুটি হোলো না।

এখানকার চাকরি কি ছেড়ে দিয়েছ ?

ঈ, সে একরকম ছেড়েই দেওয়া।

মা'র কাঙ্ক্ষা চুকে গেলে কি এখন বাড়ীতেই থাকবে ?

অপূর্ণ কহিল, না। মা নেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা দিনও গ-বাড়ীতে আমি থাকতে পারবোনা। শুনিয়া ভারতীর মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

(৩০)

পরিত্যক্ত, পতনোন্মুখ, ঘন-বনাচ্ছন্ন যে জীর্ণ মহৌর মনো একদিন অপূর্বর অপরাধের বিচার হইয়াছিল, আজ আবার সেই কবেই পথে-দাবী আহুত হইয়াছে। সে দিনের সেই অবরুদ্ধ গৃহতলে যে দুজ্জয় ক্রোধ ও নির্ধম প্রতিহিংসার অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জলিয়াছিল, আজ তাহার স্কলিঙ্গমাত্র নাই। সে বাদী নাই, প্রতিবাদী নাই, কাহারো বিরুদ্ধে কাহারো নালিশ নাই, আজ শঙ্কা ও নৈরাশ্যের দুঃসহ বেদনায় সমস্ত সভা নিম্প্রভ, বিয়গ্ন, স্ত্রিয়মাণ। ভারতীর চোখের কোণে অশ্রুবিन्दু,—স্বমিত্রা অধোমুখে নীরব, স্থির। তলওয়ারকর দ্বারা পড়িয়াছে; রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত দেহে সে জেলের হাদপাতালে,—আজও তাহার ভাল করিয়া জ্ঞান হয় নাই। তাহার স্ত্রী শিশুকণ্ঠা লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া অনেক দুঃখে কাল সন্ধ্যায় কে একজন মারহাটি ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে। স্বমিত্রা সন্ধান লইয়া তাহার পিতৃগৃহে আজ তার করিয়াছে কিন্তু এখনও জবাব আসে নাই।

ভারতী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তলওয়ারকর বাবা কি হবে দাদা ?

ডাক্তার কহিলেন, হাদপাতাল থেকে যদি বেঁচে ওঠে জেল বাটুবে।

ভারতী মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, বলিল, না বাচতেও ত পারেন।

ডাক্তার কহিলেন, অন্ততঃ অসম্ভব নয়। তারপরে সুদীর্ঘ কাল।

ভারতী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তাঁর দাদা, তাঁর ছোট্টমেয়ে,—তাদের কি হবে ?

স্বমিত্রা এ কথা'র জবাব দিয়া কহিল, হয়ত দেশ থেকে তার বাপ এসে নিয়ে যাবেন।

ভারতী বলিল, হয়ত ! ধরুন, যদি কেউ না আসেন ? যদি কেউ না থাকে ?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে মানুষ অকস্মাৎ মারা গেলে তার নিকপায় বিধবার যে দশা হয়, এদেরও তাই হবে। একটুপানি খামিয়া কহিলেন, আমরা গৃহী নই, আমাদের ধন-সম্পদ নেই, বিদেশীর আইনে নিজের জন্মভূমিতেও আমাদের মাথা রাখবার ঠাই নেই,—বহু পশুর মত আমরা বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াই,—সংসারীর দুঃখ মোচন করবার ত আমাদের শক্তি নেই ভারতী।

ভারতী ব্যথিত হইয়া কহিল, তোমাদের নেই, কিন্তু বাদের এসব আছে,—আমাদের এই দেশের লোকে কি এঁদের দুঃখ দূর করতে পারেনা দাদা ?

ডাক্তার দ্রুত হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু করবে কেন দিদি ? তারা ত এ কাজ করতে আমাদের বলে না ! বরঞ্চ আমরা তাদের স্বস্তির বাধা, আরামের অন্তরায়,—আমাদের তারা সোনার চক্ষে দেখেনা। ইংরাজ বহন দস্তভরে প্রচার করে, ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা চায়না, পরাধীনতাই কামনা করে, তখন ত তারা নেহাৎ মিথ্যে বলেনা ! আর যুগ-যুগান্তের অন্ধকারের মধ্যে বসে ছুচোপের দৃষ্টি বাদের বন্ধ হয়ে গেছে তাদের বিকল্পেই বা হা হতাশ করবার কি আছে ভারতী !

মুহূর্তকাল নোন খাকিয়া কহিলেন, বিদেশী রাজার জেলের মধ্যে যদি আজ তলওয়ারকরণে মরতেই হয়, পরলোকে দাঁড়িয়ে জ্বী-কত্নাকে পথে পথে ভিক্ষে করতে দেখে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়া পড়বে, কিন্তু নিশ্চয় জেনো দেশের লোকের বিকল্পে সে ভগবানের কাছেও কখনো একটা নালিশ জানাবেনা। আমি তাকে চিনি, লজ্জার তার যুখ টুটবেনা।

ভারতী অশ্রুটে কহিল, উঃ !

কৃষ্ণ আইয়ার বাড়ী বলিতে পারিতনা, কিন্তু, মাঝে মাঝে বুদ্ধিত ; সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, ইয়েস, টু !

ডাক্তার বলিলেন, হ্যাঁ, এইত সত্য! এইত বিপ্লবীর চরম শিক্ষা! কারা কার তরে? নালিশ কার কাছে? দাদার যদি কঁাসি হয়েছে শোনে, জেনো, বিদেশীর ছকুমে সে কঁাসি তার দেশের লোকেই তার গলায় বেঁধে দিয়েছে! দেবেই ত! কসাই-খানা থেকে গরুর মাংস গরুতেই ত বয়ে নিয়ে আসে! তার আবার নালিশ কিসের বোন?

ভারতী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, দাদা, এই ত তোমাদের পরিণাম!

ডাক্তারের চোখ জলিয়া উঠিল, কহিলেন, একি তুচ্ছ পরিণাম ভারতী? জানি, দেশের লোকে এর দাম বুঝবে না, তবুত উপাস্য করবে, কিন্তু যাকে এই স্বপ্ন একদিন কড়ায় গণ্ডায় শোষ দিতে হবে, যদি তার মুখে কিছু সহজে বোগাবে না! এই বলিয়া মহসা নিজেই হাসিয়া কহিলেন, ভারতী, নিজে ক্রীষ্টান হয়ে তুমি তোমার ধর্মের গোয়ার কথাটাই ভুলে গেলে? বিস্ময়প্রেরক রূপে কি সংসারে বাণীত হয়েছে তাহা?

সকলেই শুকু হইয়া বসিয়া রহিল, ডাক্তার পুনশ্চ কহিলেন, তোমরা ত জানো বুঝা নরহত্যার আমি কোনদিন পক্ষপাতী নই, ও আমি দর্শনাত্মকরণে সন্মত করি। নিজে হাতে আমি একটা পিঁপড়ে মারাত গ পারি। কিন্তু প্রয়োজন হলে,—কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা সায় দিয়া বলিল, সে আমি জানি, নিজের চোখেই আমি বার জুই দেখেছি।

ডাক্তার কহিলেন, দূর থেকে এসে যারা জন্মভূমি আমার অধিকার করেছে, আমার মৃত্যু, আমার মর্যাদা, আমার ফুবার অন্ত, তুষার জল,—সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার? এ ধর্মবুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে ভারতী? ছি!

কিন্তু আজ ভারতী অভিভূত হইলনা, সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, না দাদা আজকে আমাকে তুমি কিছুতেই লজ্জা দিতে পারবেনা। এসব পুরানো কথা,—হিংসার পথে বারাই প্রযুক্তি দেয়, তারাই এমনি করে বলে! এই শেষ কথা নয়, জগতে এর চেয়েও বড়, এর বড় কথা আছে।

ডাক্তার কহিলেন, কি আছে বল শুনি?

ভারতী উচ্ছ্বাসিতস্বরে বলিয়া উঠিল, আমি জানিনে, কিন্তু তুমি জানো। যে বিদ্যেব তোমার সত্যবুদ্ধিকে এমন একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, একবার তাকে ত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরে এসো, তোমার জ্ঞান, তোমার প্রতিভার কাছে পরাস্ত মানবেনা এমন সমস্তা পৃথিবীতে নেই। জোরের বিরুদ্ধে জোর, হিংসার বদলে হিংসা, অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার এ তো বর্ধিততার দিন থেকেই চলে আসছে। এর চেয়ে মহৎ কিছু কি বলা যায় না?

কে বলবে?

ভারতী অকুণ্ঠিতস্বরে কহিল, তুমি।

এটি আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। সাহেবের বুটের তলায় চিত্ হয়ে শুয়ে শান্তির বাণী আমার মুখ দিয়ে দিক বার হবে না,—হয়ত আটকাবে। বয়স্ক ড-ডার শরীকে দাও তোমার খাতিরে ও পারবে। এই বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন।

ভারতী ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, তুমি ঠাট্টা করলে বটে, কিন্তু যাদের পরে তোমার এত বিদ্যেব, সেই ইংরেজ মিশনারিদেরই অনেকের কাছে বলে দেখেছি তাঁরা সত্যই আনন্দলাভ করেন।

ডাক্তার স্বীকার করিয়া কহিলেন, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভারতী। জন্দরবনের মধ্যে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে শান্তির বাণী প্রচার করলে বাঘ-ভালুকের খুদী হবারই কথা। তাঁরা সাধু ব্যক্তি।

ভারতী এই বিজ্ঞপে কান দিল না, কহিতে লাগিল, আজ ভারতের যত দুর্ভাগ্যই আসুক, চিরদিন এমন ছিল না। একদিন ভারতবাসী সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। সে দিন হিংসা বিদ্বেষ নয়, ধর্ম এবং শান্তিমন্ত্রই এই ভারতবর্ষ থেকে দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস সেদিন আবার আমাদের ফিরে আসবে।

বহুক্ষণ হইতেই ভারতীর বাক্যে শশীর কবি-চিত্র শ্রদ্ধায় ও অত্যাগে বিগলিত হইয়া আসিতেছিল। সে গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ভারতীকে আমি সম্পূর্ণ অহুমোদন করি ডাক্তার। আমারও বিশ্বাস সে সভ্যতা ভারতের ফিরে আসবেই আসবে।

ডাক্তার উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তোমরা ভারতের কোন্ যুগের সভ্যতার ইঙ্গিত কোরচ আমি জানিনে, কিন্তু সভ্যতার একটা সীমা আছে। ধর্ম, অহিংসা এবং শান্তির নেশায় তাকে অতিক্রম করে গেলে মরণ আসে। কোন দেবতাই তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভারতবর্ষ হুনদের কাছে কবে পরাজয় স্বীকার করেছিল জানো? যখন তারা ভারতবাসী শিশুদের মশালের মত করে জ্বালাতে আরম্ভ করেছিল, নারীর পিঠের চামড়া দিয়ে লড়াইয়ের বাজনা তৈরি করতে শুরু করেছিল। সে অভাবিত নৃশংসতার জবাব ভারতবাসী দিতে শেখেনি। তার ফল কি হল? দেশ গেল, রাজ্য গেল, দেবমন্দির ধ্বংস বিধ্বস্ত হয়ে গেল,—সে অক্ষমতার শাস্তি আজও তা দেব ফুরোয়নি।

ভারতীকে লক্ষ করিয়া কহিলেন, তুমি কবির শ্লোক প্রায় আবৃত্তি করে বল, গিয়াছে দেশ দুঃখ কি, আবার তোরা মানুষ হ। কিন্তু দেশ ফিরে পাবার মত মানুষ হওয়া কাকে বলে শুনি? ভেবেচ, মানুষ হবার পথ তোমার অব্যাহত? মুক্ত? ভেবেচ, দেশের দরিদ্র-নারায়ণের সেবা আর ন্যায়বিচার কুইনি জুগিয়ে বেড়ানোকেই মানুষ হওয়া বলে?

বলে না। মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্যাদা বোধকেই মানুষ হওয়া বলে।
মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তোমার বিশেষ অপরাধ
এই ভারতী। ওদের আবহাওয়ার মধ্যেই তুমি প্রতিপালিত, তাই
তোমার মনে হয় ইউরোপের ক্রীষ্টান সভ্যতার চেয়ে বড় সভ্যতা আর
নেই। অথচ, এতবড় মিছে কথাও আর নেই। সভ্যতার অর্থ কি
শুধু মানুষ-মারার কল তৈরি করা? দুরাগার ছলের অভাব হয় না,—
অতএব আত্ম-রক্ষার ছলে এর নিত্য নূতন সৃষ্টিরও আর বিরাম নেই।
কিন্তু সভ্যতার যদি কোন তাৎপর্য থাকে ত সে এই যে, অক্ষম ও
দুর্বলের ক্রাণ্য অধিকার যেন প্রবলের গায়ের জোরে পরাভূত না হয়।
কোথাও দেখেচ এদের এই নীতি, এই ক্রাণ্যের গোরব দিতে? একদিন
তোমাকে বলেছিলাম পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখতে। স্বরণ
আছে সে কথা? মনে আছে আমার মুখে চীনদেশের বন্ধার বিজ্রোহের
গল্প? স্ফুভা ইউরোপিয়ান পাণ্ডয়ারের দল ঘর-চড়াও হয়ে তাদের যে
প্রতিহিংসা দিলে কোথায় লাগে তার কাছে চেঙ্গিস খাঁ ও নাদির শাহ
বীভৎসতার কাহিনী? সূর্যের কাছে দীপের মত সে অকিঞ্চিৎকর।
ওতু যত তুচ্ছ এবং যত অগ্রায় হোক, লড়াইয়ের ছুতো পেলে এদের
আর কিছুই বাধে না। বৃদ্ধ, শিশু, নারী,—সব্বোচ নেই, দ্বিধা নেই,—যে
পাণের সীমা হয় না, ভারতী, সেই বিঘাত্ত বাষ্পের নরহত্যাতেও নৈতিক
বুদ্ধি এদের বাধা দেয় না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে যে-কোন উপায়
যে-কিছু পথই এদের সুপবিত্র। কেবল নীতির বাধা, ধর্মের নিষেধ
কি শুধু নির্বাসিত পদদলিত আমারই বেলায়?

ভারতী নিরন্তরে বসিয়া রহিল। এই সকল অভিযোগের প্রতিবাদের
সে কি জানে? যে নিশ্চয়, একান্ত দৃঢ়-চিত্ত, শঙ্কাহীন, ক্ষমাশীল বিপ্লবী,
জ্ঞান, বুদ্ধি ও পণ্ডিত্যের যাহার অন্ত নাই, পরাদীনতার অনির্বাক্য

অগ্নিতে যাহার সমস্ত দেহ মন অহিনিশি শিখার মত জলিতেছে, যুক্তি দিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবার সে কোথায় কি খুঁজিয়া পাইবে? জবাব নাই, ভাষা তাহার মুক হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার কলুষ-হীন নারী-জল অন্ধ কল্পণায় নিঃশব্দে মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুমিত্রা অনেকদিন হইতেই এই সকল বাদ-প্রতিবাদে যোগ দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল, আজিও সে অবোমুখে শুক হইয়া রহিল, শুধু অমহিক হইয়া উঠিল কৃষ্ণ আইয়ার। আলোচনার বহু অংশই সে বুঝিতে পারিতেছিল না, এই নীরবতার মাঝখানে সে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের সভার কাজ আরম্ভ হবার আর বিলম্ব কত?

ডাক্তার কহিলেন, কোন বিলম্বই নেই। সুমিত্রা, তোমার জাত্য ফিরে বাওয়াই স্থির?

হ্যাঁ।

কবে?

বোধ হয় এই বুধবারে। গত শনিবারে পারিনি।

পথের-দাবীর সংস্পর্শ তুমি ত্যাগ করলে?

সুমিত্রা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

পত্ন্যন্তরে ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন। তারপরে পকেট হইতে কয়েকপানা টেলিগ্রামের কাগজ বাহির করিয়া সুমিত্রার হাতে দিয়া বলিলেন, পড়ে দেখ। হীরা সিং কাল রাতে দিয়ে গেছে।

আইয়ার ঝুঁকিয়া পড়িল, ভারতী প্রজ্বলিত মোমবাতি তুলিয়া ধরিল। স্বদীর্ঘ টেলিগ্রাম ভাষা ইংরাজী, অর্থশ্রম স্পষ্ট, কিন্তু সুমিত্রার মুখ গভীর হইয়া উঠিল। মিনিট দুই তিন পরে সে মুখ তুলিয়া কহিল, কোডের সমস্ত কথা আমার মনে নেই। আমাদের সাংসাহিকের জ্যামেদার কুব এবং কুগার তার পাঠিয়েছে, এছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ডাক্তার বলিলেন, ক্রুগার ওয়ার করেছে ক্যান্টন থেকে। সাংহাইয়ের জ্যামেকা রুবে ভোরবারে পুলিশ ঘেরাও করে,—তিনজন পুলিশ আর আমাদের বিনোদ মারা গেছে। দুই ভাই মহতপ ও স্মাংহাই এক সঙ্গে দরা পড়েছে। অযোধ্যা হংকঙে,—দুর্গা, সুরেশ পেনাঙে,—সিঙ্গাপুরের জ্যামেকা রুবের জন্তে পুলিশ সমস্ত সহর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। মোট সুসদ্যদটা এই।

গবর শুনিয়া কৃষ্ণ আইয়ার পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, ড্যান্!

ডাক্তার কহিলেন, ওরা দু'ভাই যে রেজিমেন্ট ছেড়ে কবে, এবং কেন সাংহাইয়ে এলো জানিনে। স্মিত্রা, ব্রজেন্দ্র বাস্তবিক কোথায় জানো কি?

প্রশ্ন শুনিয়া স্মিত্রা পাথর হইয়া গেল।

জানো?

প্রথমে তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর কুটিল না, তাহার পরে ঘাড় নাড়িয়া কেবল বলিল, না।

কৃষ্ণ আইয়ার কহিল, সে একাজ করতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না।

ডাক্তার হাঁ, না কিছুই বলিলেন না,—নিশেধে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শশী কহিল, ব্রজেন্দ্র জানে আপনি হাঁটা-পথে বন্দী থেকে বেরিয়ে গেছেন।

ডাক্তার একথাও উত্তর দিলেন না, তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

মুখে শব্দ নাই, বাক্য নাই, নৃতির মত সকলে নিশেধে বসিয়া। সম্মুখে টেলিগ্রাফের সেই কাগজগুলো পড়িয়া। বাতি পুড়িয়া নিশেষ হইতেছিল, শশী আর একটা জালিয়া মেঝের উপর বসাইয়া দিল। মিনিট দশেক এই ভাবে কাটিবার পর, প্রথম চেতনার লক্ষণ দেখা দিল

আইয়ারের দেহে। সে পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া বাতির আগুনে ধরাইয়া লইয়া ধূয়ার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, নাউ ফিনিশ্‌ড!

ডাক্তার তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন। প্রত্যুত্তরে সে সিগারেট পুনশ্চ একটা বড় টান দিয়া শুধু ধূম উদ্গীর্ণ করিল। শশী মদ পাইত, কিন্তু তামাকের ধূয়া সহ্য করিতে পারিত না। এখন সে থামোকা একটা চুরুট ধরাইয়া ঘন ঘন টানিয়া ঘর অন্ধকার করিয়া তুলিল।

আইয়ার কহিল, ওয়াষ্ট ল্যাক্। উই মস্ট ষ্টপ্!

শশী কহিল, আমি আগেই জান্তাম। কিছুই হবেনা, শুধু—

ডাক্তার সহসা প্রশ্ন করিলেন, তুমি কবে যাবে বললে? বুধবারে?

স্মিত্রা মুখ তুলিয়া চাহিল না, মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

শশী পুনরায় বলিল, এতবড় পৃথিবী-জোড়া শক্তিমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবের চেষ্টা-করা শুধু নিষ্ফল নয়, পাগলামি। আমি ত বরাবরই বলে এসেছি ডাক্তার, শেষ পর্যন্ত কেউ থাক্বে না।

আইয়ার কি বুঝিল সেই জানে, মুখ দিয়া অপরাধাশ্রয় ধূম নিষ্কাশন করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ট্রু।

ডাক্তার সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজকের মত সভা আমাদের শেষ হল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলেই অভিনত ব্যক্ত হইল, করিল না শুধু ভারতী। সে নীরবে ডাক্তারের পাশে আসি তাহার ডান হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, দাদা, আমাদের না বলে বোথাও চলে যাবে না বল।

ডাক্তার মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু তাহার বজ্রকঠিন মূঠার মধ্যে যে ক্ষুদ্র কোমল হাতখানি ধরা ছিল তাহাতে একটুখানি চাপ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

(৩১)

পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমা হইতেছিল, রাত্রি ফোঁটাকয়েক জলও পড়িয়াছিল, কিন্তু আজ মধ্যাহ্ন কাল হইতে কুষ্টি এবং বাতাস চাপিয়া আসিল। কাল ভারতী স্মিত্রাকে যাইতে দেয় নাই, কথা ছিল, আজ খাওয়া-দাওয়ার পরে সে বিদায় নইয়া বাসায় যাইবে। কিন্তু এমন দুর্যোগ শুরু হইল যে, বাহিরে পা বাড়ানো শক্ত, নদী পার হওয়া ত দূরের কথা। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাড় ও জল উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। শশী হিন্দুহোটেলে থাকে, দুপুরবেলা বেড়াইতে আসিয়াছিল, এখনও ফিরিতে পারে নাই। বেলা কখন শেষ হইল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, জানাও গেল না। ভারতীর উপরের ঘরে জানালা কবাট বন্ধ করিয়া আলো জালিয়া বৈঠক বসিয়াছে। স্মিত্রা অপদমন্তক চাপা দিয়া আরাম কেরারায় শুইয়া, শশী খাটের উপরে উঁখু হইয়া বসিয়া, নীচে কহলের শব্দাদ্ অপরূপ, এবং তাহারই জনযোগের আয়োজনে মেঝের উপরে বঁটি পাতিয়া বসিয়া ভারতী কল ছাড়াইতেছে। অনতিদূরে একধারে ধোঁহের উপরে মুগের ডালের খিচুড়ি টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে।

অপরূপ বলিয়াছিল সংসারে তাহার আর রুচি নাই, সন্ন্যাসই তাহার একমাত্র শ্রেয়ঃ। শশী এই প্রস্তাব অস্বীকার করিতে পারে নাই, সে তৃত্ব সহযোগে খণ্ডন করিয়া বুঝাইতেছিল যে, একরূপ অভিসন্ধি ভাল নহে, কারণ, সন্ন্যাসের মধ্যে আর মজা নাই; বরঞ্চ, বরিশাল কলেজে প্রফেসরির আবেদন যদি মঞ্জুর হয় ত গ্রহণ করাই কর্তব্য।

অপরূপ ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু কথা কহিল না। ভারতী সমস্তই জানিত, তাই সেই ইহার জবাব দিয়া বলিল, জীবনে মজা করে বেড়ানো ছাড়া কি মানুষের আর বড় উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, শশিবাবু? পৃথিবীতে সকলের চোখের দৃষ্টিই এক নয়।

তাহার কথা বলার ধরণে শরী অপ্রতিভ হইল। ভারতী পুনঃ কহিল, ওঁর মনের অবস্থা এত ভাল নয়, এ সময়ে ওঁর ভবিষ্যৎ কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা শুধু নিষ্ফল নয়, অবিহিত। তার চেয়ে বরক আমাদের নিজেদের—

আমার মনে ছিলনা ভারতী।

শরীর মনে না থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। ইতিমধ্যে অপূর্ণ আরও একটা ব্যাপার ঘটয়াছে, যাহা ভারতী ব্যতীত অপরে জানিত না। সাংসারিক হিসাবে তাহার ফল ও পরিণাম মাতৃ-বিয়োগের অপেক্ষা বিশেষ কম নহে। জননীৰ মৃত্যু সংবাদে অপূর্ণের দাদা বিনোদবাবু দুঃখ করিয়া তার করিয়াছেন, কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু নহে। মা বাগ করিয়া, সম্ভবতঃ, অত্যন্ত অপমানিত হইয়া অবশেষে গঙ্গা-বিহীন, স্বেচ্ছদেশ বর্ষায় আপনাকে নির্বাসিত করিয়াছেন বৃষ্টিতে পারিয়া অপূর্ণ দুঃখে, কোণে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। যে দুই দিন কলিকাতায় ছিল, বাসিতে খায় নাই, শোয় নাই এবং ফিরিবার মুখে রীতিমত কলহ করিয়াই আসিয়াছিল। তবানি, এত বড় ভয়ানক দুর্ঘটনার সকলের কনিষ্ঠ হইয়া তাহার নিঃসন্দেহ ভরসা ছিল, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য কেহ-না-কেহ আনিবেই আনিবে। তেওয়ারী থাকিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু নে-ও নাই ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছে।

বাঙালী পুরোহিত এখানেও আছে, আজই সকালে অপূর্ণ ভারতীকে ডাকিয়া কহিয়াছিল, নে কলিকাতায় যাইবেনা, যেমন করিয়া পারে মাতৃশ্রাদ্ধ এখানেই সম্পন্ন করিবে।

মাতার আকস্মিক আগমনের হেতু যে ছেলেদের প্রতি দুর্জয় মান-অভিমান,—এ খবর অপূর্ণ জানিয়া আসিয়াছিল, শুধু, কতখানি যে ক্রৌঞ্চান কথা ভারতীর কাহিনী সংশ্লিষ্ট ছিল ইহাই জানে নাই।

সাংঘাতিক পীড়িতা অর্চতত্ত্ব-প্রায় জননীর বলিবার অবকাশ ঘটিল না, এবং বিনোদবাবু রাগ করিয়া বলিলেন না।

সহস্রমুখের আবরণ সারাইয়া জুমিহা উঠিয়া বসিল, কহিল, নীচেকার দরজা খুলে কে যেন ঢুকলো ভারতী।

বাতাস ও বারিপাতের অবিশ্রান্ত বাবু বাবু শব্দের মাঝখানে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া কঠিন! শব্দায় সকলেই চকিত হইয়া উঠিল, ভারতী একমুহুর্ত কান খাড়া করিয়া মুহূর্তে বলিল, না, কেউ নয়। অশূলবাবুর চাকরটা শুধু নীচে বসে আছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে সিঁড়িতে পরিচিত পদ শব্দে আনন্দ কলরোলে চাংকার করিয়া উঠিল, দাদা, এ যে দাদা! এক হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার, এক লক্ষ প্রসেলবম্! হাতের কল এবং বটি ফেলিয়া সিঁড়ির মুখে ছুটিয়া গিয়া বলিল, এক কোর দশ কোর বিশ কোর হাজার হাজার কোর গুড্‌ইভ্‌নিং দাদা, সাদৃশ্যের এসো!

দশদশাটী ঘরে ঢুকিয়া পিঠের প্রকাণ্ড বোচ্কা নামাইতে নামাইতে সহাস্র কবিলেন, গুড্‌ইভ্‌নিং! গুড্‌ইভ্‌নিং!

ভারতী তাঁহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, এটো দেব দাদা, তোমার জগে পিচুড়ি বাঁদচি। ওভারকোটটা আগে খোলো। হা—জুতোটুতো নব ভিজে গেছে, দাঁড়াও আগে আমি খুলে দি। এই বলিয়া সে আগে কেট খুলিবে, না, হেঁট হইয়া বুটে ফিতা খুলিবে ঠিক করিতে পারিল না। চেয়ারের কাছে টানিয়া আনিয়া ধোর করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, আমি জুতো খুলে দি। আচ্ছা, এটো বুটতে একটা গাড়ী করে আনতে নেই! হাঁ দাদা, ওবেলা কি খেয়েছিলে? শেট ভরেছিল? ভালো কথা! ঠাকুর মশায়ের ঘোটেলে আজ মাংস বাগা হয়েচে আমি খবর পেয়েছি, আনবো দাদা, দুটে গিয়ে এক বাটি? খাবে? সত্যি বল।

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, আরে, এ আমাকে আজ পাগল করে দেবে না কি !

ভারতী জুতা খুলিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাথায় তাঁহার হাত দিয়া বলিল, যা' ভেবেচি ঠিক তাই। ঠিক যেন নেয়ে উঠেচি এমন ভিজে। এই বলিয়া সে আন্না হইতে তাড়াতাড়ি তোয়ালে আনিতে গেল।

মিনিট খানেকের মধ্যে ছেলেমানুষের মত এমনি কাণ্ড করিল যে, শশী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আপনাকে যেন ভারতী দু'দশ বছর পরে দেখতে পেয়েছেন।

ডাক্তার কহিলেন, তার চেয়েও বেশি। এই বলিয়া ভারতীর হাত হইতে তোয়ালে টানিয়া লইয়া কহিলেন, ওর আদরের জালায় আমার প্রাণটা গেল।

প্রাণ গেল ? তবে, থাকো বসে। এই বলিয়া ভারতী কৃত্রিম অভিমান ভরে তাহার ফল ছাড়াইতে ফিরিয়া গিয়া বসি লইয়া বসিল। তাহার বন্ধু, সখা, সহোদরের অধিক আত্মীয়—আজিকার এই দুঃখ্যোগের মধ্যে তাহার অপ্রত্যাশিত, অভাবিত আগমনে স্নেহে, আশ্রয়, গর্বে ও স্বার্থহীন নিষ্পাপ প্রীতিতে তাহার হৃদয় উপ্চিয়া পড়িয়াছে,— আপনাকে সে সম্বরণ করিবে কি দিয়া ? আতিশয্য যদি হইয়াই থাকে তাহাকে বাধা দিবে কিসে ? সুমিত্রা নিঃশব্দে দেখিতেছিল, মনে মনে রহিল, কিন্তু ঘণা ও নিগূঢ় ঈর্ষায় রচিত যে দুর্ভেদ্য যবনিকা তর্কিত তাহার চোখের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অকস্মাৎ অদম্যবিরত হইয়া যতদূর দেখা যায় শুধু অনাবিল মৌহুতের স্বচ্ছ স্রোতস্বতীই সে এই ছুটি নব নারীর মাঝখানে প্রবাহিত দেখিতে পাইল। মুহূর্তের জন্তও কখনো যে তথায় কলুষ স্পর্শ করিয়াছে, মনে করিতে আজ তাহার মাথা হেঁট হইল। গোপন করিয়া করিবার, লজ্জা করিয়া করিবার

ভারতীয় কিছুই ছিল না বলিয়াই সে এমন লজ্জাহীন মত ব্যবসায়ীরা আপনার হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল, এ কথা আজ স্মিত্রা বুলিল।

এতক্ষণ মাহুটিকে লইয়া ভারতীয় ব্যস্ত ছিল, এখন বোচকাটির প্রতি তাহার লক্ষ্য পড়িল। উদ্বিগ্ন শব্দায় ব্রহ্ম হইয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এই বাড়-জলের মধ্যে সহচরটিকে সঙ্গে এনেছ কেন বলত? কোথাও চলে যাচ্চো না তো? মিথ্যে বলে ঠকাতে পারবেনা তা' বলে রাখছি, দাদা।

ভক্তার হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার মুখের চেহারা নিজেই মুখে আর হাসি আসিল না, তথাপি তামাসার ভঙ্গীতে লঘু করিয়া কহিলেন, যাবো না তো কি রামদাসের মত ধরা পোড়ব নাকি?

শশী মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক তাই।

ভারতীয় রাগ করিয়া কহিল, ঠিক তাই! আপনি কি জানেন শশিবাবু, যে মতামত দিচ্ছেন!

বাঃ জানিনে?

কিছু জানেন না!

ভক্তার হাসিমুখে কহিলেন, বাগড়া করলে খিচুড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা অপূর্বশাবু, কালকের জাহাজে না গেলে ত আপনি সময়মত পৌছতে পারবেন না।

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, মাঘের শ্রাদ্ধ আমি এখানেই কোরব ভক্তার।

এখানে? হেতু?

অপূর্ব মৌন হইয়া রহিল, ভারতীয়ও জবাব দিল না।

ভক্তার মনে মনে বুঝিলেন কি একটা ঘটনা ঘটিয়াছে বাহা প্রকাশ করিবার নয়। কহিলেন, বেশ, বেশ। তা'হলে ফিরে যাবারই যা দরকার কি? চাকরিটা আপনার আছে না?

অপূর্ব ইহারও উত্তর দিল না। শশী কহিল, অপূর্ববাবু সম্মান নেবেন।

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, সম্মান ? এ আবার কি কথা ! •

তাহার হাসিতে অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইল। কহিল, সংসারে যার কুচি নেই, জীবন বিস্মাদ হয়ে গেছে, এ ছাড়া তার আর পথ কি আছে ডাক্তার ?

ডাক্তার কহিলেন, এ সব বড় বড় আধ্যাত্মিক ব্যাপার, অপূর্ববাবু, এর মধ্যে অনধিকার চর্চা করতে আমাদের আর প্রলুব্ধ করবেন না, তার চেয়ে বরঞ্চ শশীর মত নিন, শু জানে শোনে। ইস্কুলে ফেল্ হয়ে একবার শু বছরখানেক ধরে এক সাধু-বাবার চেলোগিরি করেছিল।

শশী সংশোধন করিয়া বলিল, দেড় বছরের ওপর। প্রায় দু বছর।

স্মিত্রা ও ভারতী হাসিতে লাগিল। অপূর্বর গাভীরা ইহাতে টলিল না, সে কহিল, মায়ের মৃত্যুর জন্তে আমার নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হয়, ডাক্তার। 'সে দিন থেকে আমি নিরন্তর এই কথাই ভেবে আসছি! যথার্থই সংসারে আমার প্রয়োজন নেই, এ আমার কাছে তিত্ত হয়ে এসেছে।

ডাক্তার স্বর্ণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বোধ হয় তাহার হৃদয়ে সত্যকার বাণী উপলব্ধি করিলেন, সম্মুখে মুহূর্ত্তে বলিলেন, মাল্লবের এই দিকটা কখনো আমার ভেবে দেখবার আবশ্যক হয়নি অপূর্ববাবু, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, হয়ত, এ ভুল হবে। তিন মাস মধ্যে দিয়ে সংসার ছেড়ে শুধু হতভাগ্য লক্ষীছাড়া জীবনই যাঁ কৰা চলে, কিন্তু বৈবাগ্য সাধনা হয় না। করুণার মধ্যে দিয়ে, আনন্দের মধ্যে দিয়ে না গেলে কি—কিন্তু, ঠিক ত জানিনে—

ভারতী অকস্মাৎ যেন এক নূতন জ্ঞান লাভ করিল। ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি ঠিক জানো দাদা, তোমার মুখ দিয়ে কখনো বৈঠিক কিছু বার হয় না,—হতে পারেনা। এই সত্য।

ডাক্তার বলিলেন, মনে ত তাই হয়। মা মাঝা গেলেন। কেন এসেছিলেন, কিসের জন্তে আপনি যেতে চাননা, কিছুই আমি জানিনে, জানবার ইচ্ছাও নেই, কিন্তু কারও আচরণে তিক্ততাই যদি পেয়ে থাকেন, সংসার অনাগত কালের তাই শুধু সত্য হ'ল, আর সমস্ত যদি কোথাও লাভ হয়ে থাকে, জীবনে তার কোন দাম দেবেন না?

অপূর্ণ কাঁতে গেল, সংসারে দাদা যদি—

ডাক্তার বলিলেন, সংসারে অপূর্ণের দাদা বিনোদবাবুই আছেন, ভাবতাব দাদা সব্যসাচী কি নেই? সে গৃহে যদি স্থান আপনার পাও থাকে, কলকাতার সেই ছোট্ট বাড়ীটুকুই কি বামনের বিশ্বদাবী সিঁড়লের ছায় পৃথিবীতে কোথাও আপনার আয় টাই রাখেনি? অপূর্ণবাবু, হৃদযাবগে দুর্মূল্য বস্তু, কিন্তু চৈতন্যকে জ্বাটল করতে দিলে এই বড় শত্রু আর মানুষের নেই।

অপূর্ণ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কঠিন, কিন্তু বদমাশনা বা আত্মার মুক্তির কামনা আমি দংসার ত্যাগ করতে চাইনি ডাক্তার, যদি কবি, পরাখেই কোরব। আমাকে আপনারদের বিশ্বাস করা কঠিন, মা করলেও দোষ দেবার নেই, কিন্তু একদিন যে অপূর্ণকে আপনারা জানতেন, মাসের মৃত্যুর পরে সে অপূর্ণ আমি আর নেই।

ডাক্তার উঠিয়া আশিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, তোমার এ কথাটা যেমন সত্য হয় অপূর্ণ।

অপূর্ণ গাঢ় শ্বশ্ঠ বলিল, এখন থেকে আমি দেশের কাজে, দেশের কাজে, দীন-দরিজের কাঁঠলী আত্মনিয়োগ করব। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কঠিতে লাগিল, কলকাতায় আবার বাড়ী, সংসারে আমি মানুষ, কিন্তু দঃপের সঙ্গে আর আমার কিছুমাত্র সম্পর্ক রইল না। এখন থেকে পল্লীদেবীই হবে আমার একমাত্র ব্রত। একদিন কুবিগ্রহান ভারতের পল্লীই ছিল গ্রাম, পল্লীই ছিল তার অস্থি-মজ্জা-শোণিত।

আজ সে ধ্বংসোন্মুখ। ভদ্রজাতি তাদের ত্যাগ করে সহরে এসেছে, সেখান থেকে তাদের অহিনিশি শাসন করে, এবং শোষণ করে। এ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ—বন্ধন তারা রাখেনি। না রাখুক, কিন্তু চিরদিন যারা এঁদের মুখের অন্ন এবং পরণের বস্ত্র যুগিয়ে দেয়, সেই কৃষককুল আজ নিরন্ন, নিরক্ষর এবং নিরুপায় হয়ে মৃত্যুপথে দ্রুতবেগে চলেছে। এখন থেকে আমি তাদের কল্যাণেই আত্মনিয়োগ কোরব, এবং ভারতীও আমাকে প্রাণপণে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে, আবশ্যক হলে কুটীরে কুটীরে গিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করবার ভার উনি নেবেন। আমার সমগ্র দেশের জগ্গে, নিজের জগ্গে নয় ডাক্তার।

ডাক্তার বলিলেন, সাধু প্রস্তাব।

তাহার মুখ হইতে কেবল এই দুটি কথাই কেহ প্রত্যাশা করে নাই। ভারতী য়ান হইয়া কহিল, আর একদিক দিয়ে ধরলে এ তো তোমারই কাজ দাদা। এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষক বড় হয়ে না উঠলে ত কোন কিছুই হবেনা।

ডাক্তার কহিলেন, আমি ত প্রতিবাদ করিনি ভারতী।

কিন্তু তোমার উৎসাহও ত নেই দাদা!

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, দরিদ্র কৃষকের ভালো করতে চাপ, তোমাদের আমি আশীর্বাদ করি। কিন্তু আমার কাছে সাহায্য কোর মনে করবার প্রয়োজন নেই। চাষীরা রাজা হোক, তাদের ধা খুঁড়ে লক্ষ্মীলাভ হোক, কিন্তু সাহায্য তাদের কাছ থেকে আমি আশা করিনে।

অপূর্বের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, কারও ভালো করতে হবে বলে আর কারও গায়ে কালি ছড়াতে হবে, তার মানেন নেই অপূর্ববাবু। এদের দুঃখ-দৈন্তের মূলে শিক্ষিত ভদ্রজাতি নয়, সে মূল বার করতে হলে তোমাকে আর একদিকে খুঁড়ে দেখতে হবে।

অপূর্ব কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কহিল, কিন্তু এই কি সকলে আজ বলেনা ?

বলুক। যা ভুল তা' তেত্রিশ কোটি লোকে মিলে বললেও ভুল। বরঞ্চ, এই শিক্ষিত ভদ্রজাতির চেয়ে লাহিত, অবমানিত, দুর্দশাগ্রস্ত সমাজ বাড়লা দেশে আর নেই। তার উপরে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে তাদের ভরাডুবি করাতে চাও কেন ? পরদেশের সকল যুক্তি এবং সকল সমস্যাই কি নিজের দেশে খাটে ভেবেচ ? বাইরের অনাচার যখন পলে পলে সর্বনাশ নিয়ে আসচে, তখন আবার অন্তবিদ্বেহ সৃষ্টি করতে চাও কিসের জন্তে ? অসন্তোষে দেশ তরে গেল,—স্বৈহের বাধন, অন্ধার বাধন চূর্ণ হয়ে এলো কিসের জন্তে জানো ? তোমাদের দু-দশজনের দোষে,—শিক্ষিতের বিরুদ্ধে শিক্ষিতের অভিযানে। শশি, একদিন তোমাকে আমি এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলাম মনে আছে। নিজেদের বিপক্ষে নিজেদের দুর্নীতি-ঘোষণাব মধ্যে একটা নিরপেক্ষ স্পষ্টবাদিতার দণ্ড আছে, এক প্রকার সন্তা খ্যাতিও মুখে মুখে প্রচারিত হয়, কিন্তু এ শুধু ভুল নয়, মিথ্যা। মদল তাদের তোমরা করগে, কিন্তু অপরের কলঙ্ক রটনা করে নয়, একের প্রতিকূলে অপরকে উত্তেজিত করে নয়—বিশ্বের কাছে তাদের হাস্যাস্পদ করে নয়! সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত সে একদিন এসে পৌছবে, কিন্তু আজও তার বিলম্ব আছে।

সকলেই নীরব হইয়া রহিল, শুধু ভারতী ধীরে ধীরে কহিল, কিছু মনে কোরোনা দাদা, কিন্তু বরাবরই আমি দেখে এসেছি পল্লীর প্রতি তোমার সহানুভূতি কম, তোমার দৃষ্টি শুধু সহরের উপরে। কৃষকদের প্রতি তুমি সদয় নও, তোমার ছ'চক্ষু আছে কেবল কারখানার কুলি-মজুর কারিগরদের দিকে। তাই তোমার পথের-দাবী খুলেছিলে এদেরই মাঝখানে। আর হৃদয় বলে যদি কোন বালাই তোমার থাকে,

সে শুধু ছেয়ে পড়ে আছে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ভদ্র জাতি নিয়ে। এরাই তোমার আশা-ভরসা, এরাই তোমার আপনার জন। বল, এ কি মিথ্যা কথা ?

ডাক্তার বলিলেন, মিথ্যে নয় বোন, অত্যন্ত সত্য। কতবার ত বলেছি তোমাকে, পথের-দাবী চাষা-হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র। শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই, পাবে আমাদের কুলি-মজুর-কারিকরের মাঝখানে, কারখানার ব্যাবসকে, কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়ান্গায়ে চাষার কুটীরে। কিন্তু কথায় কথায় শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাটি যেন ভুলে যেয়েনা দিদি। এই বলিয়া ষ্টোভের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, দেশোদ্ধার দুদিনে দেরি হলেই নইবে, কিন্তু তৈরি খিচুড়ি পুড়ে গেলে নইবেনা।

ভারতী ছুটিয়া গিয়া হাঁড়ির ঢাকা খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া হাসিমুখে কহিল, ভয় নেই দাদা, বাদল রাতের খিচুড়িভোগ তোমার মাঝে বাধে না।

কিন্তু বিলম্ব কত ?

ভারতী বলিল, মিনিট পনেরো কুড়ি। কিন্তু তাড়া কিম্বের বলত ?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, আজ যে তোমাদের কাছে আমি বিদায় নিতে এলাম।

কথা যেমনই শোক, তাহার হাসিমুখের দিকে চাহিয়া কেহই তা বিখ্যাস করিল না। বাহিরে ঝড় জলের বিরাম নাই, ভারতী একের জন্ত জানালা খুলিয়া নিদ্রীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাপরে বাপরে! পৃথিবী বোদ হয় ওলট-পালট হয়েছে যাবে। বিদায় নেবারই সময় বটে, দাদা! চোখের পলকে তাহার অল্প কথা মনে পড়িল, কহিল, আজ কিন্তু তোমাকে ওই ছোট ঘরটিতে শুতে হবে। নিজের হাতে আমি চমৎকার করে বিছানা করে দেব, কেমন ? এই বলিয়া সে

হৃদয়ের নিগূঢ় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া রান্নার কাজে লাগিল। ডাক্তারের নিকট হইতে যে কোন উত্তরই আসিল না তাহা লক্ষ্যও করিল না।

যথাসময়ে আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইলে, ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, সে হবে না ভারতী, পরিবেশের অহিলায় তুমি বাকি থাকলে চলবে না। আজ আমরা সকলে এক সঙ্গে খেতে বোস্বে।

ভারতী সম্মত হইয়া বলিল, তাই হবে দাদা, চারজনে আমরা গোল হয়ে খেতে বোস্বে।

ডাক্তার কহিলেন, গোল হয়ে খেতে পারি, কিন্তু বুদ্ধি অপূর্ণবাবু না নতুন দিয়ে আমাদের হজমে গোল বাধান। সেটা ঠিক বল।

অপূর্ণ হাসিল, ভারতীও হাসিমুখে কহিল, সে ভয় আমাদের থাকতে পারে, কিন্তু তোমার হজমে গোল বাধ্যবে কে দাদা? ও আগুনে পালাড়-পর্কত জুড়িয়ে দিলেও ত ভয় হয়ে যাবে। যে পাণ্ডা খেতে দেখেছি! এই বলিয়া ভারতী আর একদিনের পাণ্ডা স্বরণ করিয়া মনে মনে যেন শিহরিয়া উঠিল।

ভোজন-পর্ক আরম্ভ হইল। অন্ন-বাঞ্ছনের সুখ্যাতিতে এবং লগ্ন শ্রান্ত-পরিহাসে ঘরের আব-হাওয়া যেন মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া গেল। পাণ্ডা যখন পূর্ণ উজ্জমে চলিতেছে, সহসা রূপভঙ্গ করিয়া ফেলিল অপূর্ণ। সে কহিল, দিন দুই পূর্ণ খবরের কাগজে একটা সুস্বাদ পড়েছিলাম, ডাক্তার! যদি সত্য হয়, আপনার বিপ্লবের প্রভাস একেবারে নিরর্থক হয়ে যাবে। ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁদের শাসন-যন্ত্রের আমূল সংস্কার করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শশী চাকের পলকে রায় দিল, মিছে কথা! চল!

ভারতী ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয়, কিন্তু অকৃত্রিম উদ্বেগের সহিত কহিল, চলনা নাও ত হতে পারে শশিবাবু। যারা নেতা, যারা এই অন্ধশতাব্দকাল ধরে,—না দাদা, তুমি হাসতে পারবে না বল্চি!—

তাদের প্রাণপণ আন্দোলনের কি কোন ফল নেই ভাবো? বিদেশী শাসক হলেও ত তাঁরা মানুষ, ধর্মজ্ঞান এবং নৈতিক বুদ্ধি ফিরে আসা ত একেবারে অসম্ভব নয়!

শশী তেমনি অসঙ্কোচে অভিমত প্রকাশ করিল, অসম্ভব! মিছে কথা! ধাপ্রাবাজী!

অপূর্ব কহিল, অনেকে এই সন্দেহই করেন সত্য।

ভারতী বলিল, সন্দেহ তাঁদের মধ্যে। ভগবান কি নেই নাকি? এবং পরক্ষণেই অপরিমীম আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল, শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন, অত্যাচার-অনাচারের সংস্কার,—এ সব যদি সত্যিই হয়, তোমার বিপ্লবের আয়োজন, বিদ্রোহের সৃষ্টি,—তখন ত একেবারেই অর্থহীন হয়ে যাবে দাদা!

শশী কহিল, নিশ্চয়!

অপূর্ব কহিল, নিঃসন্দেহ!

ভারতী তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, দাদা, তখন এই ভয়ঙ্কর মূর্তি ছেড়ে আবার শাস্ত্র মূর্তি নেবে বল?

ডাক্তার দেওয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া মনে মনে হিসাব করিয়া কতকটা যেন নিজেকেই কহিলেন, বেশি দেরি নেই আর। তাহার পরে ভারতীকে উদ্দেশ্য করিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, ভারতী, এ আমার ভয়ঙ্কর কিংবা শাস্ত্র মূর্তি আমি আপনিই জানি শুধু জানি, এ জীবনে এ রূপ আমার আর পরিবর্তন হইবে নয়। আর তোমার নমস্ত্র নেতাদের,—ভয় নেই দিদি, অর্ধ তাঁদের নিয়ে আমোদ করবার আমার সময়ও নেই, অবস্থাও নয়। বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে কি তাঁরা চান, তার কতটুকু আসল, কতটুকু মেকি,—কি পেলো শশীর ধাপ্রাবাজী না হয় এবং নমস্ত্রগণের কান্না থামে, তার কিছুই আমি জানিনে। বিদেশী গবর্ণমেন্টের

বিকল্পে চোখ রাঙিয়ে যখন তাঁরা চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেছি। আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেছে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দে মাতরমের দিক্বি করে বলছি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব। দেখি, কার সাধ্য বাধা দেয়!—এ যে কি প্রার্থনা, এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু জানি, তাঁদের এই চাপুয়া এবং পাণ্ডয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই।

একটুখানি থামিষা বলিলেন, সংস্কার মানে মেরামত,—উচ্ছেদ নয়। গুরুভারে যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ হয়ে উঠেছে তাকেই সূসহ করা; যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে কৌশল বোধ হয় তারই নাম শাসন-সংস্কার। একটা দিনের জ্ঞাত এ ফাঁকি আমি চাইনি, একটা দিনের জ্ঞাত বলিনি কাগাপাণ্ডের পরিসর আমার আর একটুখানি বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাকে দত্ত কর। ভারতী, আমার কামনার, আমার তপস্য়ায় আত্ম-বঞ্চনায় অবসর নেই। এ তপস্য়া সাদ্র হবার শুধু দুটি মাত্র পথ খোলা আছে—এক মৃত্যু, দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা।

তাঁহার এই কথাগুলির মধ্যে নূতন কিছুই ছিলনা, তথাপি, মৃত্যু ও এই ভয়াবহ সংকল্পের পুনরুল্লেখ ভারতীর বুকের মধ্যে অশ্রু অলোড়িত হয়ে দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। কহিল, কিন্তু, একাকী কি করবে দাদা, একে একে সবাই যে তোমাকে ছেড়ে দূরে সরে গেল ?

ডাক্তার বলিলেন, যাচ্ছেই ত। আমার দেবতা যে ফাঁকি সহিতে পারেন না বোন্।

ভারতী মুখে আসিল, সংসারে সবাই ফাঁকি নয় দাদা, হৃদয় পাথর না হয়ে গেলে তা টের পেতে। কিন্তু এ কথা আজ সে উচ্চারণ করিল না।

আহার শেষ হইলে ডাক্তার হাত-মুখ ধুইয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। কেহই লক্ষ্য করিল না যে, তাহার চোখের দৃষ্টি কিসের উৎকর্ষিত প্রতীক্ষায় ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। এবং, একটা কান যে বহুক্ষণ হইতেই সদয় দরজায় সজাগ হইয়াছিল তাহা কেহই জানিত না। পথের দাবা কি একটা শব্দ হইল, তাহা আর কেহ গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু ডাক্তার সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নীচে অপূর্ববাবুর চাকর আছে না? জেগে আছে? ওহে হুম্মম্ম, দোরটা একবার খুলে দাও।

কোথায় কাহার কিরূপ শব্দা প্রস্তুত হইবে তাহাই ভারতী স্মিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া কহিল, কাকে দাদা-ককে এসেছেন?

ডাক্তার বলিলেন, হীরা সিং? তার আসার আশায় পথ চেয়ে আছি। বল কবি, কতকটা কাবোর মত শোনাল না? এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

ভারতী বলিল, এই দুর্যোগে তোমার একার কাবোর জালাতেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে আছি। আবার ভগ্নদূত কিসের জন্তে?

শশী কহিল, ভগ্নদূত তুচ্ছ নয় ভারতী, সে না হলে অতবড় মেঘনাদবধ কাব্য রচনাই হোতোনা।

দেখি, ইনি কোন্ কাব্য রচনা করেন! এই বলিয়া ভারতী উদ্গিরিয়া দেখিল, অপূর্ব ভৃত্য বাহিরের কবাট খুলিড়ে, যে ব্যক্তি প্রবেশ করিল সে সত্যিই হীরা সিং। অপেক্ষা পরে আগন্তুক উপরে আসিয়া সকলকে অভিবাদন করিল, এবং হাতজোড় করিয়া সবাস্যায়ীকে প্রণাম করিল। পরণে তাহার সেই অতি সুপরিচিত সরকারী উদ্দি, সরকারী চাপরাশ, সরকারী মুরাঠা, কোমরে টেলিগ্রাফ পিয়নের চামড়ার ব্যাগ,—এ সমস্তই ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছে। বিপুল দাড়ি গৌরবহিয়া জল

ঝরিতেছে,—বাঁ হাত দিয়া নিঙ্ড়াইয়া বোধ হয় নিজেকে কিঞ্চিৎ হালকা করিবার চেষ্টা করিল, এবং তাহারই ফাঁক দিয়া অশ্রুটধ্বনি শুনা গেল, রেডি।

ডাক্তার লাফাইয়া উঠিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ ! থ্যাঙ্ক ইউ ! থ্যাঙ্ক ইউ সরদারজি ! কখন ?

নাউ। এই বলিয়া সে সকলকে পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া নীচে বাইতেছিল, কিন্তু সকলেই সম্বন্ধে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কি হয়েছে সরদারজি ? কি নাউ ?

অথচ, সবাই জানিত এই মানুষটির গলায় ছুরি দিলে রক্ত ছুটিবে, কিন্তু বিনা ছকুমে কথা ফুটিবে না। সুতরাং, উত্তরের পরিবর্তে তাহার ঘন ক্রয়-শ্রম-গুম্ফ ভেদ করিয়া গুটিকয়েক দাঁত ছাড়া আর যখন কিছুই বাহির হইল না, তখন বিস্ময়াপন্ন কেহই হইল না। সবাই জানিত, ইহার নিন্দা-খ্যাতি, মান-অপমান, শত্রু-মিত্র নাই; দেশের কাজে সবাসাটীকে সে সদীর মানিয়া এ জীবনের সমস্ত ভাল-মন্দ সমস্ত সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়া কঠোর দৈনিক-বৃত্তি মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। আর তাহার তর্ক নাই, আলোচনা নাই, সময়-অসময়ের হিসাব নাই, কিছু একটা কঠিন কাজের ভার ছিল, কর্তব্য পালন করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ইহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া ডাক্তার নিজে যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

ক্ষতি এবং অক্ষতি কত যে হইয়াছে দূর হইতে নিরূপণ করা শক্ত। সম্ভবতঃ, যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যতই হোক, ছুটা কাজ তাঁহাকে করিতেই হইবে। তাঁহাদের জ্যামেকা ক্রবের বে অংশটা সিঙ্গাপুরে আছে তাহাকে বাঁচাইতেই হইবে, এবং যেখানে হোক, এবং যেমন করিয়া হোক ব্রজেন্দ্রকে তাঁহার খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। নদীর দক্ষিণে সিরিয়মের সম্মুখটে একখানা চীনা জাহাজ মাল বোঝাই করিয়া দেশে

চলিয়াছে, কাল অতি প্রত্যুষেই তাহা ছাড়িয়া যাইবে, ইহাতেই কোনমতে একটা স্থান পাওয়া গিয়াছে। সেই সম্বাদই হীরা সিং এইমাত্র দিয়া গেল।

শুনিয়া স্মিত্রার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। খুব সম্ভব, ব্রজেন্দ্র এখন সিদ্ধাপুরে। এবং, যে ব্যক্তি তাহার সন্ধানে চলিল, তাহার দৃষ্টি হইতে স্বর্গে মর্ত্যে কোথাও তাহার পরিজ্ঞান নাই। তখন বিশ্বাসঘাতকতার শেষ বিচারের সময় আসিবে। ইহার দণ্ড যে কি তাহা দলের মধ্যে কাহারও অবিদিত নহে, স্মিত্রাও জানে। ব্রজেন্দ্র তাহার কিছুই নহে, এবং অপরাধ যদি সে করিয়াই থাকে শাস্তি তাহার হোক, কিন্তু যে কারণে স্মিত্রা অকস্মাৎ এমন হইয়া গেল, তাহা ব্রজেন্দ্রের দণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া নহে, তাহা এই যে, ব্রজেন্দ্র পতঙ্গ নহে। সে আত্মরক্ষা করিতে জানে। শুধু তাহার পকেটের সুগুপ্ত পিস্তল নহে, তাহার মত ধূর্ত, কৌশলী ও একান্ত সতর্ক ব্যক্তি সংসারে বিরল। তাহার মস্ত ভুল এই হইয়াছে যে, ডাক্তার হাঁটা-পথে বর্ম্মা ত্যাগ করিয়া গেছেন এই কথা সে ঘাবার পূর্বে নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়া গেছে। এখন কোন মতে যদি সে ডাক্তারের খোঁজ পায় ত বধ করিবার যত কিছু অস্ত্র তাহার তুণে আছে প্রয়োগ করিতে মুহূর্তের দ্বিধাও করিবে না। বস্তুতঃ, জীবন-মরণ সমস্রায় অপরের বলিবারই বা কি আছে!

কিছুই নাই। শুধু হীরা সিংহের শাস্ত্র মুহু দুটি শব্দ 'নাউ' এবং 'রেডি' তাহাদের সকলের কানের মধ্যেই সহস্রগুণ ভীষণ হইয়া সহস্র দিক দি আঘাত প্রতিঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভারতীয় মনে তাহাদের মৌলমিনের বাটীতে একদিন জন্মতিথি উৎসবের পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝখানে অতিথি এবং সর্বোত্তম বন্ধু রেভারেন্ড লরেন্স আহাের টেবিলে হৃদরোগে মারা গিয়াছিলেন। আজিও ঠিক তেমনি অকস্মাৎ হীরা সিং ঘরে ঢুকিয়া মৃত্যুদূতের হায়ে একমুহূর্তে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ শশী কথা বলিয়া উঠিল। মুখ দিয়া ফৌস করিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার।

কথাটা সাদা এবং নিতান্তই মোটা কথা। কিন্তু সকলের বুকের উপর যেন মুগুরের ঘা মারিল।

ডাক্তার হাসিলেন। শশী কহিল, হাঃম আর ষাই করুন, সত্যি কথা। আপনি কাছে নেই মনে হলে সমস্ত যেন ব্লাঙ্ক,—ফাঁকা, ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু আপনার প্রত্যেকটি হুকুম আমি মেনে চল্‌বো।

যথা ?

যথা, মদ পাবোনা, পলিটিক্সে মিশ্‌বোনা, ভারতীয় কাছে থাক্‌বো এবং কবিতা লিখ্‌বো।

ডাক্তার ভারতীয় মুপের দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। তখন রহস্যভরে প্রশ্ন করিলেন, চাষাড়ে কবিতা লিখ্‌বেনা কবি ?

শশী কহিল, না। তাদের কাব্য তারা লিখতে পারে লিখুক, আমি লিখিচি। আপনার সে-কথা আমি অনেক ভেবে দেখেছি। এবং এ উপদেশও কখনো ভুলবনা যে, আইডিয়ার জগৎ সর্ব্বত্র বিসর্জন দিতে পারে শুধু শিক্ষিত তত্ত্ব সম্বন্ধে, অশিক্ষিত কৃষকে পারে না। আমি হব তাদেরই কবি।

ডাক্তার বলিলেন, তাই হোয়ো। কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়, কবি, মানবের গতি এইখানেই নিশ্চল হয়ে থাক্‌বে না। কৃষকের দিনও এক দিন আস্‌বে, যখন তাদের হাতেই জাতির সকল কল্যাণ অকল্যাণের ভার সমর্পণ করতে হবে।

শশী কহিল, আচ্ছ সেদিন। তখন, স্বচ্ছন্দ, শান্ত চিন্তে সব দায়িত্ব তাদের হাতেই তুলে দিয়ে আমরা ছুটি নেব। কিন্তু আজ না। আজ অজ্ঞ-বলিদানের গুরুভার তারা বহিতে পারবে না।

ডাক্তার উঠিয়া আসিয়া তাহার কাঁধের উপর ডান হাত রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না।

অপূর্ব এতক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হইয়া শুনিতেছিল, ইহাদের কোন আলোচনাতেই কথা কহে নাই। কিন্তু শরীর শেষের দিকের মস্তব্য তাহার ভারি খারাপ ঠেকিল। যে কৃষকের মঙ্গলোদ্দেশে আত্মনিয়োগে। সফল সে স্থির করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে এই সকল অভিমানে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, মদ খাওয়া খারাপ, বেশ, উনি ছেড়ে দিন; ক্রাব্য-চর্চা ভালো, তাই করুন; কিন্তু কৃষি প্রধান ভারতবর্ষের কৃষককুল কি এমনি তুচ্ছ, এতই অবহেলার বস্তু? এবং, এরাই যদি বড় হয়ে না ওঠে, আপনাদের বিপ্লবই বা করবে কে? এবং, করবেই বা কেন? আর পলিটিক্স! যথার্থ বল্চি ডাক্তার, কৃষকের কল্যাণে সন্মাস-ব্রত যদি আমি না নিতাম, আজ স্বদেশের রাজনীতিই হোতো আমার জীবনের একমাত্র কর্তব্য!

ডাক্তার ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা, প্রসন্ন স্নিগ্ধোজ্জল হাস্যে তাহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, আমি কায়-মনে প্রার্থনা করি তোমার সদ্‌দেহ যেন সফল হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রও তাজিলের সামগ্রী নয়। দেশের ও দেশের কল্যাণে বৈরাগ্যই যদি গ্রহণ করে থাকো, কারও সঙ্গেই তোমার বিরোধ বাধবে না। আমি শুধু এই কথাই বলি, অপূর্ববাবু, সকলে কিন্তু সকল কাজের যোগ্য হয় না।

অপূর্ব স্বীকার করিয়া বলিল, আমার চেয়ে এ শিক্ষা আর কার বেশি। হয়েছে ডাক্তার? আপনি দয়া না করলে বহুদিন পূর্বেই ত এই ভ্রমের চরম দণ্ড আমার হয়ে যেতো। এই বলিয়া পূর্ব স্থিতির আঘাতে তাহার সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

শীগী এ ঘটনা জানিত না, জানানো কেহ আবশ্যক বিবেচনা? কারো

নাই। অপূর্বর কথাটাকে সে প্রচলিত বিনয় ও শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শনের অতিরিক্ত কিছুই মনে করিল না। কহিল, ভ্রম ত করে অনেকই, কিন্তু দণ্ডভোগী করে চলে যে নিজের জন্মভূমি। আমি ভাবি, ডাক্তার, আপনার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কে আছে? কার এতখানি জ্ঞান? জাতি ও দেশ নিবিশেষে কার এতখানি রাষ্ট্রতন্ত্রের অভিজ্ঞতা? কার এত ব্যথা? অথচ, কিছুই কাছে এলোনা। চায়নার আয়োজন নষ্ট হয়ে গেল, পিনাঙের গেল, বর্মার কিছুই রইল না, সিঙ্গাপুরেরও যাবে নিশ্চয়ই,— এক কথায়, আপনার এতকালের সমস্ত চেষ্ঠাই ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছে। শুধু প্রাণটাই বাকি, সেও কোন্ দিন যায়।

ডাক্তার মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। শশী কহিল, হাসুন আর বাই করুন, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

ডাক্তার তেমনি হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, দিব্যচক্ষে আর কিছু দেখতে পাওনা কবি?

শশী বলিল, তাও পাই। তাইত আপনাকে দেখলেই মনে হয়, নিকপদ্রব, শান্তিময় পথে যদি আমাদের সত্যকার পথের-দাবী সূচ্যগ্র মাত্রও খোলা থাকতো!

অপূর্ব বলিয়া উঠিল, বাঃ। একই সঙ্গে একেবারে দুই উল্টো কথা।

স্মিত্রা হাসি গোপন করিতে মুখ ফিরাইল, ডাক্তার নিজেও হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ, তাঁর মধ্যে দুটো সত্তা আছে অপূর্ববাবু। একজন শশী, আর একজন কবি। এই জগতই একের মুখের কথা অপরের মনের কথায় গিয়ে থাকে। এমন বেস্বরার সৃষ্টি করে। একটু খামিয়া বলিলেন, বহু মানবের মধ্যেই এমনি আর একজন নিভৃতে বাস করে। সহজে তাকে ধরা যায় না। তাই, মানুষের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব মাত্রই তার কঠোর বিচার করলে অবিচারের সত্তাবনাই থাকে বেশি। অপূর্ববাবু, আমি তোমাকে চিন্তে

পেরেছিলাম, কিন্তু পারেননি সুমিত্রা। ভারতী, জীবন-যাত্রার মাঝখানে যদি এমনি আঘাত কখনো পাও দিদি, পরলোকগত দাদাব এই কথা তখন যেন ভুলোনা। কিন্তু, এইবার আমি উঠি। ঘাটে আমার নৌবাধা আছে, তাঁটার মুখে অনেকখানি দাঁড় না টানলে আর ভোর রাতে জাহাজ ধরতে পারব না।

ভারতী শঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল, কহিল, এই ভয়ঙ্কর নদীতে এই ভীষণ ঝড়ের রাজ্যে ?

তাহার ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে সুমিত্রার আত্মসংযমের কঠিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে পাংশু মুখে প্রশ্ন করিল, সত্যিসত্যিই কি তুমি সিদ্ধাপুরে নাম্বে নাকি ? এ কাজ তুমি কতখানো কোরোনা, ডাক্তার, সেখানকার পুলিশে তোমাকে ভাল করেই চেনে। এবার তাদের হাত থেকে তুমি কিছুতেই—

কথা তাহার শেষ হইল না, উত্তর আসিল, তারা কি এখানে আমাকে চেনে না সুমিত্রা ?

কিন্তু এই লইয়া তর্ক করিয়া ফল নাই, যুক্তি দেখাইবার অবসর নাই—হয়ত বা, প্রশ্নটা সুমিত্রা শুনেও নাই; যে কথা বাহিরে আসিয়া ব্যাকুলতায় এতদিন মাথা কুটিয়া মরিতেছিল তাহাই অন্ধবেগে নিজের হইয়া আসিল,—কেবল একটিবার ডাক্তার, শুধু এইবারটির মত আমা উপরে নির্ভর করে দেখ, তোমাকে আমি সুরবাগান নিয়ে যেতে পারি কিনা! তারপরে টাকায় কি না হয় বল!

ডাক্তার হেঁট হইয়া জুতার ফিতা বাঁধিতেছিলেন, বাঁধা শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন, টাকায় অনেক কাজ হয় সুমিত্রা, তার অপচয় করতে নেই।

সকলেই বৃষ্টি, এ আলোচনা বুঝা। উপায়হীন বেদনায় হৃদয় পূর করিয়া সুমিত্রা অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে অন্ধদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। ভারতী

